প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য বই

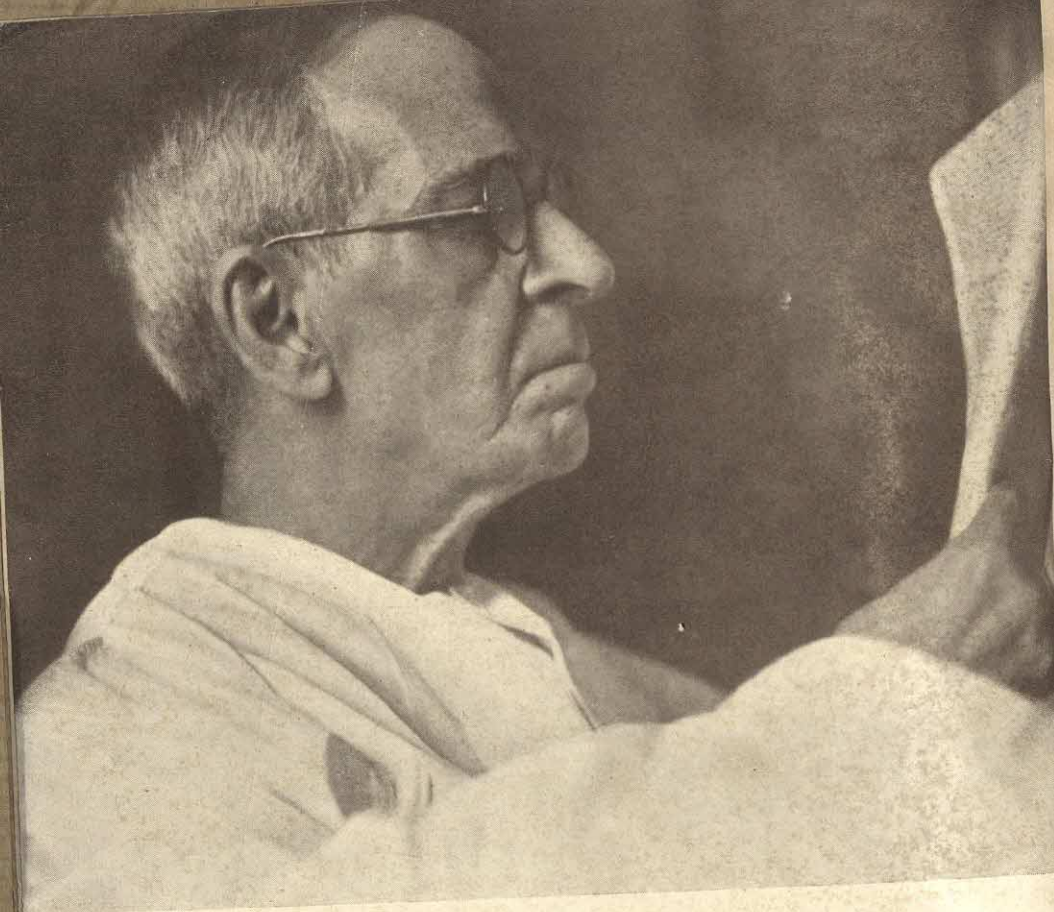
বীরবলের হালখাতা

চার-ইয়ারি কথা

রায়তের কথা

হিন্দু সংগীত

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান



জন্ম : ২৪ শ্রাবণ ১২৭৫। ৭ আগস্ট ১৮৬৮

মৃত্যু : ১৬ ভাদ্র ১৩৫৩। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

শ্রীকরঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত চিত্র

প্রবন্ধসংগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রমথ চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

দ্বিতীয় খণ্ড

মার্চ ১৯৫৪

বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তকে ও সাময়িক পত্রে মুদ্রিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি রচনার সমষ্টি প্র ব ন্ধ সং গ্র হ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হল। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক প্রবন্ধগুলির বিষয়বিভাগ ও নির্বাচন করে দিয়েছেন, এবং গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, এজন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। ভূমিকাটি প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে 'সাহিত্য' ও 'ভাষার কথা' বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভারতবর্ষ' 'সমাজ' ও 'বিচিত্র' বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হল।

সূচীপত্র

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ঐক্য

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত নামে পুস্তিকা-আকারে ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিংবা স্বজাতির নাম উল্লেখ করবামাত্রই একদলের লোক আমাদের মুখ-ছোপ দিয়ে বলেন, ওসব কথা উচ্চারণ করবার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা ভারতবর্ষ বলে কোনো-একটা বিশেষ দেশ নেই এবং ভারতবাসী বলে কোনো-একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর-অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্য পায়ে হেঁটে তীর্থপর্যটন করবার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্র-খানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয়, এবং শরীর না হোক মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি ধর্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্যও সেন্সস্ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যক নেই; চোখ-কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্যপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য—আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ-যুগের শিক্ষিত লোকের ইউটোপিয়া, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময়তোরণ রজতসৌধ ও কনকচূড়ার সাক্ষাৎলাভ করেছেন, তিনি আকাশরাজ্য হতে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক-কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা ও ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা হয়। মানুষে কিন্তু বাস্তবজগতের অজ্ঞতাবশতঃ নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতই, চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এবং ইতিহাস

এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনারাজ্য কখনো কখনো কালকের বাস্তবজগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখনো কখনো ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয় জীবনের লক্ষ্য করে তোলা অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা-কোনো লক্ষ্য না থাকায় দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নির্জীব এবং ব্যক্তিগত জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য আইডিয়াল ইউনিটি ; এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-ভারতবর্ষ একটি বিরাট আইডিয়াল-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত ইউটোপিয়া ভবিষ্যতের অঙ্কস্থ রয়েছে।

কিন্তু এই আইডিয়ালকে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরেজি সংবাদপত্র, অপর দিকে বাংলা সংবাদপত্র এই আইডিয়ালটিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন ; উভয়েই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশি-শিক্ষা-লব্ধ, এবং সেইজন্যই স্বদেশি-ভিত্তিহীন ; কেননা ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ইংরেজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়, বহু ; এবং যা গোড়া হতেই পৃথক্, তার আর কোনোরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বেড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে তোলা যায় না ; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্বামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর করতে পারে। অপর পক্ষে বাংলা সংবাদপত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ শতরঞ্চের ঘরের মত ছক-কাটা। এবং কার কোন্ ছক, তাও অতি সুনির্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে কে সিধে চলবে, কে কোনাকুনি চলবে, কে এক পা চলবে, আর কে আড়াই পা চলবে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রমধর্ম। নিজের নিজের গণ্ডির ভিতর অবস্থিতি করে নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম। সুতরাং যাঁরা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে একঘরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ঐক্য চান তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই, সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দিষ্ট গণ্ডিগুলি তুলে দিলে সমাজতরী কোনাকুনি চলে তীরে আটকে যাবে, এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই পা'র পরিবর্তে চার পা তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা

বিপদের কথা। সুতরাং ভারতবর্ষের অতীতে এই ঐক্যের আইডিয়ালের ভিত্তি আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবতঃ রাধাকুমুদবাবু দু হাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি সাধু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

২

রাধাকুমুদবাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনেকে, দেখতে পাই, এই ঐক্যের সন্ধান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত ; কেননা অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের বিব্রত করে তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয়নি ; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসংগত হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনো ঐক্য ছিল না। মানবজীবনের সঙ্গে মানবমনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মত দর্শনও জীবনবৃক্ষের ফুল ; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর করে এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশকুসুম বলে ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস, একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বরবাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে এবং ভগবানকে তার অদ্বিতীয় শাসন- ও পালন-কর্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ। অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানা রাজ্যে বিভক্ত এবং বহু রাজা উপ-রাজার শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশদেশে বহু দেবতা এবং উপদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণতঃ মানুষে মর্ত্যের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্বপক্ষ একেশ্বরবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক, এবং যে দেশের পূর্বপক্ষ বহুদেবতাবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না, কিন্তু বহুকে মায়া বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তরমীমাংসার সার কথা— 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'— এই অর্ধশ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু

শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ এবং শংকর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ— এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কতকটা সত্য আছে। যে একাত্মজ্ঞান কর্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চায় আত্মার যতটা চর্চা করা হয়, বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক-ধর্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিকেরাই বলতে পারেন। সমাজ ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিস্মৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোঽহং হচ্ছে ইনডিভিডুয়ালিজ্‌মের চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্তমত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যাবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও সংকীর্ণ করে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি, প্রতিহত হয়েছে। বেদান্তদর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়, প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সংকীর্ণ কর্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ, বিষয়জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্মজ্ঞানের প্রতিবাদ। এককথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে জীবের এই স্বরাট্‌জ্ঞান শুধু বিরাট অহংকার মাত্র। সুতরাং যে সূত্রে একালের লোকেরা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা ঢের স্থূল জীবনসূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীনকমণ্ডলু ধারণ করে বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করতে পারায় একালের অদ্বৈতবাদীরা চোগাচাপকান পরে আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী আর-একজন শুধু উদাসীন— পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদবাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্যাদা এই যে, তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন সেইটেই বিচার্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুশি-তাই স্থাপনা করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীত সম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতে সবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার আর একচুলও বদল হতে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা

খুঁজে বার করতে চাই তা সেখানে পাই তো ভালোই; না পাই তো, না পাই।

৩

জীবের অহংজ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে থাকে জাতির অহং-জ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্মজ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্মজ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল। ভারতবাসীর মনে এই দেশাত্মজ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্মলাভ করেছিল, রাধাকুমুদবাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হলেও যে একদেশ এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অন্ততঃ দু হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্বতের প্রাকার, এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্বে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হতে বিশেষরূপে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষসত্য। তার পর, এ দেশ অসংখ্যযোজন-বিস্তৃত হলেও সমতল; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে একক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিন্ধ্যাচল সম্ভবতঃ এ মহাদেশকে দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জন্য নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য না হত। রাধাকুমুদবাবু দেখিয়েছেন যে, এই স্বদেশজ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি। সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, প্রতি নদী তীর্থ, প্রতি পর্বত দেবতাত্মা। কিন্তু এই ভক্তিভাব আর্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হতে পঞ্চনদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভ করে শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম নয়, লৌকিক ধর্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম, বিদেশি বিজেতা আর্যদের ধর্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্মের

প্রধান উপাদান। সে ধর্ম আকাশ থেকে পড়ে নি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে সেই হচ্ছে অন্নদা এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ। সীতার মত এসকল দেবতা হলমুখে ধরণী হতে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জন হয়। 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' এ কথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদবাসী আর্যেরা মন্দিরও গড়াতেন না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধ যুগ ছিল সেই যুগেই এই স্বদেশজ্ঞান ও স্বদেশপ্রীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম অবৈদিক ধর্ম, এবং সার্বজনীন বলে তা সার্বভৌম ধর্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম আর্যদের গৃহধর্ম, বড়জোর কুলধর্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্মের ছিল না। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশান-কোণ ব্যতীত আর-সকল দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবতঃ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্ততঃ আকাশের দেবতারা যে মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্মভাবের জন্ম। আর্যেরা যে কস্মিন্‌কালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে স্বীকার করতে চান নি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনুসংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত- এবং আর্যাবর্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে ঘৃণ্য ম্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিংবা আর্যত্বগুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মনিরত আর্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আর্যভূমি, বাদবাকি সব ম্লেচ্ছদেশ। আর্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের পঞ্চনদীর উল্লেখ করে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডূষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতি আর্যেরা মহোৎসবের ভোজনান্তে The Land we live in এর নামোচ্চারণ করে সুরার আচমন করেন। প্রাচীন আর্যজাতির

মনে দেশনীতির চাইতে আত্মনীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা নয়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম। রাধাকুমুদবাবু এমন-কোনো বিরুদ্ধপ্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যাতে করে আমার এই ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

৪

ইংরেজ যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন, তা নয়। আজ দু হাজার বৎসরেরও পূর্বে অশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়ারঙে রঞ্জিত করেছিলেন। এ কথা শিক্ষিত লোকমাত্রেরই জানা না থাক্, শোনা আছে। যা সুপরিচিত তার আর নূতন করে আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের একরাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁর পুস্তিকার মৌলিকতা এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনাপরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বেদ যে শূদ্রনীতি কিংবা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখনো মুখে আনেন নি; বরং বৌদ্ধাচার্যেরা যখন বেদের কোনো উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত হয়েছে এই দাবি করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয় তা বৌদ্ধযুগে আর্যদেশে শূদ্রভূপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্যবংশও শূদ্রবংশ ছিল। এবং অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয় ধর্মচক্রেরও স্থাপনা করে সসাগরা বসুন্ধরার সার্বভৌম চক্রবর্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং একরাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক মনে পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে কোনো একরাষ্ট্রের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিংবদন্তি আছে; সেই কিংবদন্তির সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোনো ঘটনা না হোক, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদবাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌত গৃহ্য প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতি সম্বন্ধে আর্যজাতির মনোভাব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক দলিলগুলির কোনো তারিখ নেই,

সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। অতএব কোনো বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভূত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব, বিশেষতঃ যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদবাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর মতের মূলভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাংলা অনুবাদ আছে; তারই সাহায্যে রাধাকুমুদবাবুর মত যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। সম্রাট্ কাকে বলে, তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে—

পূর্ব দিকে প্রাচ্যগণের যেসকল রাজা আছেন তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা সম্রাট্ নামে অভিহিত হন।[১]

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, এ স্থলে মাগধসাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয় তা হলে প্রাচীন ভারতসাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা : রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঐসকল নাম উচ্চনীচহিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণগ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে, ঐসকল নাম হচ্ছে পৃথক্ পৃথক্ দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল দেশই পঞ্চনদের বহির্ভূত, কোনো কোনো দেশ ভারতবর্ষেরও বহির্ভূত, এবং বিশেষ করে একটি দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। যথা—

পূর্ব দিকে প্রাচ্যগণের রাজা সম্রাট্, দক্ষিণ দিকে সত্বৎগণের রাজা ভোজী; পশ্চিম দিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট্; উত্তর দিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যেসকল রাজা আছেন তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন। এবং ঊর্ধ্বদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশভেদ অনুসারে

১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৮শ অধ্যায়

সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল, পদমর্যাদা অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট্ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট্, একসঙ্গে স্বরাট্ বিরাট সম্রাট্, সব রাট্ হতে পারতেন; অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশদেশের রাজা হতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। বাজপেয় রাজসূয় অশ্বমেধ পুনর-ভিষেক ঐন্দ্রমহাভিষেক—এসব হচ্ছে যজ্ঞ। এবং এসকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্য-স্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজমানের অভ্যুদয় সাধিত হতে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদবাবু তাঁর পুস্তিকাতে পুরাকালে যাঁরা একরাট্-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হতে তুলেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত রাজাগণের সার্বভৌম সাম্রাজ্য লাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারি নে। কারণ উক্ত ব্রাহ্মণের মতে ঐন্দ্রমহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্রবাঞ্ছিত পদ লাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুন আমরা উক্ত রাজযজমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয় এবং রাজপুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারি নে। রাধাকুমুদবাবু নামের ফর্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দটি তুলে দিতেন, তা হলে পাঠকমাত্রেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা কতদূর প্রামাণিক তা সহজেই বুঝতে পারতেন। ঐন্দ্রমহাভিষেক উপলক্ষ্যে দান করা হত—

> বদ্ধ শতকোটি গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সবনে দুই দুই সহস্র। আটাশি হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব। এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্য দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্লভ হলেও গ্রহীতা আরও বেশি দুর্লভ। এত গোরু এত ঘোড়া এত বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন বোধ হয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদিত হত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন যাঁদের নিজেদের কোষবৃদ্ধি এবং অধিকারবৃদ্ধির প্রতি লোভ ছিল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের তন্তরমন্তরজাদুতে বিশ্বাস করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল দ্বারা নয়, ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ

শত্রুনাশের জন্য তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যক হত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত। এই অতীত সাহিত্যের ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা হলে আমাদের মনো-জগতের গন্ধর্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরোনো বোতলে ঢালছি। আমরা স্পেন্সরের বিলেতি মদ শংকরের বোতলে ঢালি, Comte কঁতের ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি, এবং তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে পান করে তৃপ্তিও লাভ করি মোহও প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালাঢালি এবং ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে। বিস্মার্কের জর্মান মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও-হাতায় এ-জিনিস কিছুতেই ধরবে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপার -সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি, এবং চাই কি তাতে কৃতকার্যও হতে পারি; কিন্তু শুধু ইংরেজি শিক্ষা নয় তদুপরি ইংরেজি ভাষার সাহায্যেও তার 'আধিরাষ্ট্রিক' ব্যাখ্যা করতে পারি নে।

৫

এতদিন প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ করবামাত্রই বর্ণাশ্রমধর্ম, ধ্যান-ধারণা নিদিধ্যাসন— এইসকল কথাই আমাদের স্মরণপথে উদিত হত, এবং বঙ্গসাহিত্যে তারই গুণকীর্তন করে আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ করতুম। ইম্‌পীরিয়লিজ্‌ম্ নামক আহেলবিলাতি পদার্থ পুরাকালে এ দেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্বে কেউ বললে তার উপর আমরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা ওরূপ কথা আমাদের দেশভক্তিতে আঘাত করত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে নব দেশভক্তি ঐ ইম্‌পীরিয়লিজ্‌মের উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা। এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমাদের চোখ এতই ঝলসে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে তখন

আমরা এই প্রাচীন ইম্‌পীরিয়লিজ্‌ম্‌কেও খুঁটিয়ে দেখতে পারব এবং কৌটিল্যকেও জেরা করতে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করেছিলেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারই ভাষ্য। যে মনোভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবতঃ আর্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থশাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের প্রকৃতি এক নয়। সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ law, এবং শাস্ত্রকারদের মতে ল-এর মূল হচ্ছে বেদ স্মৃতি সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ লেজিস্‌লেশন যে ধর্মের মূল হতে পারে, এ কথা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন। অপর পক্ষে কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল ধর্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনোই মেনে নেন নি, কেননা তাঁদের মতে ধর্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আর্যঋষিদের স্মৃতি; তার পর সদাচার, অর্থাৎ আর্যদের কুলাচার; তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এককথায় ধর্মশাস্ত্রের মতে 'পারম্পর্যক্রমাগত' আর্য-আচারই একমাত্র এবং সমগ্র ল। যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনোই স্বচ্ছন্দমনে গ্রাহ্য করতেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা প্রতিহিংসা ক্রোধ দ্বেষ ক্রূরতা ও কুটিলতার অবতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন, এবং একই কারণে ব্রাহ্মণসমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম এবং সেইসঙ্গে মৌর্যসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে, তখন সম্ভবতঃ আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংসব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্যগঠনে নয়, সমাজগঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়, চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হলে 'পৃথিবীর সর্ব-মানব'কে আর্য-আচার শিক্ষা দেওয়া এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র

ভারতবাসীকে একসমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দুসমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্যদের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য তাঁরা যে দুর্গ গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলংকারে অভিধানে ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব কীর্তি, যে ভাষার তুলনা জগতে নেই সেই সংস্কৃত ভাষায়, অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্যেরা যে সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে, এবং সমাজের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্য সমাজের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই; কারণ বর্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, political problemsএর অপেক্ষা social problemsএর মূল্য কিছু কম নয়। এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

১৩২১ আষাঢ়

ভারতবর্ষ সভ্য কি না

সেকালে ভারতবর্ষ ছিল মীমাংসার যুগ, একালে হয়েছে সমস্যার। এ কথা যে সত্য, এতগুলো কমিশনই তার প্রমাণ। এই আজকের দিনে পাঁচ-পাঁচটা কমিশনের প্রসাদে পাঁচ-পাঁচটা সমস্যা রাজ-দরবারে টাঙানো রয়েছে; যথা: ১ চাকরির সমস্যা, ২ স্বরাজের সমস্যা, ৩ অরাজকতার সমস্যা, ৪ শিল্পের সমস্যা, ৫ শিক্ষার সমস্যা; তার উপর আবার এসে জুটেছে বিয়ের সমস্যা।

এর পর জন্ম মৃত্যু বাদে দুনিয়ার আর কোন্ সমস্যা বাকি রইল? ও-দুটির যে কোনো সমস্যা নেই, তার কারণ ও-দুটিই হচ্ছে রহস্য। তবে এ দেশে জন্মটা বড় রহস্য না মৃত্যুটা বড়, এ বিষয়ে একটা তর্ক অবশ্য উঠতে পারে। কিন্তু ওঠে না এই জন্য যে, তার মীমাংসাও স্পষ্ট। আমাদের পক্ষে ও দুইই সমান।

এ যুগ সমস্যার যুগ, বিশেষ করে এই কারণে যে, এ যুগে অধিকারীভেদ নেই। জীবন, তা সে ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক, চিরকালই একটা সমস্যা; কিন্তু সেকালে এ সমস্যা নিয়ে মাথা বকাত দু-চার জন; আর একালে কোনো বিষয়ে একটা সমস্যা উঠলে আমরা সকলে মিলে তার মীমাংসা করতে বাধ্য। যেকালে সকলের সকল বিষয়ে মত দেবার অধিকার আছে, সেকালে কোনো বিষয়েই কারও চুপ করে থাকবার অধিকার নেই। যদি বল, যার নিজের একটা মত গড়বার সামর্থ্য নেই, এককথায় যার মত ব'লে কোনো পদার্থই নেই, সে সে-পদার্থ দান করে কি করে। তার উত্তর, মনের ঘরে যার শূন্য আছে, সে শূন্যই দিতে পারে; শুধু যে দিতে পারে তাই নয়, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য তার পক্ষে তা দেওয়া একান্ত কর্তব্য। একের পিছনে শূন্য বসালে তা যে দশগুণ বেড়ে যায়, এ কথা কে না জানে। সুতরাং যার হোক একটা মতের পিছনে আমরা যদি ক্রমান্বয়ে শূন্য বসিয়ে যাই, তা হলে সঙ্গেসঙ্গে তার দশগুণ করে মূল্য বেড়ে যাবে।

সত্য কথা বলতে গেলে, রাজনৈতিকপ্রমুখ বিষয়ে অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনোরূপ মত না থাকাটাই শ্রেয়ঃ। সকলেরই যদি একটা-না-একটা স্বমত থাকে, তা হলে নানা মতের সৃষ্টি হয়; অপর পক্ষে অধিকাংশ লোক মতশূন্য হলে যা সৃষ্টি হয়, তার নাম লোকমত। আর, এ কথা বলা বাহুল্য যে, একালে

লোকমতই হচ্ছে একমাত্র কেজো মত, কেননা ও-মতের অভাবে হয় কোনো বিলই পাস হয় না, নয় সকল বিলই পাস হয়।

এর কারণও খুঁজে বার করতে হবে না। নানা মত পরস্পরের সঙ্গে কাটাকাটি গিয়ে বাকি থাকে শুধু শূন্য, আর শূন্যে শূন্যে যোগ দিলে দাঁড়ায় গিয়ে বিরাট একে। এই সত্যই যে সার সত্য, তার প্রমাণ দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক, দু রকম অদ্বৈতবাদের মধ্যে সমান পাওয়া যায়।

২

উপরে যেসব সমস্যার ফর্দ দেওয়া গেছে, তার উপর সম্প্রতি আর-একটি সমস্যা এসে জুটেছে, যার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তার কোনো মীমাংসা নেই অথচ অনেক তর্ক আছে।

সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ সভ্য কি না। দেখতে পাচ্ছেন সমস্যাটা কত ঘোরতর, কত গুরুতর। এ সমস্যা অবশ্য রাজনৈতিকও নয়, সামাজিকও নয়, কিন্তু সকল প্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা ওরই অন্তর্ভূত।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, যার মীমাংসা নেই, এমন সমস্যা ওঠে কেন। তার উত্তর, একজনে এর পূর্বমীমাংসা করে দিয়েছেন বলেই আর পাঁচজনে তার উত্তরমীমাংসা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ফলে, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটা বিষম তর্কে।

উইলিয়ম আর্চার নামক জনৈক ধনুর্ধর ইংরেজি লেখক এবং প্রবীণ ভাবুক, ভারতের নানা দেশ পর্যটন করে অবশেষে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে, ভারতবাসীরা হচ্ছে অসভ্য জাতিদের মধ্যে সব-চাইতে সভ্য এবং সভ্য জাতিদের মধ্যে সব-চাইতে অসভ্য।

অমনি আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি।

এ কথায় কিন্তু বিচলিত হবার কোনো কারণ আমি দেখতে পাই নে। উইলিয়ম আর্চারের মত যদি সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি। আমরা যদি সভ্যতার মধ্যপথ অবলম্বন করে থাকি, তা হলে তো আমরা আরিস্টটলের মতে ঠিক পথই ধরেছি, বৌদ্ধ মতেও তাই। আর সেকেলে দর্শন যদি বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে বলি হেগেলের মতেও দাঁড়ায় এই যে, সভ্যতা (thesis) + অসভ্যতা (antithesis) = সভ্যাসভ্যতা (synthesis); অর্থাৎ আমাদের সভ্যাসভ্যতাটা হচ্ছে synthetic civilization। অতএব

সর্বশ্রেষ্ঠ। বেশি অসভ্য হওয়া যে ভালো নয়, সে তো পুরানো সত্য ; আর বেশি সভ্য হওয়াও যে মারাত্মক, এই নতুন সত্য তো ইউরোপে হাতে-হাতে প্রমাণ হয়ে গেল। এক দিকে সভ্যতা আর এক দিকে অসভ্যতা, এই দুই চাপের ভিতর পড়াটা অবশ্য সুখের অবস্থা নয় ; কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা যে সুখের অবস্থা, এমন কথা আর যেই বলুক, আমরা তো কখনো বলি নে।

আর-এক কথা, কি সভ্যতা কি অসভ্যতা এ দুয়ের কোনোটিরই ভিতর মানুষের শান্তি নেই— না দেহের না মনের। যারা নিজেদের অসভ্য বলে জানে, তারা সভ্য হবার জন্য লালায়িত হয় ; আর যারা নিজেদের সভ্য বলে জানে, তারা স্বাভাবিক হবার জন্য লালায়িত হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন অতি-সভ্য হল, তখন ভারতবাসী সভ্যতার শিক্‌লি কেটে বনে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ; এবং একই অবস্থায় একই কারণে গ্রীকরা হল ফিলজফর আর রোমানরা খৃস্টান। তার পর যখন নব রোমক-খৃস্টান-সভ্যতা পুরোপুরি গড়ে উঠল, তখন রুসো সকলকে পরামর্শ দিলেন আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে —অমনি দেশসুদ্ধ লোক মেতে উঠল। অপরপক্ষে যাদের জ্ঞান তারা অসভ্য, তারা যে সভ্য হবার জন্য আঁকুবাঁকু করে তার প্রমাণ কি আর উদাহরণের অপেক্ষা রাখে? অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শান্তি যদি কোথায়ও থাকে তো সভ্যতা আর অসভ্যতার মিলনক্ষেত্রে ; কেননা ও-ক্ষেত্রে অসভ্যতা সভ্যতার এবং সভ্যতা অসভ্যতার তেজ বিলকুল ও বেমালুম মেরে দেয়। সুতরাং একাধারে সভ্য এবং অসভ্য হওয়াটাই বুদ্ধিমান জাতের কাজ ; আর আমাদের মাথায় যে মগজ নেই, এমন কথা উইলিয়ম আর্চারও বলেন না।

আমার এসব কথা যতই যুক্তিযুক্ত হোক-না কেন, আমার মত কেউ গ্রাহ্য করবেন না। কেননা একদল প্রমাণ করতে যেমন ব্যস্ত যে আমরা অতি-সভ্য, আর একদল প্রমাণ করতে তেমনি ব্যস্ত যে আমরা অতি-অসভ্য। সুতরাং এ দুই দলকে কেউ ঠেকাতে পারবে না ; তাঁরা তর্ক করবেনই, শুধু উইলিয়ম আর্চারের সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গেও।

এ উভয়কেই আমি বলি, স্থিরো ভব। আমরা যে অসভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি। আর আমরা যে সভ্য, এ প্রমাণ করবারই বা সার্থকতা কি। কেউ যদি প্রমাণ করে দেয় যে আমরা অসভ্য, তা হলেই কি আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে, না, আমাদের জীবনের সকল সমস্যা উড়ে যাবে?

তা অবশ্য কখনোই হবে না, উপরন্তু আর-একটা সমস্যা বাড়বে, সে হচ্ছে সভ্য হবার মহাসমস্যা।

অপর পক্ষে আমরা যদি প্রমাণ করে দিই যে আমরা সভ্য, তা হলেই কি আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, না, আমাদের জীবনের সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে? তা অবশ্য কখনোই হবে না। কেননা নিজের সার্টিফিকেট নিজের কোনো কাজে লাগে না, ব্যক্তির পক্ষেও নয় জাতির পক্ষেও নয়। তা ছাড়া নিজের দরখাস্তের বলে, এ ক্ষেত্রে পরের কাছ থেকে ভালো সার্টিফিকেট আমরা কিছুতেই আদায় করতে পারব না। সভ্যতা সম্বন্ধে প্রতি জাত নিজেকে সোঽহং মনে করে, কিন্তু অপর কোনো জাতকে তত্ত্বমসি বলতে প্রস্তুত নয়। তবে প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে এ কথা অবশ্য খাটে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সুখ্যাতি যে ইউরোপের মুখে আর ধরে না, এ কথা কে না জানে। তার কারণ এই যে, যে সভ্যতা মরে ভূত হয়ে গেছে, উঁচুগলায় তার গুণগান করবার ভিতর কোনো বিপদ নেই; কেননা কোনো জ্যান্ত সভ্যতার উপর ওসব মরা সভ্যতার কোনো দাবি নেই। প্রাচীন ও মৃত সভ্যতা কোনো বর্তমান সভ্যতার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারে না, কিন্তু বর্তমান সভ্যতা তার কাছ থেকে ঢের আদায় করে, এবং তার নুন খায় বলেই তার গুণ গায়। ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রীস-রোমের সভ্যতার মত প্রাচীন হলেও প্রশস্য নয়; কেননা তা মৃত নয়, জীবিত। এ সভ্যতার অমার্জনীয় অপরাধ এই যে, তা আজও বেঁচে আছে, এবং বহুকাল বেঁচে আছে বলে আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে চায়; তাই তার দাবির আর অন্ত নেই। এ সভ্যতার সপক্ষে ইউরোপের সার্টিফিকেট বার করা অসম্ভব। আর যদিই বা করা যায়, তাতেই বা কি লাভ? আমাদের জাতীয় সমস্যার আশু মীমাংসা ততটা নির্ভর করবে না আমাদের প্রাচীন সভ্যতা কিংবা অসভ্যতার উপর যতটা নির্ভর করবে ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা কিংবা অসভ্যতার উপর।

যদি কেউ বলেন যে, ইউরোপের খাতিরে নয়, সত্যের খাতিরে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, ভারতবর্ষ সভ্য— তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ও চেষ্টায় উলটো উৎপত্তি হবারই সম্ভাবনা বেশি। মানুষ যেমন মুখের জোরে নিজেকে অপরের চাইতে বেশি ভদ্র প্রমাণ করতে গিয়ে শুধু অভদ্রতারই পরিচয় দেয়, জাতিও তেমনি নিজেকে অপরের চাইতে বেশি সভ্য প্রমাণ করতে গিয়ে

শুধু অসভ্যতারই পরিচয় দেয়। এর প্রথম কারণ, সভ্যতা প্রমাণ করতে হয় হাতে-কলমে, কাগজে-কলমে নয়; কেননা ও-বস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির বলে নয়, কর্মের ফলে। এর দ্বিতীয় কারণ, মানুষ সভ্য হলেও মানুষই থাকে; সভ্য মানবেরও সত্তার মূলে রয়েছে আদিম মানব। সুতরাং মানুষ যখন অবিশ্বাসী লোকের সুমুখে নিজেকে সভ্যমানব বলে খাড়া করতে যায়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ও-ক্ষেত্রে যাকে খাড়া করা হয় সে হচ্ছে আদিম মানব; কেননা এরকম কাজ মানুষে এক রাগের মাথায় ছাড়া আর কোনো অবস্থায় করে না। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা থাকলে মানুষে যে এ কাজ করে না, তার কারণ ও-কাজ করা হয় অনাবশ্যক, নয় নিরর্থক। সভ্যতা ব'লে যদি মানব-সমাজে কোনো-এক বস্তু থাকে, তা হলে সভ্যসমাজ মাত্রেই তার সঙ্গে পরিচিত। যা প্রত্যক্ষ, তার অস্তিত্ব প্রমাণ অনাবশ্যক। আর অসভ্যের কাছে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কেননা কোনো প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা অসভ্যের কাছে সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা যাবে না।

মতান্তরে সভ্যতা এক বস্তু নয়, কিন্তু দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা হরেক রকমের হয়ে থাকে। সভ্যতার ভিতরও বিশিষ্টতা আছে, এবং সভ্যতায় আর সভ্যতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের মিলন কস্মিন্‌কালেও হবে না। এ মতের চরম বাণী হচ্ছে কিপ্‌লিঙের এই কথা—

The East is East and the West is West, and never the twain shall meet.

এ কথা দেশে-বিদেশে অনেকে বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু আমার কাছে বরাবর তা নিরর্থক প্রলাপ বলেই মনে হয়েছে, কেননা ও-কথার অর্থ আমি কখনো বুঝতে পারি নি। সম্প্রতি বৃটিশ সভ্যতার একটি অগ্রগণ্য মুখপত্রে তার ব্যাখ্যা দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। SPECTATOR লিখেছেন, কিপলিঙের ও-কথার সাদা অর্থ হচ্ছে—

Black is black and white is white.

এ ব্যাখ্যা যে অতি বিশদ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সেইসঙ্গে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, স্পেক্টেটর বৃটিশ সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু বৃটিশ অসভ্যতারই পরিচয় দিয়েছেন। এর পর নিজের সভ্যতার বিশিষ্টতার ব্যাখ্যান করতে সকলেরই ভয় পাওয়া উচিত।

কোনো সভ্যতার বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ করে নজর দেওয়াতেও বিপদ

আছে। ও অবস্থায় বিশিষ্টতাকেই সভ্যতা বলে মানুষের সহজে ভুল হয়। অপর সমাজের সঙ্গে নিজের সমাজ যে অংশে বিভিন্ন, সেই অংশকেই নিজের সভ্যতার প্রধান অঙ্গ বলে অহংকার করবার লোভ যায়। শুধু তাই নয়, তখন সেই অঙ্গকেই যেন-তেন-প্রকারেণ রক্ষা করবার জন্য মানুষ বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে ; আর তার ফলে যদি সমাজের সকল অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায়, তাতেও সমাজ তার নিজের গোঁ ছাড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ, এই প্যাটেল-বিলের বিপক্ষ দলের কথাই ধরা যাক-না। এঁরা বলেন, জাতিভেদ-প্রথা যখন হিন্দুসমাজ ছাড়া অপর কোনো সভ্যসমাজে নেই, তখন হিন্দুসভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথা। অতএব হিন্দুসভ্যতার বিশিষ্টতা, অর্থাৎ জাতিভেদ-প্রথা, বজায় রাখতেই হবে, তার জন্য যদি হিন্দুজাতি ধূলাশায়ী হয়, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। এ কথা বলাও যা, আর স্পেক্টেটরের কথায় সায় দেওয়াও তাই। স্পেক্টেটরের এ মত শুধু একমাত্র বর্ণভেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ও রকম ঢেরা-সই দেওয়াতে বর্ণধর্মজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বর্ণজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না, ধর্মজ্ঞানেরও নয়। জাতিভেদ-প্রথা হিন্দুসমাজের গোড়ার কথা হলেও হিন্দুসভ্যতার শেষ কথা নাও হতে পারে।

সভ্যতার অবশ্য নানা রূপ, বিশেষ্য ও বিশেষণ আছে ; কিন্তু তার ক্রিয়া এক, এবং সে ক্রিয়া হচ্ছে মানবজীবনের মুখ্য ক্রিয়া, to be। এ কথায় অবশ্য তাঁরা আপত্তি করবেন, যাঁদের বিশ্বাস মানবপ্রকৃতির মূল ধাতু হচ্ছে to have। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, জীবনে কিছু পেতে হলে তার আগে কিছু হতে হয়। এক সভ্যতার সঙ্গে আর-এক সভ্যতার গড়নের পার্থক্য ঘটে শুধু বাহ্যবস্তুর আনুকূল্যে এবং প্রতিকূলতায়। এ পার্থক্য প্রাচীনকালে যেমন স্থূল ছিল, বর্তমানে তেমনি সূক্ষ্ম হয়ে আসছে ; তার প্রথম কারণ, একালে এক জাতির সঙ্গে আর-এক জাতির দেশের ও সেইসঙ্গে দেহের এবং মনেরও ব্যবধান কমে আসছে। আর তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, বর্তমানে মানুষ বস্তুজগতের ততটা অধীন নয়, বস্তুজগৎ মানুষের যতটা অধীন। জাতিতে জাতিতে মনের ও ব্যবহারের পার্থক্য কমে আসছে বলে এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, মানবজীবন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে। জাতিতে জাতিতে প্রভেদ যেমন কমে আসছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ তেমনি বেড়ে চলেছে। এককথায় বিশিষ্টতা এখন জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতের মানবসভ্যতা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুণে অপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করবে

এবং এই বিচিত্রতাই হবে তার বিশিষ্টতা। অন্ততঃ আমাদের সভ্যতার জন্যে সে ভাবনা নেই। ভারতবর্ষ যদি একদেশ হিসেবে ধরা যায়, তা হলে সে দেশের সভ্যতা যুগপৎ হরবোলা ও বহুরূপী হতে বাধ্য।

ভবিষ্যতে যা হবার সম্ভাবনা তা নাও হতে পারে; কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তা যে হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। এবং প্রতি প্রাচীন সভ্যতার যে একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ ধর্ম আছে, সে কথাও অস্বীকার করা অসম্ভব। অথচ এসকল সভ্যতার সামাজিক ব্যবহার এবং মনোভাবের মিলও বড় কম নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে গ্রীক রোমান এবং হিন্দু সভ্যতার ভিতর ঠিক ততখানি মিল আছে গ্রীক লাটিন ও সংস্কৃত ভাষার ভিতর যতখানি মিল আছে; এবং সে মিল প্রথমতঃ কম নয়, দ্বিতীয়তঃ তা ধাতুগত। যদিচ আমি পণ্ডিত নই, তবুও এ মত গ্রাহ্য করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই। তার কারণ, আমার বিশ্বাস, সকল সভ্যতারই ধাতু এক, প্রত্যয় শুধু আলাদা। সে যাই হোক, যে-ক'টি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, সে সবগুলিই, আমার মনে হয়, একজাতীয়, অর্থাৎ আমার কাছে তার প্রতিটি হচ্ছে এক-একখানি কাব্য। কাব্যে-কাব্যে যে প্রভেদ থাকে এদের পরস্পরের ভিতর সেই প্রভেদ মাত্র আছে। আমার মতে গ্রীক সভ্যতা হচ্ছে নাটক, রোমান সভ্যতা মহাকাব্য, ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট; আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে রূপকথা। সভ্যতার সঙ্গে কাব্যের তুলনা দেওয়ায় যদি কেউ আপত্তি করেন, তা হলে বলি, ও-তুলনা একটা খামখেয়ালির ব্যাপার নয়। আমরা প্রাচীন সভ্যতার যেসব মূর্তি গড়ি— হয় পূজা করবার জন্য, নয় মনের ঘর সাজাবার জন্য— অতীত শুধু তার উপাদান জোগায়, তাও আবার অতি স্বল্পমাত্রায়; সেই উপাদানকে আমাদের কল্পনাশক্তি গড়ন ও রূপ দেয়, এবং সেই রূপকে আমরা আমাদের হৃদয়রাগে রঞ্জিত করি। কাব্যরচনার পদ্ধতিও ঐ।

সত্য কথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবতঃ সব-চাইতে বড় আর্ট। কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে তোলবার আর্ট, আর বাদ-বাকি যত-কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্তৃকই পরিপুষ্ট।

এ কথা অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এবং দার্শনিকেরা মানবেন না; কেননা বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, সভ্যতা জন্মে মাটির গুণে; আর দার্শনিকের বিশ্বাস,

ও-বস্তু পড়ে আকাশ থেকে। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্যের জন্মদাতা যেমন কবি, সভ্যতার জন্মদাতাও তেমনি মানুষ। এ বস্তুর তত্ত্ব বিজ্ঞান-দর্শন কখনো আবিষ্কার করতে পারবে না, কেননা ও হচ্ছে জীবনের একটি postulate, জ্ঞানের axiom নয়। অর্থাৎ মানুষের মন ছাড়া সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথাও নেই।

সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিশিষ্টতা প্রমাণ করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। উইলিয়ম আর্চার প্রভৃতি সে বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ মানেন; আমাদের উপর তাঁদের রাগ এই যে, আমরা আমাদের প্রাচীনতা ত্যাগ করে নবীন হবার চেষ্টা করছি। ফলে আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীণ-নবীন ওরফে সভ্যাসভ্য। East এবং West যে ভারতবর্ষে meet করেছে, এই হচ্ছে আমাদের অপরাধ; কেননা এই মিলনের ফলে কতকগুলি দুরন্ত সমস্যা জন্মলাভ করেছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি আমরা?

পূর্বাপর সভ্যতার এই মিলন ও মিশ্রণ যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়, তার প্রমাণ ইউরোপের বর্তমান সভ্যতাও তো প্রবীণ-নবীন, ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী যার নাম দিয়েছেন antico-modern। বর্তমান ইউরোপীয়েরা যে-অংশে ও যে-পরিমাণে জ্ঞানে গ্রীক কর্মে রোমান ও ভক্তিতে ইহুদি, সেই অংশে ও সেই পরিমাণে তারা সভ্য, এবং বাদবাকি অংশে তারা হচ্ছে শুধু সাদা মানুষ।

যদি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা অ্যান্টিকো-মডার্ন হতে পারে, তো ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা কেন যে অ্যান্টিকো-মডার্ন হতে পারবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটু প্রভেদ আছে। ইউরোপ তার নবীন সভ্যতার গায়ে প্রাচীন সভ্যতার কলম বসিয়েছে, অপর পক্ষে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতার গায়ে নবীন সভ্যতার কলম বসাচ্ছে। ফল কোন্‌টায় ভালো ফলবে, সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষায়ুর্বেদীরা। তবে সহজ বুদ্ধিতে তো মনে হয় যে, নূতনের ঘাড়ে পুরাতনকে ভর করতে দেওয়ার চাইতে নূতনকে পুরাতনের কোলে স্থান দেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

সুতরাং আমরা সভ্য কি অসভ্য, সে বিষয়ে আমাদের মাথা বকাবার দরকার নেই, কেননা এখন আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য সমস্যার। প্রথমে যে-ক'টি সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে যে তিনটি বিল-আকার

ধারণ করেছে তাদের সম্বন্ধেও বেশি কিছু ভাববার নেই, কেননা এ কথা নিশ্চিত যে, রাউলাট-বিল পাস হবে প্যাটেল-বিল হবে না, এবং রিফর্ম্-বিল পাস হবে ও হবে না। যে দুটি বাকি থাকল, শিক্ষা ও শিল্প, সে দুটিই হচ্ছে এ যুগের আসল সমস্যা; কারণ এ দুটির মীমাংসার ভার অনেকটা আমাদের হাতে, এবং এ দুটির আমরা যদি সুমীমাংসা করতে পারি তা হলে আমরা সভ্য কি না, সে প্রশ্ন আর উঠবে না।

১৩২৫ ফাল্গুন

ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি

একটি পারিবারিক সমিতিতে পঠিত

হে সমিতির কুমার ও কুমারীগণ, তোমাদের সমিতির কর্ণধার ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির সঙ্গে তোমাদের দু কথায় পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। জিয়োগ্রাফি বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, সাহিত্যের নয়; আর এ কথা সবাই জানে যে, আমি সাহিত্যিক হলেও হতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নই। তবে যে আমি এ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হয়েছি, তার কারণ অনধিকারচর্চা করবার কুঅভ্যাস ও দুঃসাহস দুই আমার আছে।

কিন্তু প্রথমেই এক মুশকিলে পড়েছি। সকল বিজ্ঞানের মত জিয়োগ্রাফিরও একটা বিশেষ পরিভাষা আছে। সে পরিভাষা মূলতঃ ইংরেজি। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে পরিভাষা আছে, তা হয় সংস্কৃত নয় ইংরেজির অনুবাদ। সেসব সংস্কৃত কথার অর্থ বুঝতে হলে তাদের আবার মনে মনে ইংরেজি ভাষায় উলটে অনুবাদ করে নিতে হয়। একটি উদাহরণ দিই। অন্তরীপ ও cape, এ দুটি কথাই বাঙালির কাছে সমান অপরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ কেপ্ শব্দটিই তোমরা স্কুলঘরে বেশি বার শুনেছ, অতএব তোমাদের কাছে বেশি পরিচিত। অপর পক্ষে উত্তমাশা অন্তরীপ বললে আমরা ভাবতে বসে যাই, জিনিসটা কী। আর ততক্ষণ চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাই নে, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে, ও হচ্ছে কেপ্ অব গুড হোপ -এর বাংলা নাম। আর শৃঙ্গ-অন্তরীপ (কেপ্ হর্ন) শুনলে তো আমরা অগাধ জলে পড়ি। আর সে জলে পড়লে আর উদ্ধার নেই, কারণ সে জল বরফ জল।

আমাদের পরিভাষার দশা যখন এরূপ মারাত্মক, তখন আমি যতদূর সম্ভব পরিভাষা পরিত্যাগ করে আমার কথা ভাষায় বলতে চেষ্টা করব। যেখানে অগত্যা পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হব, সেখানে ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করব। এ প্রস্তাব শুনে আমার হাতে বাংলা ভাষার জাত মারা যাবে ভেবে তোমরা ভীত হোয়ো না। ইংরেজি বিজ্ঞানের পরিভাষাও ইংরেজি নয়, গ্রীক। আর গ্রীক সভ্যতার বয়েস আড়াই হাজার বৎসর। সুতরাং তার স্পর্শে আমাদের ভাষার আভিজাত্য একেবারে নষ্ট হবে না। ভারতবর্ষের

সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার আর-কোনো বিষয়ে মিল না থাকুক, বয়েসে মিল আছে।

ভূমণ্ডল

প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে পৃথিবী নামক গোলকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। এ গোলকটি ক্ষিতি আর অপ্— মাটি আর জল— এই দুই ভূতে গড়া। আর এ গোলকের বহিঃপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে জল, আর এক ভাগ স্থল।

আমরা অবশ্য পৃথিবী বলতে প্রধানতঃ মাটিই বুঝি। তার প্রমাণ আমরা একে ভূমণ্ডল বলি। এর কারণ আমরা ভূচর জীব, অর্থাৎ মাটির উপর বাস করি। জলচর জীবদের যদি শুধু জল-পিপাসা নয়, সেইসঙ্গে জ্ঞান-পিপাসা থাকত ও সেইসঙ্গে তাদের জ্ঞান তরল ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকত, তা হলে তারা জিয়োগ্রাফি না রচনা করে রচনা করত হাইড্রোগ্রাফি। আর তারা কবিতা লিখত 'আমার জন্মজলের' উপর। আর আমরা যাকে বলি মধুর রস, তার নাম তারা দিত লবণ রস। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত, অর্থাৎ আমরা মনে-প্রাণে কতটা জিয়োগ্রাফির অধীন।

পৃথিবীর ভাগ

এখন শোনো, মাটি কিন্তু একলপ্ত ভাবে নেই, খণ্ড খণ্ড ভাবে আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেন যে, মেদিনী সপ্তদ্বীপ আকারে ব্যক্ত হয়েছে।

এই দ্বীপ শব্দটার অর্থ তোমরা সবাই জান। যার চারিদিকে জল আর মাঝখানে স্থল, তাকেই আমরা বলি দ্বীপ। এ হিসাবে আজকের দিনে পৃথিবীতে সাতটি নয়, অসংখ্য দ্বীপ আছে। সমুদ্রের মধ্যে থেকে অসংখ্য ছোটবড় দ্বীপ মাথা তুলে রয়েছে।

সুতরাং এ স্থলে সপ্তদ্বীপ অর্থে সাতটি মহাদ্বীপ বুঝতে হবে। এই মহাদ্বীপকে আমরা একালে মহাদেশ বলি। আজকের দিনে আমরা পৃথিবীকে চারটি মহাদেশে ভাগ করি, যথা: ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা; অস্ট্রেলিয়াকে আমরা আজও মহাদ্বীপ বলেই জানি, মহাদেশ বলে মানি নে।

মহাদেশ বলতে যদি মহাদ্বীপ বোঝায়, তা হলে পৃথিবীতে চারটি নয়, তিনটি মাত্র মহাদ্বীপ আছে: প্রথম ইউরেশিয়া, দ্বিতীয় আফ্রিকা, তৃতীয় আমেরিকা। গ্লোবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে যে, গোটা

ইউরোপ ও গোটা এশিয়ার ভিতর কোথাও জলের ব্যবধান নেই। এ দুই দেশের জমি একলপ্ত। আর এই আদি মহাদেশটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। এর উত্তরে আর্কটিক সী, দক্ষিণে ইণ্ডিয়ান ওশন, পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক ও পূর্বে প্যাসিফিক ওশন; আর আফ্রিকার উত্তরে ও পশ্চিমে অ্যাটলান্টিক এবং দক্ষিণে ও পূর্বে ইণ্ডিয়ান ওশন। আর আমেরিকার পশ্চিমে প্যাসিফিক, পূর্বে অ্যাটলান্টিক, উত্তরে উত্তর-আর্কটিক ও দক্ষিণে দক্ষিণ-আর্কটিক সাগর। ইউরেশিয়ার সঙ্গে অপর দুটি মহাদেশের গড়নেরও একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। ইউরেশিয়ার বিস্তার পুব হতে পশ্চিমে, অপর দুটির উত্তর হতে দক্ষিণে। অর্থাৎ ইউরেশিয়া লম্বার চাইতে চওড়ায় বেশি; আফ্রিকা ও আমেরিকা চওড়ার চাইতে লম্বায় বেশি। এই আকারভেদ এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের অনেক প্রভেদ ঘটিয়েছে।

তোমরা সবাই জান যে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকাকে আমরা প্রাচীন পৃথিবী বলি ও আমেরিকাকে নবীন। এর প্রধান কারণ প্রাচীন পৃথিবীর লোক পাঁচ শ বৎসর পূর্বে আমেরিকার অস্তিত্বের কথা জানত না। অতএব, এ নাম শুধু লৌকিক, বৈজ্ঞানিক হিসেবে ঠিক নয়। তা ছাড়া, অনেক বিষয়ে এই নতুন পৃথিবী প্রাচীন পৃথিবীর ঠিক উলটো। বিলাতে (গ্রীনউইচ) যখন দিনদুপুর, আমেরিকায় (নিউ অর্‌লিন্‌স্‌) তখন রাতদুপুর। কেন এ রকম হয়, সে কথা আর আজ বলব না; কারণ তা বোঝাতে হলে আমাকে মাটি থেকে আকাশে উঠতে হবে। এ ব্যাপারের ব্যাখ্যার ভিতর শুধু পৃথিবী নয়, সূর্যচন্দ্রকেও টেনে আনতে হবে। কেননা জিয়োগ্রাফি কতক হিসেবে অ্যাস্‌ট্রনমির অন্তর্ভূত। আর অ্যাস্‌ট্রনমি তোমরাও জান না, আমিও জানি নে।

উত্তরখণ্ড দক্ষিণখণ্ড

আর-একটি কথা শোনো। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে এই বিশ্ব আদিতে ছিল ব্রহ্মাণ্ড নামে একটি অণ্ড। পরে ভগবান সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড ক'রে তার উর্ধ্বখণ্ড দিয়ে স্বর্গ ও অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন, আর এ দুয়ের মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু একালে আমরা পৃথিবীকে আধখানা ডিমের সঙ্গে তুলনা করি নে; আমরা বলি পৃথিবীর চেহারা ঠিক একটি কমলালেবুর মত।

সেই কমলালেবুটিকে যদি ঠিক মাঝখানে কাট, তা হলে এই কাটা জায়গাটার নাম হবে ইকোয়েটর; তার উপরের আধখানার নাম হবে উত্তর

হেমিস্‌ফিয়ার, আর নীচের অংশটির নাম হবে দক্ষিণ হেমিস্‌ফিয়ার। পৃথিবীর এই দুই খণ্ডের চরিত্র কোনো কোনো বিষয়ে ঠিক পরস্পরের বিপরীত। যথা, উত্তরাখণ্ডে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণাখণ্ডে তখন শীতকাল। তার পর এই দুই খণ্ডের গড়নেও ঢের প্রভেদ আছে। দক্ষিণাখণ্ডে যতখানি মাটি আছে, উত্তরাখণ্ডে প্রায় তার দ্বিগুণ আছে। এর থেকে অনুমান করতে পার যে, উত্তরাখণ্ডের জলবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণাখণ্ডের জলবায়ুর বিশেষ প্রভেদ আছে। আর জলবায়ুর প্রভেদ থেকেই ভৌগোলিক হিসেবে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রভেদ হয়। তোমরা সবাই জান যে, জল ও বায়ু স্থির পদার্থ নয়— ও দুইই চঞ্চল, ও দুয়েরই স্রোত আছে। অপ্‌ ও মরুতের স্রোতের মূল কারণ হচ্ছে সূর্যের তেজ ; কিন্তু ক্ষিতি এই দুই স্রোতকে বাধা দিয়ে তাদের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডে বেশি পরিমাণ মাটি আছে, সে খণ্ডের জলবায়ুর গতি, যে খণ্ডে জল বেশি, সে দেশ হতে বিভিন্ন।

ইউরেশিয়া

এখন ইউরেশিয়ার বিশেষত্ব এই যে, এ মহাদেশটি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উত্তর খণ্ডের অন্তর্ভূত। অপর পক্ষে আমেরিকা ও আফ্রিকার কতক অংশ উত্তর খণ্ডে ও কতক অংশ দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত। এর ফলে আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সে বস্তু ক্ষিত্যপতেজমরুদ্‌ব্যোমের কৃপায় ইউরেশিয়াতেই জন্মলাভ করেছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা সভ্যতার জন্মভূমি নয়। ও দুই মহাদেশে যে সভ্যতার আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে সভ্যতা ইউরেশিয়া হতে আমদানি। সমগ্র আমেরিকা ও আফ্রিকার উত্তর-দক্ষিণ ভাগ তো ইউরোপের উপনিবেশ। আর পুরাকালে আফ্রিকার যে অংশে সভ্যতা প্রথম দেখা দেয়, সেই ইজিপ্ট উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভূত ও এশিয়ার সংলগ্ন। সুতরাং এ অনুমান করা অসংগত হবে না যে, সে সভ্যতার জন্মভূমি হচ্ছে এশিয়া, আর সেকালে ইজিপ্ট ছিল এশিয়ার একটি উপনিবেশ।

এর থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে, কোনো দেশের ইতিহাস বুঝতে হলে সে দেশের জিয়োগ্রাফিও আমাদের জানা চাই। এ যুগের মানুষ জিয়োগ্রাফির তাদৃশ অধীন না হলেও আদিতে যে বিশেষ অধীন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস জানতে আমরা সবাই উৎসুক। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের জমির উপরেই গড়ে উঠেছে, সেইজন্যই সেই জমির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যত হয়েছি। এখন এই-ক'টি

কথা তোমরা মনে রেখো যে, এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত ও তার সঙ্গে নানারূপ যোগসূত্রে আবদ্ধ। তার পর এই পৃথিবীর উত্তরাখণ্ডে ইউরেশিয়া অবস্থিত। আর এই মহাদেশের যে অংশকে আমরা এশিয়া বলি, ভারতবর্ষ তারই একটি ভূভাগ। আর এই ভূভাগের রূপগুণ বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে সৌরমণ্ডল থেকে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পর পৃথিবী থেকে তার উত্তরাখণ্ডকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পর তার উত্তরাখণ্ড থেকে ইউরেশিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পর ইউরেশিয়া থেকে এশিয়াকে পৃথক্ করে নিয়ে, তার পর এশিয়া থেকে অপরাপর দেশকে বাদ দিলে তবে আমরা ভারতবর্ষ পাই। এ দেশ অপরাপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। সুতরাং একে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার বর্ণনা করা যায়। আমি পূর্বে বলেছি যে, বিদেশের সামান্য জ্ঞান না থাকলে স্বদেশেরও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কথা সত্য। কিন্তু অপর পক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, স্বদেশের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে বিদেশের সামান্য জ্ঞান লাভ করা কঠিন। ও ক্ষেত্রে আমরা নাম শিখি, কিন্তু দেশ চিনতে শিখি নে। এই কারণে আজকাল এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রথমে বাড়ির জিয়োগ্রাফি শিখে, তার পর দেশের জিয়োগ্রাফি শেখাই কর্তব্য। কারণ ছোটর জ্ঞান থেকেই মানুষকে বড়র জ্ঞানে অগ্রসর হতে হয়, ঘর থেকেই বাইরে যেতে হয়। আমি যে এ প্রবন্ধে তার উলটো পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, বড় থেকে ছোটতে, বাইরে থেকে ঘরে আসছি, তার প্রথম কারণ আমি বৈজ্ঞানিক নই— সাহিত্যিক; আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি তোমাদের মনে এই সত্যটি বসিয়ে দিতে চাই যে, ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়।

এশিয়া

এশিয়া ব'লে ইউরোপ থেকে কোনো পৃথক্ মহাদেশ নেই, এ কথা তোমাদের পূর্বেই বলেছি। কিন্তু বহুকাল থেকে মানুষ এই এক মহাদেশকে দুই মহাদেশ বলে আসছে। ভৌগোলিক হিসাবে না হোক, লৌকিক মতে এশিয়া একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলে যখন গ্রাহ্য, তখন এ ভূভাগকে একটি পৃথক মহাদেশ বলে মেনে নেওয়া যাক।

ভারতবর্ষ এই মহাদেশের অন্তর্ভূত, অতএব এশিয়ার চেহারাটা এক-নজর দেখে নেওয়া যাক।

এ যুগের জাপানের একজন বড় কলাবিদ্ ও সাহিত্যিক কাকুজো

ওকাকুরা, তাঁর *The Ideals of the East* নামক গ্রন্থের আদিতেই বলেছেন যে, Asia is one। এ কথাটা Eastএর ideal হতে পারে, কিন্তু বস্তুগত্যা সত্য নয়।

ভৌগোলিক হিসেবে এশিয়া চারটি উপ-মহাদেশে (সাব-কন্টিনেন্ট) বিভক্ত। কি হিসেবে এশিয়াকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়, তা এখন শোনো।

মনুভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন যে—

জগৎ সরিৎ সমুদ্রা শৈলাদ্যাত্মকম্

অর্থাৎ এ জগৎ নদী সমুদ্র ও পাহাড় দিয়ে গড়া। জগৎ সম্বন্ধে এ কথাটা যে কতদূর সত্য, তা বলতে পারি নে— তবে একেবারে যে বাজে নয়, তার প্রমাণ চন্দ্র উপগ্রহে পাহাড় আছে, মার্স গ্রহে নদী আছে এবং সম্ভবতঃ অপর কোনো গ্রহে সমুদ্রও থাকতে পারে। সে যাই হোক, পৃথিবী সম্বন্ধে মেধাতিথির উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর, এই তিন বস্তুই পৃথিবীকে নানাদেশে বিভক্ত করে রেখেছে।

সমুদ্রের ব্যবধানেই যে মহাদেশ হয়, তার কারণ সমুদ্র আগে ছিল অলঙ্ঘ্য আর এখন হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য। শৈলমালা সমুদ্রের চাইতে কিছু কম অলঙ্ঘ্য বা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সুতরাং পর্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক্ করে রাখে।

কালিদাস বলেছেন যে—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

ভারতবর্ষের উত্তরে স্থিত যে পর্বতশ্রেণীর স্বদেশী অংশকে আমরা হিমালয় বলি, তা অবশ্য এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করছে না। কিন্তু হিমালয় বলতে আমরা যদি সেই শৈলমালা বুঝি, যে পর্বতশ্রেণী সমগ্র এশিয়ার মেরুদণ্ড, আর যাকে এ যুগের ভৌগোলিকরা সেন্ট্রাল মাউন্টেন্স্ আখ্যা দিয়েছেন— তা হলে আমরা কালিদাসের উক্তি সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। এ নগাধিরাজ সত্যসত্যই এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম তোয়নিধিতে অবগাহন করে অবস্থিতি করছে। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এ পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। আর পৃথিবী বলতে যদি আমরা শুধু প্রাচীন পৃথিবী বুঝি, তা হলে তো কালিদাসের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। কারণ এশিয়ার এই সেন্ট্রাল মাউন্টেন্স্ হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর মিড্-ওঅর্ল্ড্ মাউন্টেন্স্এরই

অংশ। তার পর এ সমগ্র পর্বতশ্রেণীকে হিমালয় বলা যেতে পারে ; কেননা এ পর্বতের অধিকাংশই চিরহিমের আলয়।

এই হিমালয়, ভাষান্তরে সেণ্ট্রাল মাউনটেন্স্এর মত বিরাট প্রাচীর পৃথিবীর আর কোনো মহাদেশকে দু ভাগে বিভক্ত করে নি। এ প্রাচীরের উত্তরদেশকে এশিয়ার উত্তরাপথ এবং দক্ষিণদেশকে দক্ষিণাপথ বলা যেতে পারে। এই প্রাচীর যে কত উঁচু তা তো তোমরা সবাই জান। এই ভারতবর্ষের উত্তরেই এর পাঁচটি শৃঙ্গ আছে, যার প্রতিটির উচ্চতা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ফুটের চাইতেও বেশি। কাশ্মীরে নাংঘা পর্বত উঁচুতে ২৬,৬২১ ফুট, তিব্বতে নন্দাদেবী ২৫,৬৪৫, নেপালে ধবলাগিরি ২৬,৭৯৯ ফুট, এভারেস্ট ২৯,০০২, কিন্‌চিন্‌জঙ্গা ২৮,১৪৬। এখন এ পর্বত প্রস্থে কত বড় তা শোনো।—

ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে দেশ আছে, সে দেশকে আমরা ইরান বলি ; আর উত্তরপশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে তুরান বলি। ইরান ও তুরানে এই পর্বত কোথাও চার শ মাইল, কোথাও আট শ মাইল চওড়া। এ মহা-পর্বতের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। তাদের মিলনভূমি হচ্ছে পামির অধিত্যকা। এ অধিত্যকাও প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এই পামিরের উত্তরে এ পর্বতের প্রস্থ হচ্ছে বারো শ মাইল, এবং এর সঙ্গে এ পর্বতের নিম্নাংশ অর্থাৎ উপত্যকাগুলি যদি যোগ দেওয়া যায়, তা হলে এ ব্যবধানের প্রস্থ হয় দু হাজার মাইল— অর্থাৎ হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা যতদূর, ততদূর। এর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে, এশিয়ার উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে এক দেশ বলা কতদূর সংগত।

এই কারণে এশিয়ার উত্তরাখণ্ডকে একটি উপমহাদেশ বলা হয় আর তার দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগকে দ্বিতীয়, পূর্ব ভাগকে তৃতীয়, তার মধ্য ভাগকে চতুর্থ উপমহাদেশ বলা যায়।

এই মধ্যদেশই ভারতবর্ষ। ভূমধ্য পর্বত থেকে এই চারটি উপমহাদেশ ঢাল হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে এসেছে। ফলে উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী, ও তারা সব গিয়ে পড়ে আর্কটিক সমুদ্রে ; পশ্চিম ভাগের জল গড়িয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরে, পূর্ব ভাগের জল প্রশান্ত মহাসাগরে ও মধ্যদেশের জল ভারত-মহাসাগরে। মধ্য এশিয়া পর্বতময়। আর এ পর্বত অর্ধেক এশিয়া জুড়ে বসে আছে। আর তার চারপাশের চার ভাগের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উত্তর দেশ অর্থাৎ সাইবিরিয়া সমতল ভূমি কিন্তু জলবায়ুর গুণে

মানুষের বাসের পক্ষে অনুকূল নয়। পশ্চিম একে পাহাড়ে, উপরন্তু নির্জলা দেশ। সে দেশের জমিতে ফসল একরকম হয় না বললেই চলে। ইরান-তুরানের অধিকাংশ লোক গৃহস্থ নয়, তারা অন্নের সন্ধানে তাঁবু ঘাড়ে করে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বাকি দুটি ভূভাগ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশ, মানুষের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এ দুটি দেশ মুখ্যতঃ সমতল ভূমি, আর সে ভূমি কর্ষণ করে অন্নবস্ত্র দুই লাভ করা যায়; অতএব এ দুই দেশের লোকই গৃহস্থ হয়েছে। আর শাস্ত্রে বলে মানুষের সকল আশ্রম গার্হস্থ্য-আশ্রমেরই বিকল্প মাত্র।

এশিয়াকে ত্যাগ করবার পূর্বে সে মহাদেশ সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলছি, যা শুনে তোমরা একটু চমকে যাবে। এ মহাদেশের ম্যাপে একটি দেশ ভুলক্রমে ঢুকে পড়েছে, যেটি ভৌগোলিক হিসেবে এশিয়ার নয়, আফ্রিকার অঙ্গ। সে দেশের নাম আরবদেশ। এই আরবদেশ প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার শাহারা মরুভূমিরই একটি অংশ। তোমরা বোধ হয় জান যে, মরুভূমির একটি ধর্ম হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশকে আক্রমণ করা। হাওয়ায় তার তপ্ত বালি উড়ে এসে পার্শ্ববর্তী দেশকে চাপা দেয়। তার স্পর্শে গাছপালা-তৃণপুষ্প সবই মারা যায়। মরুভূমির শুধু বালুকা নয়, তার বায়ুও সমান মারাত্মক। যে দেশের উপর দিয়ে সে বাতাস বয়ে যায়, সে দেশের রস-কষ একেবারে শুকিয়ে যায়। শাহারার এই নিজস্ব বাতাসের নাম ট্রেড উইন্‌ড্‌স। একবার গ্লোবের দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, এই ট্রেড উইন্‌ড্‌স চলার পথটি হচ্ছে আগাগোড়া পোড়ামাটি।

শাহারা মরুভূমি আরবদেশের ভিতর দিয়ে এসে প্রথমে পারস্যের দক্ষিণ ভাগকে, তার পর আরও এগিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশকে আক্রমণ করে। ফলে, আরব থেকে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এ আক্রমণে বাধা দিয়েছে রাজপুতানা। রাজপুতানার চিরগৌরব এই যে, এই রাজপুতানাই হিন্দুস্থানকে এই ক্রমবর্ধমান আফ্রিকার মরুভূমির কবল থেকে রক্ষা করেছে।

এই আরবদেশ যে ভুলক্রমে এশিয়ার ম্যাপে ঢুকে গেছে, তার কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত সমুদ্রকে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যে পরিখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায়, এ সমুদ্রও আসলে মরুভূমি। এর উপরে যেটুকু জল আছে, তা ভারত-মহাসাগরের দান।

ভারতবর্ষকে যদি এশিয়াখণ্ডের একটি উপমহাদেশ না বলে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলা যায়, তা হলেও কথাটা অসংগত হয় না।

ভারতবর্ষ মাপে ১৫,০০,০০০ বর্গ মাইল। এক চীন ব্যতীত এত বড় দেশ এশিয়ায় আর কোথাও নেই। এশিয়ার রুশিয়া ম্যাপে দেখতে প্রকাণ্ড দেশ; কিন্তু এর দক্ষিণাংশে এত বড় বড় হ্রদ মরুভূমি তৃণকান্তার ও পর্বত আছে যে, সে অংশটিকে একটি দেশ বলা যায় না। কারণ সে ভূভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য। আর এর উত্তরাংশের জমি সমতল হলেও আজও জমাট মাটি হয়ে ওঠে নি। এ দেশে গাছপালা অতি বিরল, যে দুটি-চারটি আছে তারা সব বামন। এ রকম দেশ যে কৃষিকার্যের জন্য অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে সাইবিরিয়া একরকম জনশূন্য বললেই হয়।

ভারতবর্ষ যে আকারে বিপুল, শুধু তাই নয়। এ দেশ এশিয়ার অপরাপর দেশ থেকে একরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর উত্তরে হিমালয়ের গগনস্পর্শী প্রাচীর; আর তিন দিকে ভারত-মহাসাগরের অতলস্পর্শী পরিখা। তোমরা ভেব না যে আমি ভুল করছি। আরব-সাগর বঙ্গ-উপসাগর প্রভৃতি নাম আমিও জানি; কিন্তু ওসব সাগর-উপসাগর ভারত-মহাসাগরেরই অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ তার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব কোণে শুধু অপর দেশের সঙ্গে সংলগ্ন। তার উত্তরপশ্চিমে আফগানিস্থান, এবং উত্তরপূর্বে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু এ দুই দিকেই আবার অতি দুর্গম পর্বতের ব্যবধান আছে। যে পর্বতশ্রেণী আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে হিন্দুস্থান থেকে পৃথক্ করে রেখেছে, সে পর্বতশ্রেণীর অবশ্য দুটি দুয়োর আছে—খাইবার পাস ও বোলান পাস—যার ভিতর দিয়ে এ দুই দেশে মানুষে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাগরের জলপথ।

দেখতে পাচ্ছ স্বয়ং প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ করে গড়েছেন।

এখন দেখা যাক, এই সমগ্র দেশটার আকার কি রকম। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলতেন। সম্ভবত পৃথিবী বলতে তাঁরা ভারতবর্ষ বুঝতেন। কেননা ভারতবর্ষ সত্যসত্যই ত্রিকোণ।

মানুষে যতক্ষণ জ্যামিতির কোনো মূর্তির সঙ্গে কোনো দেশকে মেলাতে না পারে, ততক্ষণ তার মনস্তুষ্টি হয় না; যদিও জ্যামিতির কোনো

আকারের সঙ্গে কোনো দেশই হুবহু মিলে যায় না। পৃথিবীকে আমরা বলি গোলাকার। কথাটা মোটামুটি সত্য। কিন্তু জ্যামিতির বৃত্তের উত্তরদক্ষিণ চাপা নয়। ইউক্লিডের তৃতীয় অধ্যায়ে কমলালেবুর কোনো স্থান নেই। এই কথাটা মনে রাখলে, মহাভারতে ভারতবর্ষকে যে একটি সমভুজ ত্রিকোণ দেশ বলা হয়েছে, সে উক্তিকে গ্রাহ্য করে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীতে এমন কোনোই দেশ নেই, যা সম্পূর্ণ একাকার। ভারতবর্ষও একাকার নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও নানা খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখি। রাজ্যের ভাগের সঙ্গে ভৌগোলিক ভাগের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। অর্ধেক পৃথিবী আজ ব্রিটিশরাজের অধীন; কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্যানেডা অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকে পাগল ছাড়া আর কেউ এক দেশ বলবে না। আমি যে ভাগের কথা বলছি, সে ভৌগোলিক ভাগ।

আমাদের শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরাণকারদের মতে ভারতবর্ষ নবখণ্ড। বরাহমিহির প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত, যদিচ এ দুয়ের বর্ণিত নবখণ্ডের মিল নেই। মহাভারতের মতে এ দেশ চার খণ্ডে বিভক্ত। চারটি equilateral triangleএর সমষ্টি হচ্ছে ভারতবর্ষ নামক বড় equilateral triangle। জ্যামিতির হিসেব থেকে যদিও এ বর্ণনা সত্যের কাছ ঘেঁষে যায়, কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব থেকে অনেক দূরে থাকে। সে যাই হোক, সংস্কৃত সাহিত্যে আর-একরকম ভাগের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ মোটামুটি দু ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম উত্তরাপথ, অপরটির দক্ষিণাপথ। এই লৌকিক ভাগটিই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক। উত্তরাপথ ভৌগোলিক হিসেবে দক্ষিণাপথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন।

হিমালয় যেমন সমস্ত এশিয়ার মেরুদণ্ড, বিন্ধ্যপর্বত তেমনি ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড। এ স্থলে আমি সাতপুরা ও আরাবলি পর্বতকে বিন্ধ্য নামে অভিহিত করছি। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যের দেশকে উত্তরাপথ বলা যায়, আর দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত থেকে ভারত-মহাসাগরের মধ্যবর্তী দেশকে দক্ষিণাপথ বলা যায়। কিন্তু তোমরা ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে, আরাবলি পর্বতের পশ্চিমে ও রাজমহলের পূর্বেও অনেকখানি জমি পড়ে রয়েছে। এই পশ্চিম অংশের নাম পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ, আর পূর্ব

অংশের নাম বঙ্গদেশ ও আসাম। এ দুটিকেও উত্তরাপথের অন্তর্ভূত করে নিতে হবে।

উত্তরাপথ

প্রথম জিনিস যা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এই বিস্তৃত ভূভাগের ভিতর কোনো রূপ পাহাড়পর্বত নেই, সমস্ত উত্তরাপথ সমতল ভূমি। এর ভিতর এক জায়গায় শুধু একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি আছে। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মিলনস্থল হচ্ছে সেই উচ্চভাগ। উত্তরাপথের এই জায়গাটার গড়ন কাছিমের পিঠের মত। ফলে এ স্থানের পশ্চিমের যত নদী সব পশ্চিমবাহিনী ও পূর্বের যত নদী সব পূর্ববাহিনী।

এই পশ্চিম ভাগের নদী পাঁচটির নাম ঝিলম চেনাব রাবি বিয়াস ও সংলেজ। এ পাঁচটিরও জন্মভূমি হচ্ছে হিমালয়, আর এ পাঁচটিই পথিমধ্যে এ-ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষটা ভারতবর্ষের সব-চাইতে পশ্চিমের নদী সিন্ধু-নদের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তোমরা বোধ হয় জান যে, পাহাড় থেকে নদী যে মাটি কেটে নিয়ে আসে, সেই মাটি দিয়েই সমতল ভূমি তৈরি হয়। এই পঞ্চ নদের কৃপায় পঞ্চনদ-দেশ ওরফে পাঞ্জাব তৈরি হয়েছে। আর এই দেশটাকে ইণ্ডাস ভ্যালি বলা হয়। কারণ সিন্ধুই হচ্ছে এই পঞ্চনদের ভিতর মহানদ।

উত্তরাপথের পূর্বভাগের প্রধান নদীগুলির নাম যমুনা গঙ্গা গোমতী গোগ্‌রা গণ্ডক ও কুশি। এসকল নদীরই উৎপত্তি হিমালয়ে, আর এদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে গঙ্গা। অপর পাঁচটি একে একে গঙ্গায় মিশে গিয়েছে। সিন্ধুনদের সঙ্গে গঙ্গার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সিন্ধুনদ তার আগাগোড়া জল হিমালয়ের কাছ থেকে পায়। গঙ্গা কিন্তু কিছু জল বিন্ধ্যপর্বতের কাছ থেকেও পায়। চম্বাল ও শোণ এই দুই নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে বিন্ধ্যপর্বত। আর এই দুই নদীই উত্তরবাহিনী হয়ে এসে গঙ্গায় পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় জলের আর-এক নাম জীবন। গঙ্গাই হচ্ছে উত্তরাপথের জীবন। ও দেশের বুকের ভিতর দিয়ে গঙ্গা যদি রক্তের মত বয়ে না যেত, তা হলে উত্তরাপথের প্রাণবিয়োগ হত। এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।

আরাবলি পর্বতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে হচ্ছে মরুভূমি। সিন্ধুনদ দক্ষিণাংশে এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই সিন্ধু-নদীর দু পাশের দেশের নাম সিন্ধুদেশ।

বিন্ধ্যপর্বতের একরকম গা ঘেঁষে পূর্বে অনেক দূর এসে গঙ্গা রাজমহলের কাছে পর্বতের বাধা হতে অব্যাহতি লাভ ক'রে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তার পর দক্ষিণে অনেক দূর এসে গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়েছেন। এই ব্রহ্মপুত্রেরও জন্মস্থান হিমালয়। ব্রহ্মপুত্র লখনউয়ের উত্তরে হিমালয় থেকে বেরিয়ে পূর্বমুখে বহুদূর পর্যন্ত হিমালয়ের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে ভুটানের পূর্বে এসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছেন। তার পর এই মিলিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র আরও দক্ষিণে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়লেন। মেঘনার জন্মভূমি হচ্ছে গারো-লুসাই পর্বত। এই তিন নদীতে মিলে বাংলাদেশ গড়েছে।

উত্তরাপথের পশ্চিম দেশ সিন্ধুদেশ যেমন শুখনো, তার পূর্বদেশ বাংলা তেমনি ভিজে। সিন্ধুদেশের সক্কর নামক স্থানের মত গরম জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তার পাশে রোড়ী নামক স্থানে গত বারো বৎসরে মোটে ছ' পশলা বৃষ্টি হয়েছে। অপর পক্ষে বাংলার মত ভিজে দেশও ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

দক্ষিণাপথ

এখন দক্ষিণাপথে যাওয়া যাক।

এ ভূভাগ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এটি উত্তরাপথ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন।

অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যপর্বতের মাথা নীচু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে মাথাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারেন নি। ফলে এই দুই ভাগের ভিতর যাতায়াতের সুগম পথ নেই। উত্তরাপথ থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এমন কোনো নদী নেই, সুতরাং এ দুই দেশের ভিতর জলপথ নেই। গঙ্গানদী বিন্ধ্যপর্বতকে প্রদক্ষিণ করে ও সিন্ধুনদ সে পর্বতকে বাঁয়ে ফেলে রেখে তার পর সমুদ্রে এসে পড়েছে।

তার পর এ দুয়ের ভিতর কোনো স্থলপথও নেই। এক রেলের গাড়ি ছাড়া আর কোনো রকম গাড়ি— গোরুর ঘোড়ার কি উটের— বিন্ধ্যপর্বতের এক পাশ থেকে অপর পাশে যেতে পারে না।

মানুষে পায়ে হেঁটে যখন হিমালয় পার হয়ে যায়, তখন বিন্ধ্যপর্বত অবশ্য তার চলাচলের পথ বন্ধ করতে পারে নি। মানুষের অগম্য স্থান

ভূ-ভারতে নেই, কিন্তু দুর্গম স্থান আছে। এই বিন্ধ্য অতিক্রম করবার পথ সেকালে অত্যন্ত দুর্গম ছিল। রামচন্দ্র পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতি বেলায় তিনি বিমানে চড়ে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করাই বেশি আরামজনক অতএব সুযুক্তির কাজ মনে করেছিলেন।

সেকালে বিন্ধ্যপর্বত প্রদক্ষিণ করে আসবারও বিশেষ অসুবিধা ছিল। আরাবলি পর্বতের পশ্চিম দিয়ে আসতে হলে মরুভূমি অতিক্রম করে আসতে হত। অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব দিয়ে বাংলায় এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে মাদ্রাজ পৌঁছতে অনেক দিন নয়, অনেক বছর লাগত। এক, রাজা ও সন্ন্যাসী ছাড়া ওরকম দেশভ্রমণ বোধ হয় সেকালে অপর কেউ করত না। সমগ্র ভারতবর্ষকে এ ভাবে প্রদক্ষিণ করতেন রাজা দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হয়ে, আর সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে।

এই বিন্ধ্যপর্বতের ভিতর একটি ফাঁক আছে— খাণ্ডোয়া নামক স্থানে। এলাহাবাদ থেকে বম্বে যাবার রেলপথ এই খাণ্ডোয়ার ফাঁক দিয়েই যায়। এবং সেকালে এই দুয়োর দিয়েই বোধ হয় উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথে প্রবেশ করত। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি বড় কৌটোর মধ্যে আর-একটি ছোট কৌটো।

দক্ষিণাপথ উত্তরাপথ থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, বিভিন্ন— আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও।

উত্তরাপথকে একটি চতুর্ভুজ হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি স্পষ্ট ত্রিভুজ। একটি উলটো পিরামিড, যার base হচ্ছে বিন্ধ্য, আর apex কুমারিকা অন্তরীপ। এর উভয় পাশই পাহাড় দিয়ে বাঁধানো। পশ্চিম দিকের পর্বতের নাম পশ্চিমঘাট, পূর্বদিকের পূর্বঘাট। এই দুই পর্বত এসে মিলিত হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপের একটু উত্তরে। এর দক্ষিণে যে জায়গাটুকু আছে, তার পূর্বে আর পাহাড় নেই, কিন্তু পশ্চিমে আছে কার্‌ডামম হিল্‌স্।

উত্তরাপথ হচ্ছে সমতল ভূমি, কিন্তু দক্ষিণাপথ মালভূমি। অর্থাৎ ইরান দেশের মত এ দেশও হচ্ছে পর্বতের উপত্যকা ; শুধু ইরানের উপত্যকা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু, ও দক্ষিণাপথের হাজার ফিট। সুতরাং এ পিরামিডকে পাথরে-গড়া বলা যেতে পারে। এ ভূভাগে সমতল ভূমি আছে

শুধু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে ও সমুদ্রের উপকূলে, যে দেশকে আমরা মালাবার দেশ বলি; ও পূর্বসমুদ্রের উপকূলে, যে দেশকে আমরা করমণ্ডল বলি। দক্ষিণাপথের অন্তরেও কিছুকিছু সমতল ভূমি আছে, তার পরিচয় পরে দেব।

এই মালাবার দেশটি অতি সংকীর্ণ, করমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। যদি একটি বিমানে চড়ে দূর থেকে দেখা যায় তো দেখা যাবে যে, দক্ষিণাপথের পশ্চিম পাড় বেজায় মাথা উঁচু করে রয়েছে, পশ্চিমঘাট যেন সমুদ্র থেকে ঝাঁপিয়ে উঠেছে আর করমণ্ডল একেবারে সমুদ্রের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। এ অংশের তালীবন যেন সমুদ্র থেকেই উদ্‌ভূত হয়েছে। কালিদাস যে বলেছেন—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সে বেলা হচ্ছে করমণ্ডল কোস্‌ট্।

দক্ষিণাপথের উত্তরে দুটি অপূর্ব নদী আছে, নর্মদা ও তাপ্তি। নর্মদা বিন্ধ্যপর্বতের উপত্যকার ভিতর দিয়ে, ও তাপ্তি সাতপুরা-পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ঘেঁষে পশ্চিমবাহিনী হয়ে গাল্‌ফ্ অব্ ক্যাম্বেতে গিয়ে পড়ছে।

এ দুই নদী মানুষের বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। এ নদী দুটি মানুষের যাতায়াতের জলপথ নয়। তার পর এদের পলিতে কোনো সমতল দেশ গড়ে ওঠে নি। এরা দুটিতে মিলে সাগরসংগমের মুখে খালি একটুখানি মাটি তৈরি করেছে।

এ দেশের দক্ষিণের নদী-ক'টি সবই পূর্ববাহিনী। প্রথম গোদাবরী, দ্বিতীয় কৃষ্ণা, তৃতীয় কাবেরী। এই তিনটি নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে পশ্চিম-ঘাট, আর এ তিনটিই এসে পড়ছে বঙ্গ-উপসাগরে।

এই তিনটি নদীর উভয় কূলে অল্পস্বল্প সমভূমি আছে, যেখানে ফসল জন্মায়। এই তিনটি নদীর হাতে করমণ্ডল দেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণাপথের ভিতর থেকে মালাবার ও কোঙ্কন যাবার কোনো পথ থাকত না, যদি না পশ্চিমঘাটের ভিতর তিনটি ফাঁক থাকত— উত্তরে থালঘাট ও বোরঘাট, দক্ষিণে পালঘাট। এইখানেই কোইম্বাটোর নামক শহর। এই কোইম্বাটোরের দুয়োরই দক্ষিণাপথের অন্তরের সঙ্গে তার পশ্চিম উপকূলের যোগরক্ষা করেছে। দক্ষিণাপথ ও বাংলার ভিতর আর দুটি দেশ আছে— উত্তরে সেন্ট্রাল প্রভিন্‌সেস্ ও দক্ষিণে উড়িষ্যা।

সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস্ পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা। উড়িষ্যার অনেকটাই সমভূমি। মহানদী এই সমভূমি গড়েছে। এ দুটি দেশ সম্ভবতঃ কখনোই দক্ষিণাভুক্ত হয় নি বলে একে উত্তরাপথের ভিতর টেনে আনা যায়। আজকাল আমরা যাকে বম্বে প্রেসিডেন্সি ও ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি বলি, সে দুই এই দক্ষিণাপথেরই অন্তর্ভূত। শুধু সিন্ধু দেশটি বম্বের গভর্নরের অধীন হলেও দক্ষিণাপথের অন্তর্ভূত নয়।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপরে চারিটি দেশ আছে, যেগুলি ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত। পশ্চিমে কাশ্মীর, তার পূর্বে নেপাল, তার পূর্বে সিকিম ও পূর্বপ্রান্তে ভুটান।

কাশ্মীরের লোকের ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, নেপালের গুর্খাদেরও তাই; অপর পক্ষে সিকিম-ভুটানের ভাষা চীনবংশীয়। এই নেপালেই পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত আর্যজাতি এবং পূর্ব ও উত্তর থেকে আগত চীনজাতি মিলেমিশে একজাতি হয়ে গিয়েছে। এ দেশে শুধু দুই জাতির নয়, দুই সভ্যতারও মিলন ঘটেছে। তাই নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি বাস করছে। কাশ্মীরে অবশ্য হিন্দুধর্ম ও মুসলমান-ধর্ম পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু এই দুই ধর্ম পরস্পরের অস্পৃশ্য। ফলে উভয় ধর্মই নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলেছে। অপর পক্ষে নেপালের বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের বিকার অথবা নেপালের হিন্দুধর্মকে বৌদ্ধধর্মের বিকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। সিকিম-ভুটানের সংস্রব আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে। শুনতে পাই, বাংলার লোকের দেহে চীনের রক্ত আছে। সেইসঙ্গে বাঙালির মনেও কিঞ্চিৎ চৈনিক ধর্ম আছে কি না বলতে পারি নে।

দেশের পণ্ডিতলোক-সব আজকাল বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দেশে মহা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন। বেদ উদ্ধারের পর আমাদের পণ্ডিতরা যদি তন্ত্রের সন্ধানে বেরন, তা হলে, আমার বিশ্বাস, তাঁদের উত্তরপশ্চিম দেশকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বে আসতে হবে। তখন রিসার্চ ওঅর্ক-এর পীঠস্থান হবে প্রথমে ভুটান, পরে সিকিম। তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথি খুললেই পাতায় পাতায় মহাচীনের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরান ও উত্তরে তুরানের মত তার পূর্বে মহাচীনকেও পুরাতত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না। সম্প্রতি অবগত হয়েছি যে, পণ্ডিতরা আজকাল Tarim দেশ

নিয়েই উঠে-পড়ে লেগেছেন। Tarim অবশ্য চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত তুর্কস্থানে। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা খোটান থেকে ভুটানে অচিরে নেবে পড়বেন।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি

এতক্ষণে তোমরা ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ, আর তার অন্তর্ভূত খণ্ড দেশগুলির আকৃতির মোটামুটি পরিচয় পেলে। এখন, তার প্রকৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাক।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তবে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। তোমরা বোধ হয় গ্লোবে লক্ষ্য করেছ যে পিপের গায়ে লোহার পৎরার বাঁধনের মত কতকগুলি কালো কালো রেখা এই গোলকটির দেহ বেষ্টন করে আছে। এই রেখাগুলির ভিতর দুটি রেখার একটু বিশেষত্ব আছে। সে দুটি একটানা নয়, কাটা কাটা। এ উভয়ের মধ্যে ইকোয়েটরএর উত্তরে যে রেখাটি আছে, সেটির নাম ট্রপিক অব ক্যান্সার; আর ইকোয়েটরের দক্ষিণে যেটি আছে, তার নাম ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ন।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কি যোগাযোগ আছে, তাই দেখাবার জন্য এ দুটি রেখা আঁকা হয়েছে। এই রেখাঙ্কিত জায়গাতেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে, অপর সব স্থানে তের্চা ভাবে। এই ট্রপিক অব ক্যান্সারের উত্তর দেশ শীতের দেশ, আর ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্নের দক্ষিণদেশও শীতের দেশ।

আর এই রেখাদ্বয়ের মধ্যের দেশ সব দারুণ গরম দেশ। ভারতবর্ষের উত্তরাপথ প্রায় সমস্তটাই ট্রপিক অব ক্যান্সারের উত্তরে, ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার দক্ষিণে। ফলে দক্ষিণাপথে শীতঋতু বলে কোনো ঋতু নেই। জনৈক ইংরেজ বলেছেন যে, দক্ষিণাপথ হচ্ছে Nine months hot and three months hotter। কথাটা কিপলিঙের মুখ থেকে বেরলেও মিথ্যে নয়। উত্তরাপথে কিন্তু শীতগ্রীষ্ম দুই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকালে গরম যে উত্তরাপথের মত অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমতঃ উঁচু, দ্বিতীয়তঃ তার তিন দিক সমুদ্রে ঘেরা।

মাটি

তার পর ভারতবর্ষের এ দুই ভূভাগের মাটিও এক জাতের নয়, এবং তাদের গুণাগুণও পৃথক্। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানতঃ মাটি

নিয়ে। গাছপালা তৃণ শস্য সব মাটিতেই জন্মায়। এবং অনেক পণ্ডিতের মতে সব জীবজন্তুর ন্যায় মানুষের আদিমাতা হচ্ছে ভূমি। এ মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা কোন্ জমিতে কে জন্মেছে তার থেকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব নির্ণয় করেন।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হচ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র। ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না— জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। মা-বসুন্ধরা আসলে পাষাণী।

এই মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। অর্থাৎ পাথরকে ভেঙে মাটি তৈরি করতে হয়। পাথরকে চূর্ণ করা হচ্ছে জল আর বাতাসের কাজ।

নদনদী পাহাড় থেকে বেরয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণপাষাণ বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা পলিমাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানতঃ গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরি।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ, পেনিন্সুলা, বলি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যের দেশ তখন জলমগ্ন ছিল। তার পর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদনদীর কৃপায় উত্তরাপথ হয়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি করল। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন জিয়োলজি পড়বে, তখন এ দেশের বয়সের গাছপাথরের অথবা গাছপাথরের বয়েসের হিসেব পাবে।

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি নদনদীর দান নয়। আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের (লাভা) উদ্গম হয়েছে, তাই চূর্ণ হয়ে হয়েছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণদেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এ দুই মাটি এক জাতেরও নয়, এ দুয়ের ধর্মও এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন্ দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন্ দেশে কোন্ দিক থেকে কি বাতাস বয়, তার উপর। তোমাদের পূর্বে বলেছি যে, সিন্ধুদেশ হচ্ছে অনাবৃষ্টির ও আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্তী দেশ অল্পবৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে

দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ, ও তার পূর্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা মন্সুন নামে আখ্যাত করি, তার চলবার পথ হচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণ থেকে উত্তরপূর্ব কোণে। এ বাতাস মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়। আবার বাংলায় ঢোকার পর এর গতি হয় দক্ষিণপূর্ব থেকে উত্তরপশ্চিমে। এই বাতাস বাংলা ও আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তার পর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম-ঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষাঋতু দেখা দেয়। মন্সুন কিন্তু পঞ্চনদ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এজন্য বাংলায় যখন বৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব তখন শুখনো। পাঞ্জাবে শীতকালই বর্ষাকাল।

ভারতবর্ষের লোক শতকরা নব্বই জন হচ্ছে কৃষিজীবী। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরেও একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালে গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরীতে। আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্তমান ইউরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। এই শহুরে মনোভাব থেকে নিষ্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের সভ্যতার প্রতি অনুকূল হয় না। এই কারণেই ইউরোপের সাধারণ লোক ও বর্তমান ভারতবর্ষের অসাধারণ লোকে— অর্থাৎ যারা শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে বিলেতের সাধারণ লোকের শামিল হয়ে গিয়েছে, তারা— ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অসভ্যতা মনে করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ করেছে শহরে ও সেইখানেই লালিত-পালিত হয়েছে; অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত-পালিত হয়েছে।

এ দেশ যদি ঋষিক্ষেত্র হয়, তার কারণ এ দেশ মূলে কৃষিক্ষেত্র। বন গ্রামেরই অপর পৃষ্ঠা। আশ্রম মাটির নয়, মনেরই কৃষিক্ষেত্র।

আজকাল অনেক ইংরেজিশিক্ষিত সদাশয় লোক ভিলেজ অরগ্যানি-জেশন করবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানুষ কৃষিকর্মের জন্য যুগ যুগ ধরে যে অরগ্যানিজেশন করেছে, তারই নাম কি ভিলেজ নয়? ভিলেজ জিনিসটে শুধু অরগ্যানাইজড্ নয়, কালবশে প্রতি গ্রাম এক-একটি

অরগ্যানিজ্‌ম্ হয়ে উঠেছে। অরগ্যানিজ্‌ম্‌কে অরগ্যানাইজ্ করবার প্রবৃত্তিটি যেমন উচ্চ, তেমনি নিরর্থক। অরগ্যানিজ্‌ম্‌ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়; যদি আমাদের দেশের গ্রামসমূহ তাই হয়ে থাকে, তা হলে তাদের ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসার নাম অরগ্যানিজেশন নয়; অরগ্যানাইজ মানুষে করে শুধু কলকারখানা। যে ভূভাগকে ভগবান চাষের দেশ করে গড়েছেন, তাকে আমরা পাঁচজনে কলকারখানার দেশ তৈরি করতে পারব না, তা চাষার মুখের গ্রাস কেড়ে টাটা কোম্পানির লোহার কলের পেট যতই ভরাই নে কেন। ভারতবর্ষ কখনও বিলেত হবে না। মনে ভেবো না যে আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করেছি। পুরাণকাররা বলেছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আসলে কর্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্মের ভূমি যে কর্ম দেবদানবরা করতে পারেন না। এ কর্ম হচ্ছে কৃষিকর্ম। আর এইটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। এ সত্য উপেক্ষা করলে সেকালের ধর্মশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না, একালের অর্থশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না। আর তখন তোমরা ধর্ম বলতে বুঝবে অর্থ, আর অর্থ বলতে বুঝবে ধর্ম; যেমন আজকালকার পলিটিশিয়ানরা বোঝেন।

উদ্ভিদ্

মানুষের জীবন উদ্ভিদের জীবনের অধীন। উদ্ভিদের কাছ থেকে যে আমরা শুধু অন্ন পাই তাই নয়, বস্ত্রও পাই। ভারতবর্ষের বৃক্ষলতা তৃণশস্য আমাদের এই দুই জিনিসই জোগায়। উত্তরাপথ প্রধানতঃ আমাদের দেয় অন্ন, আর দক্ষিণাপথ বস্ত্র।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ রুটির দেশ, পূর্বাংশ ভাতের দেশ। প্রথমতঃ ধান জন্মায় অতিবৃষ্টির দেশে, ও গম জন্মায় অল্পবৃষ্টি এমনকি অনাবৃষ্টির দেশে। তার পর ধানের জন্য চাই নরম মাটি, ও গমের জন্য শক্ত মাটি। বাংলার মাটিও নরম আর এখানে বৃষ্টিও হয় বেশি, তাই বাংলা হচ্ছে আসলে ধানের দেশ। পাঞ্জাবে বৃষ্টি কম ও মাটি শক্ত, তাই পাঞ্জাবের প্রধান ফসল হচ্ছে গম। সিন্ধুদেশেও আজকাল দেদার গম জন্মাচ্ছে। অনেক উদ্ভিদের মাথায়ও জল ঢালতে হয়, গোড়ায়ও জল দিতে হয়। বৃষ্টির জলে স্নান না করতে পেলে ধান বাঁচে না। কিন্তু খেজুর গাছের মাথায় এক ফোঁটাও জল দিতে হয় না। গোড়ায় রস পেলে ও গাছ তেড়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণ শাহারা মরুভূমি

ও আরবদেশই আসলে খেজুরের দেশ। ও দুই মরুভূমির ভিতর যেখানে একটু জল আছে, সেইখানেই চমৎকার খেজুর জন্মায়। জানোয়ারের ভিতর যেমন উট, গাছের ভিতর তেমনি খেজুর— মরুভূমিরই জীব। গমের মাথায়ও বারিবর্ষণ করবার দরকার নেই। মরুভূমির ভিতর নালা কেটে যদি জল নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলেই সেখানে গম জন্মায় ও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শস্যের যে শুধু পিপাসা আছে তাই নয়, খিদেও আছে। মাটির ভিতর যে রাসায়নিক পদার্থ ওরফে সার থাকে, তাই হচ্ছে শস্যের প্রধান খাদ্য। যে দেশে বেশি বৃষ্টি হয়, সে দেশের মাটি থেকে অনেক সময়ে এই সার ধুয়ে যায়। মরুভূমির অন্তরে কিন্তু এ সার সঞ্চিত থাকে। সেখানে অভাব শুধু জলের। তাই মরুভূমির অন্তরে জল ঢোকাতে পারলেই যেসব শস্যের শুধু গোড়ায় জল চাই সেসব শস্য প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। সিন্ধুনদ থেকে খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে সিন্ধুদেশকে এখন শস্যশ্যামলা করে তোলা হয়েছে।

দক্ষিণাপথের ভিতরকার মাটি আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্‌গত পাথর-ভাঙা মাটি। এ মাটিতে খাবার জিনিস তেমন জন্মায় না। আর দক্ষিণাপথের অপর মাটিও অতি নিরেস মাটি, তাতে ধান জন্মায় না, গমও জন্মায় না ; জন্মায় শুধু বাজরি আর জোয়ারি, আর তারই রুটি খেয়েই এ দেশের লোক জীবনধারণ করে। এ দু ভাগের দুটি অংশ কিন্তু খুব উর্বর, পশ্চিমে মালাবার ও পূর্বে করমণ্ডল উপকূল। মালাবার নারিকেল গাছের দেশ, আর করমণ্ডল তাল গাছের। তা ছাড়া এই দেশে শস্যও প্রচুর জন্মায়। তবুও দক্ষিণাপথ নিজের দেশেরই খোরাক জুগিয়ে উঠতে পারে না ; দেশে-বিদেশে অন্ন বিতরণ করা তো তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু এই দক্ষিণাপথের আর-একটি সম্পদ আছে। আগ্নেয়গিরির পাথর-ভাঙা মাটিকে ব্ল্যাক কট্‌ন্ সয়েল বলা হয়, কারণ ও-মাটির রং কালো ও তাতে কাপাস জন্মায়। এ দেশে এত কাপাস জন্মায় যে, দক্ষিণাপথ শুধু সমগ্র ভারতবর্ষকে নয়, দেশ-বিদেশকে তুলো জোগায়। বাংলা যেমন ধানের দেশ, পাঞ্জাব যেমন গমের দেশ, দক্ষিণাপথ তেমনি মুখ্যতঃ তুলোর দেশ। এ দেশ শুধু কাপাসের দেশ নয়, শিমুলেরও দেশ। অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলীতরু— এ কথাটা শুধু গল্পের কথা নয়। দক্ষিণাপথের তুল্য বিশাল শাল্মলীতরু পৃথিবীর অন্য দেশে বিরল।

এই থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ভারতবর্ষ, কি অন্ন কি বস্ত্র, কিছুরই জন্য

অপর কোনো দেশের মুখাপেক্ষী নয়। আজকাল কেউ কেউ বাংলাদেশে কাপাসের চাষ করতে চান। এ চেষ্টা দক্ষিণাপথে ধানের চাষ চালাবার অনুরূপ। এ ইচ্ছা অবশ্য অতি সদিচ্ছা, কিন্তু এ ইচ্ছা জিয়োগ্রাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমগ্র ভারতবর্ষকে ঢেলে সাজবার মহৎ বাধা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের ঐক্য

ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির পরিচয় দিতে হলে বোধ হয় এক বৎসর কাল লাগে। আমি আমার বরাদ্দ এক ঘণ্টার ভিতর সে দেশের আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। তাতে তোমাদের তরুণ জ্ঞানপিপাসা কতদূর মিটেছে বলতে পারি নে। যদি না মিটে থাকে তো আমার বক্তব্য এই যে— যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

এখন এই কথাটি তোমাদের বলতে চাই যে, এই সমগ্র দেশটি এক-দেশ। পৃথিবীতে আর যেসব দেশ একদেশ বলে গণ্য, সেসব ছোট ছোট দেশ। এক মহাচীন ব্যতীত অপর কোথাও এত বড় দেশ একদেশ বলে গণ্য হয় নি।

প্রথমতঃ, এ দেশের চতুঃসীমা এ দেশকে যেমন পরিচ্ছিন্ন করেছে, অন্য কোনো দেশকে তেমন করে নি। চীনদেশে এর তুল্য স্বাভাবিক সীমানা নেই, তাই চীনেরা তাদের দেশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে চেষ্টা করেছিল, পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকে স্বদেশকে পৃথক্ করবার জন্য। এ চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

হিমালয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির সবচেয়ে বড় জিনিস। পৃথিবীর আর-কোনো দেশের অত বড় প্রাচীর নেই। তার পর ঐ হিমালয়ই সত্যসত্য ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ও জলবায়ুর নিয়ন্তা। হিমালয়ের জলই হচ্ছে উত্তরাপথের প্রাণ। আর হিমালয়ই সমগ্র ভারতবর্ষের বায়ুর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এমন উর্বর, এমন মানুষের বাসোপযোগী দেশ হয়েছে। তার পর ভারতবর্ষের অন্তরে কোনো সমুদ্র কিংবা হ্রদ নেই, আর তার মধ্যস্থ একমাত্র পর্বতশ্রেণী বিন্ধ্যশ্রেণী এত উচ্চ নয় যে, ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। তার পর এই একদেশ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, এক হিসেবে একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ মহাদেশটি অতি সুরক্ষিত দেশ। প্রকৃতি নিজ হাতেই এ দুর্গের পর্বতের প্রাকার ও সাগরের পরিখা গড়ে দিয়েছেন। তবে এ দেশ এশিয়ার অপরাপর দেশ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগ-শূন্য নয়। পূর্বেই বলেছি যে, উত্তরাপথের পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার আছে—উত্তরে খাইবার পাস ও দক্ষিণে বোলান্ পাস। অতীতে এই দুই রন্ধ্র দিয়ে ইরানি তুরানি শক হূন যবন বাহ্লিক মোগল পাঠান প্রভৃতি জাতিরা এ দেশে প্রবেশ করেছে, কিন্তু সহজে নয়। খাইবার পাস দিয়ে ঢুকলে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ পার হয়ে এসে গঙ্গাযমুনার দেশে পৌঁছতে হত, আর বোলান পাস দিয়ে এলে বিদেশিদের বুকে মরুভূমি ঠেকত।

ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করবার আসল দ্বার হচ্ছে দিল্লি নামক শহর। কারণ সেখানে মরুভূমি ও আরাবলি পর্বত শেষ হয়ে শস্যশ্যামল সমভূমি আরম্ভ হয়েছে। সেই মিলনস্থানেই মোগল-পাঠানরা দিল্লি নগর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্যদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর, দিল্লির উপকণ্ঠেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান রণক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর পাণিপথ এসবই প্রায় এক জায়গায়। পুরাকালে দিল্লির গেট না ভেঙে কোনো বিদেশি জাতি ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে যেসকল জাত ও-দ্বার খুলতে পারে নি তারা হয় দেশে ফিরে গিয়েছে, নয় সিন্ধু ও পঞ্চনদ-দেশ অধিকার করে বসেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রকূলেও দু-চারটি ছাড়া আর প্রবেশদ্বার ছিল না, আর সে-ক'টি বন্দর দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে; উত্তরে ভৃগুকচ্ছ ও সুরপারগ এবং দক্ষিণে কালিকট ও কোচিন।

এই-ক'টি দ্বার দিয়েই ইউরোপীয় জাতিরা জাহাজে করে সমুদ্র পার হয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছে। পোর্তুগিজ ওলন্দাজ ইংরেজ ও ফরাসিরা এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষে ঢুকেছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার স্থলপথ এখন বন্ধ। খাইবার পাস এবং বোলান পাস এই দুই দুয়োরই এখন দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত; কিন্তু জলপথ এখন পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব তিন দিকে খোলা। এখন ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়ার যোগ ছিন্ন হয়েছে, তার পরিবর্তে নূতন যোগ স্থাপিত হয়েছে ইউরোপের সঙ্গে; সে যোগ অবশ্য দৈহিক নয়, মানসিক।

এই এক ঘণ্টা ধরে তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের যে মোটামুটি বর্ণনা করলুম, সে বর্ণনার ভিতর থেকে তার একটা অঙ্গ বাদ পড়ে গেল। দেশের

সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ভারতবাসীদের কথা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তবে-যে ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের রূপগুণের পরিচয় দিতে চেষ্টামাত্র করি নি, তার কারণ সে পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। অ্যানথ্রপলজি নামক বিজ্ঞান আমি জানি নে, আর সে বিজ্ঞানেরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। অ্যানথ্রপলজি এ বিষয়ে সত্য খুঁজছে, কিন্তু আজও তার সাক্ষাৎ পায় নি। আজ এক অ্যানথ্রপলজিস্ট যা বলেন, কাল অপর অ্যানথ্রপলজিস্ট তার খণ্ডন করেন। সুতরাং ও-শাস্ত্রের মনগড়া কথা সব তোমাদের শুনিয়ে কোনো লাভ নেই; বরং সেসব কথা শোনায় তোমাদের ক্ষতি আছে। বিজ্ঞানের নাম শুনলেই আমরা অজ্ঞান হই। অর্থাৎ ঐ নামে যেসব কথা চলে, সেসব কথাকে এ যুগে বেদবাক্য বলে মেনে নিই। আমাদের মত বয়স্ক লোকদেরই যখন মনের চরিত্র এহেন, তখন তোমাদের পক্ষে এসব অনিশ্চিত বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত কথা শোনায় ভয়ের কারণ আছে। তোমাদের মন স্বভাবতই বিশ্বাসপ্রবণ। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও, খবরের কাগজের কথাতেও তোমরা বিশ্বাস কর। বুজরুক শব্দটার মানে শুনতে পাই জ্ঞানী। বুজরুক নামক জ্ঞান নিয়েই কাগজওয়ালাদের কারবার। আর নিত্য দেখতে পাই যে, সেই সব বুজরুকি কথা তোমাদের নরম মনে এমনই বসে যায় যে, সে কালির ছাপ অনেকের মনে চিরজীবন থেকে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব অথবা জাতিতত্ত্ব নিয়ে তোমাদের সুস্থ মনকে ব্যস্ত করবার কোনো প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের সকল লোক যে এক জাতির লোক নয়, এ সত্য তো সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। এ দেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের রূপের ও বর্ণের ভিতর কতটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে তা সকলেরই চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন। আমি পূর্বে তোমাদের বলেছি যে, পৃথিবীর জিয়োগ্রাফিকাল ভাগ ও পলিটিকাল ভাগ এক নয়। এ দেশের লোক পলিটিকাল হিসেবে এক জাত হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এক জাত নয়। জিয়োগ্রাফির ভাগের হিসেবে তাদের জাতেরও স্পষ্ট ভাগ আছে। পলিটিক্সের হিসেবে কাশ্মীরি পণ্ডিত অবশ্য তামিল নাইডুর সহোদর, কিন্তু জিয়োগ্রাফির হিসেবে এঁরা পরস্পরকে কিছুতেই দেশকা ভাই বলতে পারেন না। আজ আমি তোমাদের কাছে যতদূর সংক্ষেপে পারি ভারতবর্ষের বর্তমান জিয়োগ্রাফির বর্ণনা করলুম; বারান্তরে তোমাদের

ভারতবর্ষের প্রাচীন জিয়োগ্রাফি ও প্রাচীন ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফির কথা শোনাব। পুরাকালেও স্বদেশের জিয়োগ্রাফি জানবার কৌতূহল লোকের ছিল, এবং এ বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁরা লিখে রেখে গিয়েছেন ; আর তার থেকেই জানা যায় যে, কালক্রমে ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে।

তোমাদের ভরসা দিচ্ছি যে, সে বর্ণনা এ বর্ণনার চেয়ে ঢের ছোট হবে, আর আশা করি ঢের বেশি সরস হবে। যেসব দেশের, যেসব শহরের, যেসব পাহাড়ের, যেসব নদীর নাম আমরা রামায়ণ-মহাভারতে পড়ি, তারা কোথায় ছিল আর তাদের ভিতর কোন্‌টি, স্বনামে না হোক, স্বরূপে বিরাজ করছে, সেসব কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। সেকালের ভারতের পরিচয় দিতে আমাকে কষ্ট করতে হবে, কিন্তু শুনতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।

১৩৩২ মাঘ

অনু-হিন্দুস্থান

কোনো পারিবারিক সমিতিতে পঠিত

হে সমিতির কুমারগণ, আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে হিন্দুস্থানের বাইরে হিন্দুর আর স্থান নেই। এ বিশ্বাস সর্বসাধারণ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই ধারণা যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি আছে শুধু জিয়োগ্রাফিতে— যাকে বলে ভারতবর্ষ তারই চতুঃসীমার মধ্যে।

আমরা সকলেই দেখতে পাই, ভারতবর্ষের পশ্চিমে রয়েছে মুসলমান, উত্তরেও তাই, পূর্বে বৌদ্ধ, আর দক্ষিণে সমুদ্র। আর সমুদ্রের ওপারে যদি কোনো দেশ থাকে তো সে দেশে হিন্দুজাত কখনো যায় নি ; আর যদি কখনো গিয়ে থাকে তো তখনই তাদের হিন্দুত্ব মারা গিয়েছে। কেননা একালে হিন্দুজাতির সমুদ্রযাত্রার অর্থ তার গঙ্গাযাত্রা।

এ ধারণা শিক্ষিতলোকসামান্য হলেও, অশিক্ষিত ধারণা। ইংরেজি শিক্ষার চশমা পরলে আমাদের বর্তমান জাতীয় দৈন্য ও হীনতা সম্বন্ধে আমাদের চোখ যেমন ফোটে, আমাদের জাতীয় পূর্বগৌরব ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আমরা তেমনি অন্ধ হই। আমাদের নূতন শিক্ষা এসেছে পশ্চিম থেকে। এর ফলে আমরা পূর্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ— পূর্বকাল সম্বন্ধেও, পূর্বদিক সম্বন্ধেও। ভারতবর্ষের পূর্বকালের হিস্টরির সঙ্গে আমাদের যদি কিছুমাত্র পরিচয় থাকত তা হলে আমরা জানতুম যে, ভারতবর্ষের পূর্বের অনেক দেশেও অনেককাল ধরে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি রাজত্ব করেছে। আজকাল অনেকে যাকে ভারতবর্ষের অতীত বলে চালিয়ে দিতে চান, তা কোনো দেশেরই অতীত নয়, ভারতবর্ষের তো নয়ই। বেশির ভাগ লোকের মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যেমন ইউরোপের বর্তমান, জনকতক লোকের মতে ভারতবর্ষের অতীতও তেমনি ইউরোপের বর্তমান। আমাদের কল্পনার দৌড়ও বিলেত পর্যন্ত।

আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন লোকের নাম থেকে দেশের নাম হয়, দেশের নাম থেকে লোকের নাম হয় না। যথা, আর্যরা বাস করতেন বলেই আধখানা ভারতবর্ষের নাম হয়েছিল আর্যাবর্ত ; আর আর্যরা যদি অপর কোনো দেশে গিয়ে বাস করেন, তা হলে সে দেশের নামও হবে আর্যাবর্ত। এই হিসেবে ভারতবর্ষ ও চীনের ভিতর যেসব দেশ আছে,

সেসব ভূভাগকে উপ-হিন্দুস্থান বলা অন্যায় নয়। যাক সেসব পুরোনো কথা। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, আজও এশিয়ার এক কোণে এমন একটি দেশ আছে, যেখানকার ষোলো-আনা অধিবাসী আজও হিন্দু। সেই দেশটির সঙ্গে তোমাদের চেনাপরিচয় করিয়ে দিতে চাই। সে পরিচয় করিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না। মাপে ও ম্যাপে ভারতবর্ষ যেমন বড়, সে দেশটি তেমনি ছোট। ভারতবর্ষের তুলনায় সেটি তালের তুলনায় তিল যদ্রূপ, তদ্রূপ। এমনকি মানচিত্রেও সে দেশটি হঠাৎ কারো চোখে পড়ে না; অনেক খুঁজেপেতে সেটিকে বার করতে হয়। সেকালের উপ-হিন্দুস্থানের দক্ষিণে ম্যাপের গায়ে যে কতকগুলো কালির ছিটেফোঁটা দেখা যায়, তারই এক বিন্দু হচ্ছে এই বর্তমান অনু-হিন্দুস্থান।

ও-দেশের হিস্টরি তোমরা না জান, তার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এর নাম বলিদ্বীপ এবং এটি হচ্ছে যবদ্বীপ থেকে ভাঙা এক টুকরো খণ্ডদ্বীপ। ম্যাপে দেখতে পাওয়া যায় যে, জাভা সমুদ্রের মধ্যে পশ্চিমে মাথা করে পূর্বে পা ছড়িয়ে অনন্তশয্যায় শুয়ে রয়েছে; আর তার পায়ের গোড়ায় পুঁটুলি পাকিয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে— বলি। এ দুটি দ্বীপকে যদি খাড়া করে তোলা যায়— অর্থাৎ তাদের মাথা যদি পশ্চিম থেকে উত্তরে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, আর পা পূর্ব থেকে দক্ষিণে— তা হলে ভারতবর্ষের নীচে লঙ্কা যেমন দেখায়, জাভার নীচে বলিও তেমনি দেখাবে। এ কথাটা এখানে বলে রাখছি এই জন্যে যে, সিংহলের পূর্ব-ইতিহাস যেমন ভারতবর্ষের পূর্ব-ইতিহাসের একটা ছেঁড়াপাতা মাত্র, বলির ইতিহাসও তেমনি জাভার ইতিহাসের একটি ছিন্নপত্র।

জাভা ও বলির মধ্যে যে সমুদ্রের ব্যবধান আছে, সে অতি সামান্য। সে শাখা-সমুদ্রটুকু মাইল দেড়েকের বেশি চওড়া নয়, অর্থাৎ চাঁদপুরের নীচে মেঘনার তুল্য। বলিদ্বীপ কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া তা শুনলে তোমরা হাসবে। বলি দৈর্ঘ্যে ৯৩ মাইল ও প্রস্থে মোটে ৫০ মাইল; তাও আবার সমস্তটা সমতল ভূমি নয়। এই ছোট্ট দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক হ্রদ আছে, আর সেসব হ্রদ এত গভীর যে, তাদের অতলস্পর্শী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার উপর একটি একটানা পর্বতশ্রেণীর দ্বারা দেশটি দু ভাগে বিভক্ত। দেশ ছোট, কিন্তু তার পর্বত যেমন লম্বা তেমনি উঁচু; অর্থাৎ ও হচ্ছে একরকম বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। সে

পর্বতের উচ্চতা কোথায়ও সাড়ে তিন হাজার ফুটের কম নয়, কোথাও-বা তা দশ হাজার ফুট পর্যন্ত মাথা তুলেছে। এ পর্বত বলিদেশকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথে ভাগ করেছে— ভারতবর্ষের নকলে।

তোমরা হয়তো মনে ভাববে যে এই দেশেরই ইংরেজি নাম হচ্ছে লিলিপুট, কিন্তু তা নয়। গালিভার লিলিপুট-দেশের লোকের যে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে বলির অধিবাসীর চেহারার কোনো মিল নেই। এরা আকারে জাভার লোকের চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। দেশ ছোট হলে সেখানকার মানুষ যে বড় হয়, তা অন্যত্রও দেখা যায়। ইউরোপের ভিতর ইংলণ্ড সবচেয়ে ছোট দেশ; কিন্তু এ দেশের মত বড়লোক ও-ভূভাগে অন্য কুত্রাপি মেলে না। অপর পক্ষে, অতি ক্ষুদ্র লোকের সাক্ষাৎ শুধু মহাদেশেই মেলে। বামনের জাত শুধু আফ্রিকাতেই আছে। গালিভার বলিদ্বীপে না গেলেও সিন্ধুবাদ যে সে দেশে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ, যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার স্কন্ধে ভর করেছিলেন, তিনি ছিলেন বলীয়ান্।

বলির লোক শুধু বলিষ্ঠ নয়, অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ। চাষবাসে তারা অতিশয় দক্ষ। তারা হল-চালনা ছাড়া হাতের আরও অনেক কাজ করে। তারা চমৎকার কাপড় বোনে ও চমৎকার অস্ত্র বানায়। তাদের তুল্য তাঁতি ও কামার জাভায় পাওয়া যায় না। অন্ন বস্ত্র ও অস্ত্রের সংস্থান যে দেশে আছে, সে দেশে একালের আদর্শ সভ্যতার কোন্ উপকরণ নেই? আর শৌখিন অশনবসনের ব্যবস্থাতেও বলি বঞ্চিত নয়। সে দেশে কফি জন্মায় আর তামাক জন্মায়। আর এ দুই তারা পান করে; একটা তাতিয়ে জল করে, আর-একটা পুড়িয়ে ধোঁয়া করে— যেমন আমরা করি। বলির লোক রেশমের কাপড়ও বোনে, আর তা রঙাবার জন্য নীলের চাষও করে। সোনা দিয়ে তারা গহনা গড়ায় ও জরি বানায়। গহনা গড়তে ও জরির কাজ করতে তারা অদ্বিতীয় ওস্তাদ।

বলির ভাষা জাভার ভাষারই অনুরূপ। তবে ইতালির ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার যে প্রভেদ, যবীয় ভাষার সঙ্গে বলীয় ভাষার সেই প্রভেদ। এ দেশের সাহিত্যের ভাষার নাম 'কবি', 'সাধু' নয়। পাঁচ শ বৎসর পূর্বে জাভার সাহিত্য কবি-ভাষাতেই লেখা হত। এ ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত। এ যুগে জাভার লোক তাদের সাহিত্যের ভাষা বড়-একটা বুঝতে পারে না— কিন্তু বলির লোকের কাছে কবি মৃত নয়। চার শ বৎসর আগে জাভার লোক

সব মুসলমান হয়ে যায়। সম্ভবতঃ সেইজন্য তারা তাদের পূর্ব কবি-ভাষা ভুলে গিয়েছে; আর বলির লোক আজও হিন্দু রয়েছে বলে কবির পঠনপাঠন সে দেশে আজও চলছে।

জাভার যথার্থ নাম যে যবদ্বীপ, তা তোমরা সবাই জান। সংস্কৃত যব শব্দের অন্তস্থ য আরবদেশের মুসলমানদের মুখে বর্গীয় জ-এ ও ব ভ-এ পরিণত হয়ে তদুপরি অকার আকার হয়ে জাভা রূপ ধারণ করেছে।

এই সংস্কৃত নাম থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, পুরাকালে ও-দ্বীপের নামকরণ করেছিল হিন্দুরা। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, কবে হিন্দুরা এ দ্বীপ আবিষ্কার করে। এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে যে কালে এ দেশে রামায়ণ লেখা হয়, সে কালে যবদ্বীপ যে হিন্দুদের কাছে উক্ত নামেই পরিচিত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। আর সে বড় কম দিনের কথা নয়। তোমরা সবাই জান যে, রামায়ণ রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর আগে লেখা হয়েছিল; আর রাম জন্মেছিলেন ত্রেতা যুগে।

শ্রীমৎ হনুমানকে যখন দেশদেশান্তরে সীতাকে অন্বেষণ করতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন তাকে বলা হয়—

গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ।
রত্নবন্তং যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্॥
সুবর্ণরূপ্যকং চৈব সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্।
যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেন দেবদানবসেবিতঃ।

এ যবদ্বীপ যে বর্তমান জাভা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সেখানে যেতে হত প্লবনেন প্লবেন চ— অর্থাৎ হয় লাফিয়ে, নয় সাঁতরে, নয় ভেলায় চড়ে। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে লঙ্কায় এক লম্ফে যাওয়া সোজা, কারণ এক লম্ফে তা যাওয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে বলি যেতে হলে অসম্ভব হাই জাম্প ও লং জাম্প একসঙ্গে দুই চাই। আর বঙ্গ-উপসাগর তো ইংলিশ চ্যানেল নয় যে, সাঁতরে পার হওয়া যায়। সুতরাং ও দেশে ভেলায় চড়েই যেতে হত। যবদ্বীপ রত্নবন্ত ও সোনারুপোর দেশ, আর সোনার খনিতে মণ্ডিত। কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, এ দেশ জাভা নয়, সুমাত্রা। কেননা সোনার খনি জাভায় নেই ও কোনো কালে ছিল না— ছিল ও আছে শুধু সুমাত্রায়। অপর আর-এক দল বলেন যে, যবদ্বীপ জাভাই, সুমাত্রা নয়।

কিন্তু আসল কথা এই যে, সেকালে হিন্দুদের কাছে জাভা ও সুমাত্রা উভয় দ্বীপই যবদ্বীপ বলে পরিচিত ছিল। সুমাত্রা পরে স্বর্ণদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি নাম ধারণ করে। সুমাত্রা নাম পুরোনো নয়। স্বর্ণদ্বীপে সমুদ্র বলে একটি নগর ছিল। সেই সমুদ্রই আরবি জবানে রূপান্তরিত হয়ে সুমাত্রা হয়েছে, এবং এই নতুন নামেই ও-দ্বীপ ইউরোপীয়দের কাছে পরিচিত, আর একালের জিয়োগ্রাফিতে প্রসিদ্ধ।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বলেন যে, প্রাচীন হিন্দুদের ভূগোলের জ্ঞানের দৌড় ঐ যবদ্বীপ পর্যন্ত ছিল। তার পূর্বে যে আর-কোনো দেশ আছে, তা তাঁরা জানতেন না। তাই তাঁরা যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে শিশির-পর্বতের উল্লেখ করেছেন, সে পর্বত তাঁদের ষোলো-আনা মনগড়া। আমি প্রথমতঃ ইউরোপীয় নই, দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিত নই ; সুতরাং তাঁদের কথা আমি নতমস্তকে মেনে নিতে বাধ্য নই।

যবদ্বীপ অতিক্রম করে যে দ্বীপটি পাওয়া যায়, তার নাম বলিদ্বীপ ; এবং তার অন্তরে যে পর্বত আছে, সে পর্বতকে শিশির বলা ছেরেফ কবিকল্পনা নয়। কেননা যার এক-একটি শৃঙ্গ দশ হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু, সে পর্বতকে কিছুতেই গ্রীষ্ম পর্বত বলা যায় না, যদি কিছু বলতে হয় তো শিশির বলাই সংগত। শুনতে পাই উক্ত দ্বীপপুঞ্জ চিরবসন্তের দেশ। সুতরাং সে দেশের পাহাড়ে শীত হবারই কথা। আর সে পর্বত দেবদানব-সেবিত বলবার অর্থ সেখানে মানুষের বসতি নেই। হনুমানকে সীতার খোঁজে আরও অনেক স্থানে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেসব দেশ যে রূপকথার দেশ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে দেশে মানুষের কান হাতির কানের মত বড়, ও যে দেশে মানুষের কান উটের কানের মত ছোট, আর যে দেশে মানুষের পা দুটো নয়, একটা মাত্র, অথচ সেই এক পায়ে তারা খুব ফুর্তি করে চলে, সেসব দেশেও হনুমানকে ভ্রাম্যমাণ হবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব দেশের কোনো নাম বলা হয় নি। এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যেসব দেশের নাম হিন্দুরা জানত না, সেইসব দেশ সম্বন্ধে তাদের কল্পনা খেলত। যে দেশের নাম তারা জানত, সে দেশের রূপও তারা চিনত।

সে যাই হোক, বলিদ্বীপেরও নাম যখন সংস্কৃত, তখন সে নামকরণ যে হিন্দুরাই করেছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আর খৃস্টজন্মের পূর্বেও

যে হিন্দুরা বলিদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তারও কিছুকিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।

এই দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ-স্থাপন হিন্দু জাতির ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। সে ইতিহাস আমি আজ তোমাদের শোনাব না; কারণ সে মস্ত লম্বা ইতিহাস। হিন্দু জাতির মহা গৌরবের কথা এই যে, হিন্দুরা এই দ্বীপবাসী অসভ্য জাতদের সভ্য করে তুলেছিলেন। এ দেশের লোক পূর্বে যে কি রকম ঘোর অসভ্য ও ভীষণপ্রকৃতির লোক ছিল, তা রামায়ণে দ্বীপবাসীদের বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায়। তারা ছিল 'আমমীনাশনাঃ' অর্থাৎ তারা কাঁচা মাছ খেত। তাতে কিছু যায় আসে না; কেননা সুসভ্য জাপানিরা আজও তাই খায়। বাল্মীকি শুনেছিলেন যে, তারা 'অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রাঃ'। নরশার্দূল অবশ্য আমরা বীরপুরুষদেরই বলি, কিন্তু নরব্যাঘ্র বলতে বীরপুরুষ বোঝায় না, বোঝায় সেই জাতীয় পুরুষদের, যারা 'অক্ষয়া বলবন্ত পুরুষা পুরুষাদকা'— ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যানিবলস্। এই হেমাঙ্গ কিরাতের দল ছিল সব ক্যালিবনের দাদা ক্যানিবল।

শ্রীবিজয়রাজ্যের অর্থাৎ সুমাত্রার ইতিহাস-লেখক জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বলেছেন যে—

আমরা পুরোনো দলিলপত্র থেকে প্রমাণ পেয়েছি যে, ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পুরাকালে এক নব সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যেমন কাম্বোজের (ক্যাম্বোডিয়া) ও চম্পার (আনাম-কোচিনচায়না) তেমনি এ দেশেরও Alma Mater ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্বে তার দেবতা, তার শিল্পকলা, তার ভাষা, তার সাহিত্য, সংক্ষেপে তার সভ্যতার সকল মহামূল্য উপকরণ এই দ্বীপবাসীদের সানন্দে দান করেছিল, এবং সহস্র বৎসরের অধিককাল ধরে এই দ্বীপবাসীরা সমগ্র হিন্দু-সভ্যতা ভক্তিভরে শিক্ষা ও আয়ত্ত করে তাদের হিন্দু-গুরুদের গৌরবান্বিত করেছিল।

একটি সভ্য জাতি একটি অসভ্য জাতিকে নিজের ধর্ম আর্ট ও সাহিত্যের চেয়ে বড় আর কোন্ মহামূল্য বস্তু দান করতে পারে।

প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ই-চিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে স্বদেশে ফেরবার পথে সুমাত্রার অন্তর্গত শ্রীবিজয়রাজ্যে কিছুকাল বাস করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গিয়েছেন যে—

শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের মধ্যদেশের পণ্ডিতদের মত সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করেন, ও তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ আচার-বিচার মধ্যদেশের ক্রিয়া-কলাপ আচার-বিচারের

সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং ভবিষ্যতে চীন-পরিব্রাজকরা যেন প্রথমে শ্রীবিজয়ে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, পরে ভারতবর্ষে যান।

আমরা যেমন আগে গোলদিঘির পণ্ডিতদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা করে পরে বিলেত যাই।

ই-চিংয়ের পরামর্শ অনুসারে তাঁর পরবর্তী বহু চীনদেশীয় পরিব্রাজক সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা করবার জন্য যবদ্বীপ ও শ্রীবিজয়ে গিয়েছিলেন। এখানে একটি কথা বলে রাখি। যবদ্বীপে প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল, পরে সে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু যবদ্বীপে এ দুই ধর্ম পৃথক্ ছিল না, দুয়ে মিলে একই ধর্ম হয়। বুদ্ধ সে দেশে শিববুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ দেশে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার হিসেবেই গণ্য; কিন্তু সে দেশে শিবে ও বুদ্ধে সমান হয়ে গিয়েছিল। সেকালে হিন্দুরা যে অপর দেশের লোককে সভ্য করেছিল, এ কথা বিশ্বাস করা দূরে থাক্, এ যুগের আমরা তা কল্পনাও করতে পারি নে; কারণ এখন অপর দেশের লোক আমাদের সভ্য করছে, আর তাদের সভ্যতা আমরা সকল তন মন ধন দিয়ে মুখস্থ করতে এতই ব্যস্ত যে, ভারতবর্ষ যে এককালে সভ্য ছিল সে কথা আমাদের মনে স্থান পায় না, পায় শুধু মুখে।

সুতরাং ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক যবদ্বীপে গিয়ে বসতি করে, এ প্রশ্ন তোমাদের মনে উদয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রমাণের চেয়ে অনুমানের উপর বেশি নির্ভর করতে হয়; অর্থাৎ অন্ধকারে ঢিল মারতে হয়। ঐতিহাসিকরা সে ঢিল দেদার মেরেছেন, কিন্তু তার একটাও যে ঠিক লোকের গায়ে গিয়ে পড়েছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

তবে এটুকু ভরসা করে বলা যায় যে, তারা আর যে জাতই হোক, মাদ্রাজি নয়। যে উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথকে সভ্য করেছে, খুব সম্ভবতঃ তারাই ঐ দ্বীপবাসীদেরও সভ্য করেছে। যবদ্বীপে যে মহাভারতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা উত্তরাপথে যে মহাভারত প্রচলিত ছিল, তারই অনুবাদ।

কোথায় ভারতবর্ষের উত্তরাপথ আর কোথায় মহাসাগর, সুতরাং তাঁরা কোন্ বন্দর থেকে মহাসমুদ্রে অবতরণ করলেন? খুব সম্ভবতঃ তাঁরা মসলিপত্তনে গিয়ে জাহাজে চড়েছিলেন। আর গুজরাটের Broach নগর থেকে মসলিপত্তন পর্যন্ত যে একটি স্থলপথ ছিল, তারও প্রমাণ আছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসংগত নয় যে, আর্যাবর্তের আর্যরাই এই সভ্যতা-প্রচারকার্যে ব্রতী

হয়েছিলেন। মনু বলেছেন যে, আর্যদের আচারই একমাত্র সাধু আচার, অতএব তা 'শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ'। এ কথার ভিতর মস্ত একটা গর্ব আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে উদারতা আর মহত্ব। দক্ষিণাপথের তামিলরাও সুমাত্রা জয় করতে গিয়েছিল, কিন্তু সে বহুকাল পরে— খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে। তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল শ্রীবিজয়রাজ্য বিজয় করে তাকে শ্রীভ্রষ্ট করা। বলিদ্বীপের কথা বলতে গিয়ে যবদ্বীপের বিষয় দু কথা বললুম এই জন্য যে, সেকালের যবদ্বীপের হিন্দুধর্ম একালে বলিদ্বীপে মজুত রয়েছে।

রামায়ণের যুগে যবদ্বীপ সপ্তরাজ্যে উপশোভিত ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সে দেশে তিনটি মাত্র রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের হিন্দু-রাজ্যের যখন ধ্বংস হয় ও সে দেশের লোকে মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করে, তখন একদল লোক স্বধর্ম রক্ষা করবার জন্য যবদ্বীপ থেকে পালিয়ে বলিদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদেরই বংশধরেরা এখন বলির অধিবাসী। আর এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীরাই আজ পর্যন্ত তাদের স্বধর্ম ও স্বরাজ্য দুই রক্ষা করে আসছে। হিন্দু হলেই পরাধীন হতে হবে, বিধির যে এমন-কোনো নিয়ম নেই, তার তিলমাত্র প্রমাণ ঐ দেশেই আছে। বলিদ্বীপ স্বাধীন, কিন্তু যে হিসাবে জাপান স্বাধীন সে হিসাবে নয়; যে হিসাবে নেপাল স্বাধীন সেই হিসাবে, এবং একই কারণে। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের ধারা এই যে, সে দেশ প্রথমে মুসলমানের অধীন হয়, ও পরে খৃস্টানের। নেপাল ও বলি আগে মুসলমানের অধীন হয় নি, কাজেই তা আজ খৃস্টানের অধীন হয় নি।

বলিদ্বীপ একরত্তি দেশ হলেও কোনো একটি রাজার রাজ্য নয়, এই এক শ মাইল লম্বা ও পঞ্চাশ মাইল চওড়া দেশ অষ্ট রাজ্যে উপশোভিত। আর এই আটটি ভাগের আটটি পৃথক্ রাজা আছে। এর থেকেই বুঝতে পারছ, এ দেশে যা আছে তা পুরোমাত্রায় হিন্দু রাজ্য। ভারতবর্ষও হিন্দু-যুগে হাজার পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ দেশে যে দু জন একচ্ছত্র রাজত্ব করে গিয়েছেন, তাঁরা হিন্দু নন। অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, আর আকবর মোগল। এক রাজ্যের প্রজা না হলে এক দেশের লোক যে এক নেশন হতে পারে না, এ হচ্ছে ইউরোপের হাল মত। হিন্দুরা প্রাচীন যুগে যদি এক নেশন হয়ে থাকে তো সে এক ধর্মের বন্ধনে। অষ্ট রাজ্যে বিভক্ত হলেও বলির অধিবাসীরা এক নেশন— এক ধর্মাবলম্বী বলে। ইউরোপে

একালে নেশন গড়ে রাজায়; আর এ দেশে সেকালে গড়ত দেবতায়। পশ্চিমের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাজনীতি, আর পূর্বের সবচেয়ে বড় কথা ছিল ধর্মনীতি।

যেমন রাজ্যের ব্যবস্থায়, তেমনি সমাজেও তারা পুরো হিন্দু। তারা এক জাতি হলেও পাঁচ জাতে বিভক্ত। এ পাঁচ জাত হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও চণ্ডাল। এ পাঁচ জাত পরস্পর বিবাহাদি করে না। পূর্বে অসবর্ণ বিবাহের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। গীতায় ভয় দেখিয়েছে যে, এ করলে ও হবে, ও হলে তা হবে, আর তা হলেই হবে বর্ণসংকর, তার পরেই প্রলয়। বলির হিন্দুসমাজ বোধ হয় গীতার মতেই চলে। আর প্রাণদণ্ডটাও বোধ হয় দেওয়া হত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অনুসারে। যদি কোনো ঘাতক কারও প্রাণ বধ করতে ইতস্ততঃ করত তা হলে তাকে সম্ভবতঃ বলা হত—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

আমরা সকলেই যখন ব্রহ্ম তখন কে কাকে মারে, আর কেই-বা মরে। কিন্তু এতটা নির্জলা হিঁদুয়ানি এ যুগে চলে না। কারণ এ যুগের লোকের যখন-তখন মরতে ঘোর আপত্তি আছে, কিন্তু যাকে-তাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই। তাই এখন নিয়ম হয়েছে যে, অসবর্ণ বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যার বর্ণ নিম্ন, অপর পক্ষও সেই বর্ণ ভুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ জাতিভেদের কাঠামো বজায় থাকবে, কিন্তু লোকের এক বর্ণ ত্যাগ করে আর এক বর্ণে ভর্তি হবার স্বাধীনতাও থাকবে। স্কুলের ছেলেরা যেমন পড়া মুখস্থ না দিতে পারলে উপরের ক্লাস থেকে নীচের ক্লাসে নেমে যায়, বলির লোকেরাও তেমনি অসবর্ণ বিবাহের ফলে উলটো প্রমোশন পায়।

কিছুদিন পূর্বে বলিদ্বীপে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন সে প্রথা উঠে গিয়েছে। এখন সতী যায় শুধু রাজার ঝি-বৌরা। এর কারণ বোধ হয় রাজারা অবলাদের আঁচল না ধরে স্বর্গেও যেতে পারে না। সে যাই হোক, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বেন্টিঙ্ক সাহেব এ দেশে না এলেও এতদিনে হিন্দু-সমাজে সতীদাহ প্রথা উঠে যেত, ছেরেপ কালের গুণে।

বিবাহের পর আসে অবশ্য আহারের কথা। বলীয়ানরা কি খায় তা জানি নে, কিন্তু তারা গো-মাংস ভক্ষণ করে না, এমন কি বলিদ্বীপে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা কিন্তু শুয়োর নিত্য খায়, তবে তাতে তাদের হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। সে দেশে সকল বরাহই বন্যবরাহ, কারণ দেশটাই হচ্ছে বুনো দেশ।

তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দু কথায় দিই। ভারতবর্ষের সব দেবতা বলিদ্বীপে গিয়ে জুটেছেন। এমনকি কার্তিক সমুদ্রলঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে, আর গণেশ ইঁদুরে চড়ে। ইঁদুর যে পিঁপড়ের মত চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জান, কারণ ছেলেরা চিরকালই মেয়েদের কাছে শুনে আসছে যে, পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়।

কিন্তু সেখানকার মহাদেব হচ্ছেন কাল, আর মহাদেবী দুর্গা। বলিদ্বীপের দুর্গাপূজা নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। বলিদ্বীপের অধিবাসীরা বৌদ্ধও নয়, বৈষ্ণবও নয়। ওসব ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের প্রধান ব্যাবসা— অস্ত্রের ব্যাবসা— যে মারা যায়। আর বাকি থাকে শুধু বস্ত্রের ব্যাবসা। একমাত্র বস্ত্রের সাহায্যে স্বরাজ হয়তো লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু রক্ষা করা যায় না।

বলিদ্বীপের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, দেবদেবতার সংক্ষেপে যে পরিচয় দিলুম, তার থেকেই বুঝতে পারছ তারা যে হিন্দু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এমনকি, যেসব ইউরোপীয়ের সে দেশের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা বলেন যে তাদের যদি কেউ অহিন্দু বলে, তা হলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে।

বলিদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আছে, তখন সে দেশে নিশ্চয় পণ্ডিতও আছে। এই পণ্ডিতদের নাম পেদণ্ড। বলির পণ্ডিতরা সংস্কৃত পণ্ডিতের অপভ্রংশ না হয়ে কি করে যে ইংরেজি pedantএর অপভ্রংশ হল, সে রহস্য আমি উদ্‌ঘাটিত করতে পারি নে। তবে নামে বড় কিছু আসে যায় না। আমাদের দেশের পাণ্ডা, বিলেতের পেডাণ্ট ও বলির পেদণ্ড, সবাই একজাত; তিনজনই সমান মূর্খ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে হনুমানকে বলা হয়েছে যে—

সর্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমূর্খ।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা সর্বশাস্ত্র পড়ে পেডাণ্ট হয়, বলিদ্বীপের পণ্ডিতরা কোনো শাস্ত্র না পড়েই পেদণ্ড হয়; পূর্ব পশ্চিমের ভিতর এই যা প্রভেদ। আমরা পূর্ব, সুতরাং 'অন্ত' হবার চাইতে 'অণ্ড' হবার দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি।

এই কারণে আমার বলিদ্বীপে যাবার ভয়ংকর লোভ হয়, উক্ত দ্বীপে পেদণ্ডদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করবার জন্য। এ দেশের পেদণ্ডদের কাছে শাস্ত্রালোচনা ঢের শুনেছি, কিন্তু বলিদ্বীপের পেদণ্ডদের কাছে অনেক নূতন কথা শুনতে পাব বলে আশা আছে। সম্ভবতঃ সে সবই পুরোনো কথা, কিন্তু এত পুরোনো যে, আমার কাছে তা সম্পূর্ণ নূতন বলে মনে হবে।

দুঃখের বিষয়, বলিদ্বীপে যাবার বল এ বয়েসে আমার আর নেই। কারণ সে দেশে যেতে হয় প্লবেন প্লবনেন চ। আশা করি, তোমরা যখন মানুষ হবে, তখন তোমরা কেউ কেউ ও-দেশে একবার হাওয়া বদলাতে যাবে, বিদেশে হিন্দু সভ্যতার নয়, হিন্দু অসভ্যতার নিদর্শন দেখতে। আমরা বিলেতি পলিটিকাল সভ্যতা যেরূপ তেড়ে মুখস্থ করছি, তাতে আশা করতে পারি যে তোমরা যখন বড় হবে, তখন এ দেশের শিক্ষিত লোক এই স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, হিন্দু-সভ্যতা অতি মারাত্মক অসভ্যতা। আর পূর্বে যে তা সংক্রামক ছিল, তার পরিচয় ঐসব দেশেই পাবে। ভবিষ্যতে তোমাদের হিন্দুধর্মের প্রতি যদি কিছুমাত্র মায়া নাও থাকে, তবু এথনলজির উপর মায়া তো বাড়বে। আর বলিদ্বীপের পেদণ্ডদের কাছে ও-বিজ্ঞানের সরু মোটা অনেক তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারবে। পৃথিবীতে অসভ্য লোক না থাকলে এথনলজি অ্যানথ্রপলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানের জন্ম হত না ; যেমন পৃথিবীতে রোগ না থাকলে চিকিৎসাবিজ্ঞান জন্মাত না। সুতরাং আশা করি, আর কোনো কারণে না হোক, বিজ্ঞানের খাতিরেও বলীয়ানরা আর কিছুদিন তাদের অসভ্যতা রক্ষা করে বেঁচে থাকবে। তবে তাদের পাশে রয়েছে ওলন্দাজরা। তারা ইতিমধ্যে তাদের সভ্য না করে তোলে। আর ওলন্দাজি সভ্যতা আত্মসাৎ করতে পারলেই তারা আমাদেরই মত সভ্য হয়ে উঠবে। ইংরেজি সভ্যতার সঙ্গে ওলন্দাজি সভ্যতার শুধু সেইটুকু প্রভেদ, হুইস্‌কি ও জিন-এর ভিতর যে প্রভেদ। আসলে ও দুই এক। ও-দুয়ের নেশাই সমান ধরে। আর তার ফলে কারও দুর্বল দেহকে সবল করে না, শুধু সকলের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে।

সে যাই হোক, এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে এতক্ষণ ধরে যে বক্তৃতা করলুম, তার উদ্দেশ্য তোমাদের দ্বীপান্তর-গমনের প্রবৃত্তি উদ্রেক করা নয়, আমাদের পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল উদ্রেক করা। নিজের দেশের অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ায় কোনো লাভ নেই, কারণ যার অতীত অন্ধকার তার ভবিষ্যতও তাই— অর্থাৎ সেই জাতের, যার অতীত বলে একটা কাল ছিল।

১৩৩৪ বৈশাখ

সমাজ

তেল নুন লকড়ি

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশি রকমে অভ্যাস করেছি, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশি নিয়মে চর্চা করতে হবে। আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙালি ভাবে। সে ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলোমেলো ভাবেরই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দল বেঁধে বিধিব্যবস্থাপূর্বক সাহেব হই নি। প্রতিজনেই নিজের খুশি কিংবা সুবিধা অনুসারে নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশি আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষেরা পহিলা সমিতি করি নি, এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা-সমিতি পর্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমাদের নতুন ভাব কার্যে পরিণত করতে হলে ভাবনা-চিন্তা চাই; কি রাখব, কি ছাড়ব, তার বিচার চাই; পাঁচ জনে একত্র হয়ে কি করতে পারব এবং কি করা উচিত, তার একটা মীমাংসা করা চাই; এককথায়, ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য হয়েছে সেই উপায়— একটা পদ্ধতি— অবলম্বন করা চাই। সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝোঁকের মাথায় রোখের সহিত কাজ করতে গেলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হওয়াই দরকার। কিন্তু সমাজে থাকতে কিংবা ফিরতে হলে সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেককে ধরা দেওয়া চাই। আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিল না, স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই। যে পরিবর্তনের জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি, তার বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ বাহ্যবস্তু। কিন্তু সেই পরিবর্তন সুসাধ্য করতে হলে মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাকতে হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোনো চর্চা করবার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্বিচারে দাসত্ব স্বীকার করলেই হল; ছাড়তে হলেও দরকার নেই— নির্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন করলেই হল। কিন্তু ফিরতে হলে মানুষ হওয়া চাই; কারণ যে ফেরে, সে নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য স্থির করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙালি-সাহেবই হই, আর খাঁটি বাঙালিই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম; কেউ-বা

বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ-বা কিছু পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা বাঙালি-সাহেব। আমাদের হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, আজকালকার দিনে নতুন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে শৃঙ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি, বাদবাকি সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন। সুতরাং সকলে মিলেই স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সুতরাং যে পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত সেই পরিমাণে ফিরব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোনো লক্ষ্য ছিল না বলে এতদিন আমরা গা ঢেলে দিয়ে স্রোতে ভাসছিলুম, তার ভিতর কোনো আয়াস, কোনো চেষ্টা ছিল না ; এখন গম্যস্থানের একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে, সুতরাং সাঁতার কাটতে হবে— শুধু এলোমেলোভাবে, অতিবেগে হাত-পা ছুঁড়লে চলবে না ; তাতে পাঁচ জনে হাসবে, দশ জনে 'বাহবা কি বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ' বলবে, কিন্তু আমরা লাভের মধ্যে শীঘ্রই এলিয়ে পড়ব এবং নাকানি-চোবানি খাব।

পূর্বেই বলেছি যে, আমরা বাঙালিমাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারও মাথায় বা শুধু টিকি ; যাঁর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তিনি সেইটেই স্বদেশীয়তার ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইঙ্গবঙ্গ-দলের মন ভারি করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জাতি যদি কোনো স্থায়ী সুফল লাভ করে থাকে তো সে মনে, আর যা যা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে, সে বাহ্য আচার-ব্যবহারে। মোটামুটি ধরতে গেলে এ ব্যাপারের লাভলোকসানের হিসাবটা ঐরূপ দাঁড়ায়। সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট এবং জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, এমন আর অন্য কোনো শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয় নি। সকলেই অল্পবিস্তর বিলেতি মধু পান করেছেন, কিন্তু পুরো নেশা শুধু আমাদেরই ধরেছে। বিদেশি বস্তুর বড় বস্তা আমরা মাথায় বহন করছি, অপরে পুঁটলিপাঁটলা নিয়ে চলেছে। আমরা যদি আমাদের মাথার সে ভার নামাতে পারি, তা হলে অপরের পক্ষে তাদের মাথার সে ভার ঝেড়ে ফেলা কঠিন হবে না। এই স্বদেশীয়তার কথা শুধু দেশের কথা নয়, এ ঘরেরও কথা। বাঙালি যখন নিজের সমাজ ছাড়ে, তখন সেইসঙ্গে নিজের স্বভাব ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ;

অর্থাৎ সেখানেও অপরের পায়ের চাপ না পেলে তার দিন চলে না। আমাদেরও স্বভাব তাই। নিজের সমাজের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে বিদেশি সমাজের পায়ের চাপ আমরা পিঠে তুলে নিই। বাঙালিজাতকে পিটে গড়া হয় নি। আমরা ঢালাই হতে ভালোবাসি। এক ছাঁচ থেকে বেরলে আমরা অন্য ছাঁচে না পড়লে ঠাণ্ডা হই নে। অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক। এবং অনুকরণে যেহেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করা যায় না, সেই কারণে আমরা বিলেতি সভ্যতার উপকরণে আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেছেন যে, বিলেতি সভ্যতার কুলিগিরির মজুরি পোষায় না। কিন্তু দু-একজন ছাড়া মুখ ফুটে সে কথা বলতে বড় কেউ সাহসী হন নি। দেশীয় সমাজের রীতিনীতির অধীনতার মধ্যে, কার্যের না হোক, চিন্তার স্বাধীনতা আছে। যার মন আছে, তার সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; কিন্তু বিলাতের অনুকরণে যে বাঙালি ঘর বাঁধে, তার একূল-ওকূল দুকূল যায়। আমাদের মধ্যে যার মন যত ঢিলে, তার সাহেবিয়ানার আঁটাআঁটি তত বেশি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কোথায় যে বুঝতে পারে না, সে তার সর্বাঙ্গে হাতড়ে বেড়ায়। আমরা অনেকে একটা খোরপোশের বন্দোবস্ত করতে বিলেত যাই, সুতরাং বিলেতি সভ্যতার যে শুধু খাওয়া-পরার অংশটা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করব, এর আর আশ্চর্য কি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে আরামের লোভে আমরা সর্বস্ব খোয়াতে বসি, সেই আরামই আমাদের জোটে না; দেশীয় সমাজের চালচলন শৈশব হতে অভ্যস্ত বলে সেদিকে মন দিতে হয় না, ঠিক ঠিক জিনিসটে অবলীলাক্রমে করে যাই; কিন্তু বিদেশি চালচলন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচেগণ্ডূষ করতে হয়। একটু বয়েস হলে একটি বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করা যেমন কষ্টসাধ্য, একটি বিদেশি সমাজের হাজারো-এক খুঁটিনাটি আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করাও তেমনি কঠিন। বিলেতি সভ্যতার সুমুখে বাঙালি সাহেবের আঁচল টানতে টানতে প্রাণ যায়। খানায়-পোশাকে যাঁরা সভ্যতা খোঁজেন, তাঁদের খানার-পোশাকের কায়দা-কানুন কস্ত করতে নাস্তানাবুদ খানেখারাপ হতে হয়। যাঁরা মাছিমারা নকল করতে চান, তাঁদের নিত্য দেখতে পাই, অক্ষরের পর অক্ষর ধরে বিদেশি হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যকে

বানান করে পড়তে শুনলে মায়াও করে, বিরক্তিও ধরে। সাধারণ ইঙ্গবঙ্গের প্রতিও আমাদের ঐ মনোভাব। কারও কারও বা বিলেতি সভ্যতার বর্ণ-পরিচয় হয়েছে, কিন্তু অর্থবোধ হয় নি। এতদ্দেশীয় মুসলমান মহিলার কোরানপাঠের মত তাঁদের সভ্যতাচর্চার পরিশ্রমটা বৃথা যায়।

সংস্কারবশতঃ হিন্দুসমাজের প্রতি যাঁদের প্রাণের টান আছে, অথচ শিক্ষাবশতঃ যাঁরা সংস্কারমাত্রেরই অধীন নন, যাঁদের ধারণা যে ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ, যাঁরা বিলেতি আচার-ব্যবহার কতকপরিমাণে অবলম্বন করেন— হয় বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে, নয় জীবনে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে— এককথায় যাঁরা শ্যাম এবং কুল, দুইই রাখবার চেষ্টা করেন, তাঁরা আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট। বাদবাকি যাঁরা নিজের নিজের ব্যাবসা ব্যতীত অপর কোনো বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে-খরচ মনে করেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান। কেন্দ্রভ্রষ্ট ?— কোথাকার, কোন্ সমাজের, কোন্ কেন্দ্রভ্রষ্ট ? এ প্রশ্ন করলে সকল বুদ্ধিমানই নিরুত্তর। পড়ানো-কাকাতুয়ার কপ্‌চানো বুলির মত যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়, যদি তাঁদের বক্তব্যের ভিতর মনের কার্য কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে তো সে মনোভাব এই— তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি কেন্দ্র, তাঁদের কাছ থেকে যে যতটা তফাত, সে ততটা কেন্দ্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী। বিলেতফেরত-পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌরজগৎ ; হয় কর্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের কেন্দ্র ; পরিবারের আর সকলে গ্রহ-উপগ্রহের মত তারই চারিপাশে পাক খায়, এখানে-সেখানে দু-একটি ধূমকেতুও দেখা দেয়। আমাদের কারও গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্তিত যুগপৎপরিবর্ধিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র ; কারও-বা গৃহ বিলেতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ মাত্র। আমরা কেউ-বা বিদেশীয়তার দু-চার সিঁড়ি ভেঙেছি, কেউ-বা একলম্ফে বিলেতি সভ্যতার মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ত্রিশূলের উপর গিয়ে চড়ে বসেছি।

সাহেবিয়ানার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসন্তানকে যে কতদূর বে-এক্তিয়ার করে ফেলতে পারে, তার প্রমাণ ধর্মতলার রঙ্গমন্দিরে ধর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করুণ যাচ্ঞালব্ধ বিদেশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাব্লো Tableaux ভিভাঁ Vivants অভিধেয় বিচিত্র চিত্র-অভিনয়। নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিসে— অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্যবিপর্যয়ে। এ ব্যাপারে দুই লক্ষণেরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। ঐ দৃশ্য-কাব্যের পিছনে একটি দর্শন আছে, একটি কবিত্ব আছে ; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন

কিংবা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ নিউ ইণ্ডিয়া সংবাদপত্রে। উক্ত ব্যাপারের সপক্ষে নিউ ইণ্ডিয়ার মতামত, ইণ্ডিয়া না হোক নিউ বটে। জস্টিস অনুকূল মুখার্জির জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি নতুন ; এবং উভয় রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরেজি ফরাসি লাটিন গ্রীক এবং ইটালিয়ান নানা ছোট-বড় বাছা-বাছা বাক্য ও পদের অসংগত সমাবেশে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনীলেখকের রচনা ভাষার রাজ্যে যেমন এক অপূর্ব কীর্তি, জীবতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইতিহাস পুরাণ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোট-বড় নানা বাছা-বাছা শব্দ এবং বাক্যের অসংগত সমাবেশে সম্পাদক মহাশয়ের রচনা চিন্তার রাজ্যে তেমনি এক অপূর্বকীর্তি। লেখক কিছুই বাদ দেন নি— চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়। কলাবিদ্যার কতকটা জ্ঞান অনেকটা চর্চার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উলটো। দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে। কলাবিদ্যার শুধু শেষাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তাঁরা যে শুধু তার প্রথমাংশ জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগবানের লীলাখেলা হতে পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা করবার একটু বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্যতা এর উর্ধ্বে আর উঠতে পারে না। আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা, পেণ্ডুলম্‌কে ঐখান হতেই ফিরতে হবে, এবং কার্যতঃ ফিরতে আরম্ভ করেছে। ঘরে বিদেশি অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশি অত্যাচারের চাপ, এই দুয়ের ভিতর পড়ে যাঁরা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আজ চৈতন্য হয়েছে। ঐ ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্যমনস্ক লোকেরও মনে পড়ে গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ ব'লে কোনো জিনিস নেই। আমরা ঝরাপাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখনো-বা একত্র জড় করে, কখনো-বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ির এবং রক্তের বন্ধন আছে ; তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে, অপরের প্রাণের মূলও সেখানে— দেশের মাটিতে। কিন্তু আজ আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটেছে। আমরা নিজের নিজের সংকীর্ণ সমাজ ত্যাগ করলেও হিন্দুসমাজ আমাদের ত্যাগ করে নি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের মধ্যে আর-একটি সংকীর্ণ সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলুম, সৌভাগ্যক্রমে তাতে কৃতকার্য হই নি। আজকাল ভারত-

বাসীর দেহে নূতন প্রাণ এসেছে; হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশি সমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে স্বদেশির সঙ্গে বিদেশির পার্থক্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ, আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূত হয়েই আছি, সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান জন্মানো। আমরা যে সমাজে ফিরছি, সে সমাজ পূর্বে ছিল না, আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয় নি, ভবিষ্যতে তার রূপ যে কি হবে, তাও আমরা আজ ঠিক ধরতে পারি নে। তার স্বরূপ জানবারও কোনো আবশ্যক নেই; শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্‌বোধিত হয়েছে। সেই শক্তি আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগরূক হয়ে উঠেছে, যে শক্তির কার্য হচ্ছে আমাদের সমগ্র জাতির অপরূপ শ্রী এবং উন্নতি সাধন করা। জড়-পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়তে হলে আগে হতেই একটা প্ল্যান এবং এস্‌টিমেট করতে হয়; কিন্তু প্রাণ নিজের আকৃতি নিজে গড়ে নেয়, বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রকৃতি যে ফুল ফোটাবে, মানুষ তার সাহায্য করতে পারে কিংবা বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাতে স্বকপোলকল্পিত বর্ণ গন্ধ আকার এনে দিতে পারে না। কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, গাছের ফুল ভালো করে ফোটানোতে সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের স্বদেশি সমাজের অক্ষয়-বটে নূতন পাতা দেখা দিয়েছে, আমাদের কর্তব্য এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল জোগানো, আর চারপাশের জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল স্বদেশি সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব, কিন্তু সে তার শাখাপ্রশাখা হয়ে, পরগাছা হয়ে নয়। সুতরাং আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশি না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন মন ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়। আমাদের এই ধারণাটুকু জন্মানো উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত করে ফেলবার অধিকারী নন; সকলের শক্তি একত্র করে, সংহত করে, স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্যে প্রয়োগ করতে হবে। অল্প হোক, বিস্তর হোক, আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয়, তার জন্য প্রথমতঃ দিক্‌নির্ণয় করা দরকার। তার পর, কোথায় কি উপায়ে নিজশক্তি প্রয়োগ করতে পারি, তার হিসাব জানতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি ক্রমে ফলাও এবং

গুরুতর হয়ে আসছে। এই স্থানেই সুতরাং আমাকে মনের রাশ টেনে ধরতে হবে। এ প্রবন্ধে আমার কতকগুলো সাদাসিধে ছোটখাটো দৈনিক আচার-ব্যবহারের আলোচনা করবার অভিপ্রায় আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখছি ধান ভানতে বসে শিবের গীত শুরু করে দিয়েছি। এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে নামাই আমার পক্ষে কর্তব্য। আর-একটি কথা বলেই আমি প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করব। সে কথাটি হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আজকের দিনে নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নূতন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক-না কেন, মাটির গুণে তাকে স্বদেশি হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্তি পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চা করছিলুম, কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জন করা যায় না, এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্তমান অশান্তি শুধু নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব বিকারের ছটফটানি নয়। যে সমাজে প্রাণ আছে, সে সমাজে প্রাণের যে প্রধান লক্ষণ— বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্ম-পরিবর্তন— সে লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম্ ধাতু হতে উৎপন্ন, এমন গুণী আমরা কেউ নই যে জগতের ধাত বদলে দিতে পারি। স্বদেশিভাবের মূল হতে অনেক আশার ফুল ফুটবে, কিন্তু ফল ধরবে না। দেশের মাটি ভালোবাসি বলে যে, মাটি নিতে হবে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, শেষটা মাটি হতে হবে, এ ভুল যেন কেউ না করেন। আমরা আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে চলেছি, তখন এইটে মনে রাখতে হবে যে, দেশের মাটি আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবান্দত্ত অটল নির্ভর। অতীতের যে আগুন নিবেছে, যার এখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাতে অতি ভক্তিভরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেলব; কিন্তু আমাদের জাতির প্রাণে যেখানে আজও আগুন আছে, সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা করতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় শুধু ছাই আর কোথায় ছাই-ঢাকা আগুন আছে কি করে জানব? তার উত্তর, যদি স্পর্শ করে আগুন না চিনতে

পার তো পাঁজি-পুথির সাহায্যে তা পারবে না। অতঃপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতে হবে। বড়গোছের একটা লাফ মারবার পূর্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয়; আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্ছে। সরীসৃপের মত সমাজও ক্রমাগত দেহকে আকুঞ্চন-প্রসারণ করে অগ্রসর হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্তব্য, সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলতে উদ্যত হয়েছি।

২

বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—

ভুল গেয়া রাগরঙ্গ, ভুল গেয়া ইয়কড়ি,
ইয়াদ রহা আজ খালি তেল নুন লকড়ি।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকটা ঐ ভাবের দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য কতই-না হাবভাব লীলাখেলার চর্চা করেছি। ওনার মনোমত কেশবিন্যাস বেশবিন্যাস বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরী অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীয় হতে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নি। এত করেও যখন মন পেলুম না, তখন মান-অভিমানের পালা শুরু করলুম। ফল তাতে উলটো হল— দাম্পত্য প্রণয়ের দাবি করাতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ তেল নুন লকড়ির কথাই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবজাতিকে আমরা যে যেই ভাবে দেখি-না কেন, মানবজীবনে সকলেই তেল নুন লকড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দিরই মনে করি, এ পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করলে শুধু পরলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে অন্ন প্রাণ। সুতরাং অন্নচিন্তাই প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা। এই অন্নচিন্তা হতে উদ্ধার না পেলে অন্য চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেল নুন লকড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে মনের এবং আত্মার পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। মেটিরিয়াল প্রস্‌পারিটি সভ্যতার চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায়। তেল নুন লকড়ির

অধীনতা হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়— তেল নুন লকড়ির সংস্থান করা। আমাদের আজ হঠাৎ চৈতন্য হয়েছে যে, ভারতবাসীর সে সংস্থান নেই। আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি, কেননা দেশের রস বিদেশে টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস নিজ দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত করতে পারি, সেই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, তা হলে আমাদের 'রাগরঙ্গ ইয়কড়ি' ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, তা হলে মনে রাখতে হবে শুধু 'তেল নুন লকড়ি'। রাস্কিন সমস্ত জীবন ধরে ইংলণ্ডকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ইকনমিক্‌স্‌— এই গ্রীক শব্দের আদিম অর্থ হাউসহোল্ড ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ গেরস্থালি। প্রতি গৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন, তা হলে সমগ্রজাতি লক্ষ্মীছাড়া হবে। ঘর যদি অগোছাল রাখ, তা হলে হাটে-বাজারে যতই কেনা-বেচা কর-না কেন, তাতে নিজে কিংবা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখ লাভে সমর্থ হবে না। এ মতের মধ্যে এইটুকু খাঁটি সত্য নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সমৃদ্ধিলাভের যে সমবেত চেষ্টা করি, তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নিষ্ফল করে দিতে পারি। আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে একদিকে টানি, আর প্রতি লোক ঘরে এসে তার উলটো টান টানি— তা হলে ঘর বার দুই নষ্ট হবে। আমি রাস্কিনের শিষ্যস্বরূপে এই কথা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছি যে, সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।

৩

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে যে কোন্ দেশীয় বলা কঠিন। বাংলার বাইরে, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কোথাও তার জুড়ি দেখতে পাই নে। গৃহ যেমন সমাজের মূল, তেমনি আবার শহরেরও বুনিয়াদ। গৃহ হতে পল্লী, পল্লী হতে নগর, নগর হতে শহর— ক্রমবিকাশের এই নিয়ম। রোম প্যারিস প্রভৃতি বনেদি শহরের আর্কিটেক্চরেতেই তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। ঐ আর্কিটেক্চরের প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের সুখ দুঃখ আশা ভরসা সফলতা ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে নেয়; প্রত্যেকেই নিজের আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের পক্ষে স্বজাতীয়তার ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা

দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক ; তা হতে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের ভিতর মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব ক'রে স্বজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, তেমনি ইউরোপের মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান খর্ব ক'রে মানবজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌, তাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে ইন্‌টারন্যাশনালিজ্‌ম্‌। সে যাই হোক, কলিকাতার মত ভুঁইফোঁড় শহরে শ্রীহীন অর্থহীন কিম্ভূত-কিমাকার ভুঁইফোঁড় গৃহে বাস ক'রে আমাদের পক্ষে স্বদেশি ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়। চকমেলানো বাড়ি হালফ্যাশানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একটি লম্বা গোছের ঘর, তার এপাশে ছুটি, ওপাশে ছুটি— এই পাঁচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ। মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের ঘর, এবং উভয় পার্শ্বের বহির্দিকের ঘর-ক'টি হচ্ছে অন্দর। বাসস্থানের এই উলটোপালটা ভাবের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের বরাবর যোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীষ্মের দেশে ঘরে হাওয়াও চাই ছায়াও চাই, একসঙ্গে দুই পাওয়া অসম্ভব ব'লে এদেশের গৃহ দু ভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট খোলা, অপর অংশ সূর্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্রই পঞ্চভূত মিলে মানুষের গৃহনির্মাণের হিসাব বাত্‌লে দেয়। প্রকৃতিই এ দেশের গৃহ সদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়েছিলেন। এবং আমাদের সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অসূর্যম্পশ্যা হবার লোভেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন। যেখানে গৃহে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট নেই, সেখানে সমাজেও স্ত্রীপুরুষের সাম্য অর্থে ঐক্য— এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করে। ইংরেজিয়ানার প্রসাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর ভেস্তে যাবার প্রধান ফল এই যে, আমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গৃহে অনেকটা সংকুচিত ভাবে বাস করে। আমাদের ড্রয়িংরুম পাড়াপড়শীর বৈঠকখানা হতে পারে না, এবং বাড়ির কোনো অংশই মেয়েদের দুর্গ নয়। এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্বদা মনে জাগরূক রাখবার জন্য ইংরেজ দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন, নইলে ভয় পাছে জাতিরক্ষা না হয়। আমরা তাঁদের অনুকরণে বাসা বাঁধলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব-সমাজ হতে দূর হয়ে পড়ি। মোটামুটি আমার বক্তব্য কথা

এই, মানুষমাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ গৃহ দিয়ে ; স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐখানেই, গৃহ্যসূত্র হতেই মানবধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। গৃহের রূপান্তরের সঙ্গেসঙ্গে গৃহীর রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি কাউকে বাড়িবদলানোর পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ করতে রাজি নই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতের আশার একমাত্র ভরসা— একটা বড়গোছের ভূমিকম্প।

গৃহে প্রবেশ করেই এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখতে পাই যে, বিদেশি বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে, এবং তার অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। সাহেবিয়ানার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভবরকম জটিল হয়ে পড়েছে। আসবাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুশকিল, চলে-ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা তো একেবারেই নেই। এই জটিলতার মধ্যে সকলকেই কুটিল গতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথমেই মনে হয় যে, এ ঘর বাসের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য নয়— সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য, গৃহস্বামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা প্রদর্শনী মাত্র, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনের অপ্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের নূতন ধরনের গৃহসজ্জার বর্ণনা করবার কোনো দরকার নেই, কারণ তা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। চেয়ার টেবিল কৌচ টিপয় পিয়ানো আয়না, ছিটের পরদা, ব্রাসেল্‌সের কারপেট, চীনের পুতুল, ওলিয়োগ্রাফের ছবি— এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এইসকল উপকরণ হয় লাজারস এবং অস্‌ল্যার, নয় বৌবাজারের বিক্রিওয়ালার দোকান হতে সংগ্রহ করা হয়। যিনি ধনী, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে দোকান বলে ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে ভ্রম হয় ; আসবাবপত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত, নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোনো চৌকির হাত নেই, কোনো টিপয়ের পা নেই, কোনো টেবিলের পক্ষাঘাত হয়েছে ; পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কৌচের নাড়িভূঁড়ি নির্গত হয়ে পড়েছে, চীনের পুতুলের ধড় আছে কিন্তু মুণ্ড নেই, পারিস পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত, ওলিয়োগ্রাফ-সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়ম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এইসকল অব্যবহার্য কদর্য আবর্জনা দূর ক'রে তার পরিবর্তে ফরাশ বিছিয়ে বসি না কেন ?— কারণ

ইংরেজের কাছে আমরা শিখেছি যে দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

আমাদের এই নবসভ্যতার আজবঘরে স্বর্গীয় পিতামহগণ যদি দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তা হলে নিঃসন্দেহ সব দেখেশুনে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক হয়ে তাঁরা ঊর্ধ্বনেত্রে চেয়ে থাকবেন, নির্বাক হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে থাকব। উভয় পক্ষে কোনো বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব। অপরিচিত অশন-বসন আসন-ভূষণের ভিতরে কিরূপে জাতি রক্ষা হয়, তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না ; কৈফিয়ত চাইলে আমাদের মধ্যে যাঁর কিছু বলবার আছে তিনি সম্ভবতঃ এই উত্তর দেবেন যে, 'জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট সংকীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে ; রক্ষা অর্থে আপনারা বুঝতেন শুধু স্থিতি, আমরা বুঝি উন্নতি ; আপনাদের গুরু ছিল মনু, আমাদের গুরু হার্বার্ট স্পেন্সার ; আমাদের নূতন চাল আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকূল, কিন্তু আমাদের হিসাবে অনুকূল।' এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তা হলে আমার আপত্তির কোনো কারণ নেই ; কেননা যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, এমনকি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে তার কোনো প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানভূমি আছে, একটি দিক নির্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। পরিবর্তন যেমন কালসাপেক্ষ, পরিবর্ধন তেমনি দেশ ও পাত্র সাপেক্ষ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্বপুরুষরা বিরাজ করছেন, এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্বপুরুষদের সমাজ বিরাজ করছে। বংশপরম্পরা হেরিডিটি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পূর্বপুরুষদের স্থান হয় না, সে গৃহে ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মানবজীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। স্মৃতি যেমন প্রতি মানবের অহংজ্ঞানের মূল— পূর্বাপরের যোগসূত্র-স্বরূপ স্মৃতির অস্তিত্ব না থাকলে, আত্মোন্নতি দূরে থাকুক,

কেহই আত্মার সন্ধানও পেতেন না— তেমনি অতীতের স্মৃতি জাতীয় অহং-জ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশূন্য হয়ে কোনো জাতি জাতীয় আত্মার সন্ধান পায় না, জাতীয় আত্মোন্নতি দূরে থাকুক। সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে পিতা-পিতামহ ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তু। সেই বাস্তুজ্ঞানরহিত হলে আমাদের বস্তুজ্ঞানশূন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক তুলে ইঙ্গবঙ্গ-নামক খেটে-খাওয়াদলের লোককে বিরক্ত করবার কোনো সার্থকতা নেই। এঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন আলোচনা বন্ধ করবার জন্য, আরম্ভ করবার জন্য নয়। হার্বার্ট স্পেন্‌সার এঁদের গুরু, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন, দীক্ষাগুরু। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এঁরা কিছুই শিক্ষালাভ করেন নি, শুধু দুটি-একটি বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছেন, যথা সভ্যতা উন্নতি ইত্যাদি। অন্যান্য তান্ত্রিকদের মত এই তান্ত্রিকদেরও নিকটে বীজমন্ত্র যত দুর্বোধ, সম্ভবতঃ যত অর্থশূন্য, তত তার মাহাত্ম্য। ইউরোপীয় সভ্যতা এঁরা জ্ঞানের দ্বারা পেতে চান না, ভক্তির দ্বারা পেতে চান। দাস্যভাব-সখ্যভাবের চর্চাই এঁরা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। আমরা এঁদের যে অবস্থাটাকে দুর্দশা বলে মনে করি, সেটি শুধু ইউরোপভক্তির দশা মাত্র।

যাঁরা তর্ক করতে প্রস্তুত, তাঁরা তর্কে হার মানতেও প্রস্তুত ; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের মনোভাব এই যে, নগদ দামে নাহয় ধার ক'রে দুখানা কৌচ মেজ কিনব, এর মধ্যে আবার দর্শন-বিজ্ঞান কোথায় ? নিজের কি আবশ্যক এবং নিজের কি মনোমত, সেটা ঠিক করতে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করবার দরকার নেই। সুতরাং সাহেবিয়ানার সপক্ষে এঁরা হয় সুবিধা, নাহয় সুরুচির দোহাই দেন। যখন বিউটির দোহাই চলে না, তখন ইউটিলিটির দোহাই দেন ; যখন ইউটিলিটির দোহাই চলে না, তখন বিউটির দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের ইউটিলিটির ব্যাখ্যান শুরু করেন, তখন মনে হয় এঁরা জন্ স্টুয়ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান ; আর যখন এঁরা বিলাতি ছিট, বিলাতি কারপেটের বিউটির ব্যাখ্যান শুরু করেন তখন মনে হয় অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের মাসতুতো ভাই। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ এঁদের জিজ্ঞাসা করে যে, জেল কিংবা পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা ও রকম কেন, এঁরা হেসে উত্তর করবেন 'আমরা কবি নই, কাজের লোক'। এঁদের বিশ্বাস

দো-আঁস্‌লা কুকুরের ল্যাজের মত ইঙ্গবঙ্গের চুল যত গোড়াঘেঁষে কাটা যায়, তার তেজ তত বৃদ্ধি হয়, তত রোখ বাড়ে। এবং এই বিশ্বাস Mill মিলের মতানুযায়ী। এঁদের রুচি সম্বন্ধেও এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ইংরেজি আসবাবের আবশ্যকতা এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।

বিদেশি রকমে ঘর সাজানোতে যে আমাদের কি পর্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ হয়, তা তো সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের পক্ষে ঠাট বজায় রাখতেই প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হতে হয়। ধার-করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে অনাবশ্যক বহুব্যয়সাধ্য আচার-ব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকি তো বটেই, সম্ভবতঃ অন্যায়ও ; ক্ষমতার বহির্ভূত চাল বাড়ানো, গৃহ হতে লক্ষ্মীকে বিদায় করবার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশির অনুকরণে বিদেশি বস্তুতে যদি গৃহ পূর্ণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, দেশের ধনে যদি বিদেশির পকেট পূর্ণ করতে হয়, তা হলে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সে অনুকরণ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ানো যায়, জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিষ্কার হয়। যদি আমার এত না হলে দিন চলে না এমন হয়, তা হলে তত সংগ্রহ করবার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে ; এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম স্বীকার করতে বাধ্য, সে জাতি তত উন্নত, তত সৌভাগ্যবান্। কিন্তু ফলে কি দেখতে পাওয়া যায় ? ইউরোপবাসীরা এই বাহুল্যচর্চার দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে বলে কর্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এশিয়াবাসীদের নিকট সর্বত্রই হার মানছে। এই কারণেই দক্ষিণ-আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চীনে জাপানী হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে নানা গর্হিত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়াবাসীরা খাওয়া-পরাটা দেহধারণের জন্য আবশ্যক মনে করে, মনের সুখের জন্য নয় ; সেইজন্য তারা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তোষ আমাদের জাতিরক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের পরিশ্রমের ফলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ লাভ করতুম, আমরা যদি বঞ্চিত প্রতারিত না হতুম, তা হলে দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার উঠত না। আমাদের এ দোষে কেউ দোষী করবেন না যে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করি নে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে। আমাদের দেশে আজকাল

শিক্ষিত লোকের, বিশেষতঃ ইঙ্গবঙ্গ-সম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, স্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ বাড়ানো সভ্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্বনেশে ধারণা তাঁদের মন থেকে যত শীঘ্র দূর হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুক্তি ছাড়া জীবনযাত্রার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের সপক্ষে আর কোনো যুক্তি শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে অনেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে থাকেন, 'আমার খুশি'। আমাদের দেশের রাজা সমাজের অধিনায়ক নন। বিদেশি বিধর্মী রাজা এদেশে কখনো সামাজিক দলপতি হতে পারেন না, সুতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা প্রবেশ করেছে। যে সমাজে শাস্ত্র আছে কিন্তু শাসন মানাবার কোনো উপায় নেই, সেখানে শাসন না মেনে যে কাজে কোনো বাইরের শাস্তি নেই সে কার্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে এঁরা যে নিজেদের বিশেষরূপে নির্ভীক স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দূল বলে প্রমাণ করেন, তার আর সন্দেহ কি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এঁদের খুশি প্রভুদের খুশির সঙ্গে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে বদলায়। সে তো হবারই কথা। এঁরাও সভ্য, তাঁরাও সভ্য, সুতরাং পরস্পরের মিল— সে শুধু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, চেয়ার টেবিল কৌচ মেজ ইত্যাদি দেহ আত্মা কিংবা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূর সাহায্য করে, তা হলে আমি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকব, কারণ সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, চৌকি কৌচ অনেকটা আরামের জিনিস এবং আমরা অনেকেই অভ্যস্ত আরামভোগে বঞ্চিত হতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কমজোর এবং ঈষৎ বক্র, সুতরাং আমরা পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী। এবং আরাম-চৌকি এখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোগশাস্ত্রে বলে, সকল প্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদণ্ড বর্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধনা হচ্ছে আসন অভ্যাস করা, পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গি স্ত্রীলোকের মত, সম্মুখ দিকে ঈষৎ আনমিত— অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যস্ত সেলাম এবং নমস্কারচর্চা বশতঃ। আমাদের জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগ্রত করতে হয় তা হলে আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া করতে হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং একমাত্র দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশি আসবাবের প্রচার এবং অবলম্বন সমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন যে, জাপান ইউরোপের কাছে যা শিখেছে আমরা তা শিখি নি; কিন্তু খুব কম

লোকেই জানেন যে, ইউরোপের কাছে আমরা যা শিখেছি জাপান তা শেখে নি। ফলে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমরা শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষালাভ করতে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি আমাদের বর্জন করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই আমাদের সর্বপ্রধান দরকার, এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ আমাদের গুরু হতে পারে না, কারণ জাপান শুধু এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করেছে। খাওয়া-পরা-থাকা-শোওয়া সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করে নি। বিলেতি আসবাব জাপানের ঘরে স্থান পায় নি। আজও সমগ্র জাপান মাদুরের উপর বীরাসনে আসীন।[১]

৪

বিলেতি জিনিসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচার শেষ করে, এখন তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্টস্কুলে পাঠানো হয়; এবং ঐ একই কারণে যুক্তি যখন অন্য কোনো দাঁড়াবার স্থান না পায় তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় 'আমি বিশ্বাস করি' এ কথার উপর যেমন আর কোনো কথা চলে না, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় 'আমার চোখে সুন্দর লাগে' এ কথার উপরও তেমনি আর কোনো কথা চলে না। সৌন্দর্য অনুভূতির বিষয়, জ্ঞানের বিষয় নয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। অতএব যিনি আর্ট জিনিসটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন, নিজে তিনি তত বেশি বোঝেন। ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভবতঃ লোক ধর্মজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু রূপ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোকে সৌন্দর্যজ্ঞ হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্য স্বপ্রকাশ। সৌন্দর্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর নির্ভর করে।

---

১ জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যাঁরা জানতে চান তাঁদের আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থগুলি পড়তে অনুরোধ করি: K. Okakuraর *Ideals of the East* এবং *The Awakening of Japan*; Y. Okakuraর *Spirit of Japan*; Nitobeর *Bushido*; Lafcadio Hearnএর *Kokora* প্রমুখ গ্রন্থাবলী। যদি কারও এত বই পড়বার সময় এবং সুবিধা না থাকে এবং ফরাসি ভাষা জানা থাকে, তা হলে তাঁকে আমি Felicien Challayeর *Au Japan* নামক গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। লেখক গুটি পঞ্চাশ পাতায় আসল কথা অতি পরিষ্কার করে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

সেই পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি, যার স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত হয়েছে। রূপ হচ্ছে বিশ্বের ভাষা, এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে কোনো পদার্থে হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যকীয়, মানুষে তাই হাতে গড়ে; সেই গঠনকার্যের সার্থকতা এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট। নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্যকতার বিরহে সৌন্দর্য শুকিয়ে মারা যায়। সুতরাং যে জাতির পক্ষে যেসকল জিনিস জীবনযাত্রার জন্যে আবশ্যকীয় নয়, সে জাতির পক্ষে সেসকল জিনিসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি সৃষ্টিপ্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কানে নয়। আর্টের সন্ধান তার স্রষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিংবা শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার ভিতর যেটুকু আনন্দ প্রাণ ও ক্ষমতা আছে, সেইটুকু অনুভব করার নাম সৌন্দর্য ভোগ করা। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে যে আর্টিস্টের সঙ্গে আমাদের চরিত্রের, ধর্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে, আমরা অনেক পরিমাণে যার সুখদুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ্যপ্রকৃতির ভিতর একই সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে বাস করি, তার আর্টই আমাদের পক্ষে যথার্থ আর্ট। বিদেশি এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদের অনেকেরই পক্ষে বিদেশি আর্টের চর্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে বিদেশি দোকানদারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে প্রবঞ্চিত করি। আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রুপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনি নে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তাদেরই হস্তরচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে সুখী না হই, খুশি থাকি। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলামচোর হওয়ায় লজ্জা পাওয়া দূরে যাক, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, আমরা যদি ইউরোপীয় আর্টের মর্যাদা না বুঝতে পারি, তা হলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-চর্চাও আমাদের ত্যাগ করা কর্তব্য। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন দেশের লোকের ভিতর পার্থক্য যতই থাকুক, মানুষে মানুষে প্রবৃত্তির বাসনার মনোভাবের মিলও

যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ মানবপ্রকৃতি, সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল-অতিরিক্ত মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চিরনবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্বমানবের সমান অধিকার আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে যে অংশটুকু আর্ট, সে অংশ আমরা ঠিক ধরতে পারি নে। বিদেশি লেখকের লেখনীর পরিচয় আমরা অনেকেই পাই না। সে যাই হোক, সাহিত্যে এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলায় প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের উপকরণ অন্তর্জগৎ হতে আসে, কলার উপকরণ বাহ্যজগৎ হতে আসে। মনোজগতে দেশভেদ নেই, এশিয়া ইউরোপ নেই, এককথায়, মনোজগতের ভূগোল নেই। কিন্তু বাহ্যজগতে ঠিক তার উলটো। এক দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হতে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যই কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষত্ব হতে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়তা অসম্ভব; সুতরাং এক্ষেত্রে স্বদেশের অধীনতা-পাশ মোচন করবার জো নেই। বিজ্ঞানের বিষয়ও বস্তুজগৎ; কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন, কেননা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে তার সামান্য ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া। আর্টের সম্পর্ক বস্তুজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। বিজ্ঞানের অভিপ্রায় বিশ্বকে এক করে আনা, আর্টের কার্য নিত্য বৈচিত্র্য সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এইসকল কারণে নিউটন এবং ডারউইন আমাদের জ্ঞাতি, শেক্‌স্‌পীয়ার এবং মিলটন আমাদের কুটুম্ব, কিন্তু রাফায়েল এবং বীঠোফেন আমাদের পর। এইজন্যই জাপান ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিন্তু নিজের আর্ট ছাড়ে নি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপের উচ্চাঙ্গের আর্টের যথার্থ মর্মগ্রহণ করতে পারেন, তিনি অবশ্য ভক্তির পাত্র। পৃথিবীর যে দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠকীর্তি আছে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যখন প্রায়ই দেখতে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের 'গা' থেকে 'পা'র প্রভেদ ধরতে পারেন না, তিনিই বীঠোফেনের প্রধান সমজদার; এবং যিনি রংটা নীল কিংবা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বলতে অপারগ, তিনিই টিশিয়ানের চিত্রে মুগ্ধ, তখন স্বজাতির

ভবিষ্যতের বিষয় একটু হতাশ হয়ে পড়তে হয়। সে যাই হোক, উপস্থিত প্রবন্ধে যেসকল বস্তুর আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি— যথা ছিটের পরদা, ব্রাস্‌ল্‌সের কারপেট, চীনের পুতুল, কাঁচের ফুলদানি, কি স্বদেশি কি বিদেশি সকলপ্রকার আর্টের অভাবেই তাদের বিশেষত্ব। বিলাতের সচরাচর গৃহ-ব্যবহার্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিত। এর দুটি কারণ আছে। পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্যজগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আর্টেরও বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-ময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম এস্‌থেটিকাল কোয়ালিটি, অর্থাৎ 'রূপ'; এবং মনের সেই সুখলাভ করবার ক্ষমতার নাম এস্‌থেটিক ফ্যাকাল্‌টি, অর্থাৎ 'রূপজ্ঞান'। ইংরেজ বিশেষ খোসাপুরু জাত। ভগবান্ ইংরেজকে নিতান্ত স্থূলভাবে গড়েছেন ; তার দেহ স্থূল, প্রকৃতি স্থূল, ইন্দ্রিয়ও তাদৃশ সূক্ষ্ম নয়। বস্তুমাত্রেই ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু রূপমাত্রেই ইংরেজের চোখে কিংবা কানে ধরা পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরেজের চেয়ে আমাদের দেশের সচরাচর রঙ্গরেজের চোখ রং সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জিত। এই কারণেই বিলাতের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়। এই গোড়ায়গলদ থাকবার দরুন, ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্‌টিক হয় না। ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকল এ বিষয়ে ইংরেজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও অপর আর-একটি কারণে ইউরোপের আর্টের আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে একভাবে দেখে, আর্ট আর-একভাবে দেখে। বিজ্ঞানের চেষ্টা সোনামুঠোকে ধুলোমুঠো করা, আর্টের চেষ্টা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর অযথা প্রতিপত্তিলাভ করেছে, কেননা বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে আলাদিনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম ঐশ্বর্য লাভ করা যায় তাই নয়, আলোকও লাভ করা যায়। সে আলোকে শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদবাকি সব ছায়ায় পড়ে যায়, যথা— মন প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোককে আমরা যদি একমাত্র আলোক বলে ভ্রম করি, তা হলে মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য এবং অচ্যুত আনন্দ হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু জড়ভাবে দেখলে মনেরও

জড়তা এসে পড়ে। কেবলমাত্র পরমাণুর স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মের সখী হয়েই কলাবিদ্যা পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সখ্যবন্ধন ছিন্ন করে আর্টকে জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের মতে মানবের আদিম চেষ্টা নিজের এবং জাতীয় জীবন রক্ষা করা। নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তান উৎপাদন করা, এই দুটি জীবজগতের মূল নিয়ম। এই দুটি আদিম দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তা হলে 'আবশ্যকতা'র অর্থ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যা দেহের জন্য আবশ্যক তাই যথার্থ আবশ্যকীয় বলে গণ্য হয়, আর যা মনের জন্য আত্মার জন্য আবশ্যক, তা আবশ্যকীয় বলে মনে হয় না। ইউরোপে ইউটিলিটির এই সংকীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য হবার দরুন ইউটিলিটি এবং বিউটির বিচ্ছেদ জন্মেছে। ইউরোপের আবশ্যকীয় জিনিস কদর্য এবং সুন্দর জিনিস অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে আর্ট এখন ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছে। আহার বিহার এখন ইউরোপের প্রধান কাজ হয়ে ওঠার দরুন, যে আর্টিস্ট আর্টকে জীবনের ভিতর নিয়ে আসতে চান তিনি আর্টকে পূর্বোক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের দাসী করে তোলেন। এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্তির এত ছড়াছড়ি। শতকরা একজনে যদি ঐরূপ মূর্তিতে সৌন্দর্য খোঁজেন, অবশিষ্ট নিরানব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুশি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগবিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠবে, তার আর আশ্চর্য কি। ইউরোপের পক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির করবে। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো ইচ্ছনীয় নয়। ইউরোপের যথার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা আমরা সহজেই অভ্যাস করতে পারি। আমার প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক থেকে দেখা দুরবিনের উলটো দিক থেকে দেখার তুল্য, দ্রষ্টব্য পদার্থ আরও দূরে চলে যায়। কর্তার দিক থেকে দেখাটাই ঠিক দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি, তারই মর্ম তারই মর্যাদা আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝতে পারি। আমাদের স্বদেশের কীর্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চা করব বলে চীৎকার করছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। জাতীয় আর্ট

যে শ্রেণীরই হোক, তার চর্চায় আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে। এই পরম লাভ। সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিসের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চলতে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একেবারেই চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হলে বিলাতি-ছিটভক্ত হওয়া যায় না। আর যিনি আদর ক'রে দুয়ারে বিলাতি পর্দা ঝোলান তাঁর পর্দানশিন হওয়া উচিত।

৫

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা। পরিচ্ছদের ঐক্য সামাজিক ঐক্যের লক্ষণও বটে, কারণও বটে। আমরা প্রতিবাসীকে প্রতিবেশী বলেই জানি। হিন্দুরা সমাজের সঙ্গেসঙ্গে বস্ত্র ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোরকৌপীন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার প্রথম সংস্কার কোট-পেণ্টুলুন ধারণ। বিলেতের বেশ যে ভারতবাসীর পক্ষে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কথাটা এতই সাদা যে, যিনি তা বুঝতে পারেন না, তাঁর ঔষধ মধ্যমনারায়ণ তৈল, যুক্তি নয়। দেহকে কষ্ট দিলেই যদি মনের উৎকর্ষ লাভ করা যেত, তা হলেও নয় এই বোতাম-বক্‌লসের অধীনতা এবং বন্ধন একরকম কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত। কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবার মাহাত্ম্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। যিনিই 'কলার' ব্যবহার করেছেন, তিনিই কোনো-না-কোনো সময়ে রাগে দুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে—

ভূষণ ব'লে কিনব না আর
পরের ঘরে গলার ফাঁসি।

ইউরোপ যে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট ও কাফ এবং বুটজুতা ধারণ করি। আমাদের স্বদেশি বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। বিলাতি সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে, অহর্নিশি গলদঘর্ম হওয়াতেই সভ্যমানব-জীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ বলে মনে হয়, বিলাতি সভ্যতার প্রতি অতিভক্তিপরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরেজি পোশাক যে নয়নের সুখকর নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্যের অভাবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের একান্ত অভাববশতঃ

পুরুষ সাজবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত বলবতী। কাজেই আমরা ইংরেজের অনুকরণে অন্য-সব রং ত্যাগ ক'রে কাপড়ে ছাইপাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি। আমাদের ধারণা, সবচেয়ে সভ্য এবং সবচেয়ে পুরুষালি রং হচ্ছে কালো রং। সুতরাং আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্রবসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। শ্বেতবর্ণ আলোকের রং, সকল বর্ণের সমাবেশে তার উৎপত্তি ; আর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের রং, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। আমরা করজোড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে, 'আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও' এবং আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমতগারির পুরস্কারস্বরূপ হ্যাট-নামক কিম্ভূতকিমাকার এক চিজ শিরোপা লাভ করেছি, তাই আমরা আনন্দে শিরোধার্য করে নিয়েছি। কিন্তু ইংরেজি পোশাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু তা নয়। বেশের পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে সাধারণ লোকের মনের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ করলে মানুষকে হয় ভণ্ড নয় ধার্মিক হতে হয়। সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও সাহেবিয়ানার ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ করলেই বঙ্গসন্তান ইংরেজি এবং হিন্দি এই দুই ভাষার উপর অধিকার লাভ করবার পূর্বেই অত্যাচার করতে শুরু করেন। গলায় 'টাই' বাঁধলেই যে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্নীকৃতবাস হতে হবে, এ কথা আমি মানি নে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও গলবস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। তবে 'টাই' যে মনকে সাহেবিয়ানার অনুকূল করে নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মোহ কাটাতে হলে ইউরোপীয় বসন বয়কট করাই শ্রেয়ঃ। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এশিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে বাঁধা, আমাদের উদ্দেশ্য দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকানো, ওদের চেষ্টা দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রায় লজ্জা নিবারণ করা, ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ করা ; তাই আমরা যেখানে ঢিলে দিই, ওরা সেখানে কষে। ইংরেজরা মধ্যেমধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরেজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গি অনুসরণ করে ; সে ছন্দের ঝোঁক উন্নত-অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে নারীর হৃদয় অবলম্বন করে থাকে, ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ করে। আমাদের মহাসৌভাগ্য এই যে, ভারতরমণী স্বদেশি লজ্জা পরিহার করে বিদেশি সজ্জা গ্রহণ করেন নি।

স্ত্রীজাতি সর্বত্রই স্থিতিশীল, আমরা পুরুষরা গতিশীল বলেই দুর্গতি বিশেষরূপে আমাদেরই হয়েছে। যদি ইংরেজি বেশ উপযোগিতা সৌন্দর্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বদেশি বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হত, তা হলেও বিদেশি বেশ অবলম্বন অনুমোদন করা যেত না। ইংরেজি বেশের আর-একটি বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত করবামাত্রই অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকেও বেশের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অতিশয় নির্বোধের মত তর্ক করেন। এ বিষয়ে যেসকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায়, সেসকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়। যাঁরা বেশ পরিবর্তন করেন তাঁরা তর্কের দ্বারা যুক্তির দ্বারা নিজেরাই সাফাই হতে চান, অপরকে ভজাতে চান না। তাঁদের অভিপ্রায়, ফাঁকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, স্বজাতিকে সভ্য করা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, এ সমাজের এ জাতির কিছু হবার নয়, সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাঁদের মতে একমাত্র মুক্তির উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কতদূর অনুকূল, তা সকলেই বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র সমাজত্যাগে কি করে মুক্তিলাভ হতে পারে? এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর হচ্ছে, এঁরা যে চিরকালই স্বদেশি সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাকবেন এরূপ এঁদের অভিপ্রায় নয়; এঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইংরেজি সমাজে লীন হয়ে যাওয়া। এঁদের আশা ছিল যে, ক্রমে গঙ্গাযমুনার মত সাদায়-কালোয় একদিন মিশে যাবে। কিন্তু আজ বোধ হয় এঁদের সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, সে আশা মিছে। আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করেছি যে, প্রয়াগ পৌঁছবার পূর্বেই আমাদের কাশীপ্রাপ্তি হবে।

৬

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। অপরের বেশ যত সহজে অবলম্বন করা যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। বিদেশীয় সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয়, পেটে তত সয় না। আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে আহার্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করবার কোনোই দরকার নেই। তবে যদি কেহ এমন থাকেন যে, বিদেশি মাছ-তরকারি না খেলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না, তা হলে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কোনো দরকার নেই; আর যদি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত দরকার মনে করেন, তা হলে স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বাস করাটাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়ঃ।

আহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ-সংবলিত পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকাশাস্ত্র বলে গণ্য করে অমান্য করলেই যে তৎপরিবর্তে কেল্‌নারের ক্যাটালগের চর্চা করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিদেশীয়তা প্রধানতঃ আহারের পদ্ধতিতেই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন প'রে স্বদেশি আসনে বসা এবং স্বদেশি বাসনে খাওয়া চলে না।

ঐ পোশাকের টানেই চেয়ার আসে, সেইসঙ্গে টেবিল আসে, এবং সেইসঙ্গে চীনের কিংবা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এর পর আর হাতে খাওয়া চলে না; কারণ হাতে খেলে হাত মুখ দুইই প্রক্ষালন করতে হয়, কিন্তু ছুরিকাঁটা ব্যবহার করলে শুধু আঙুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে। এককথায় বলতে গেলে, খানায় পোশাকে 'অঙ্গ-অঙ্গী'র সম্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে পানের বিষয় নীরব থাকলে অনেকে মনে করতে পারেন যে, প্রবন্ধটি অঙ্গহীন হয়ে রইল; অতএব এ সম্বন্ধেও দু-এক কথা বলা আবশ্যক। পানের বিষয় হচ্ছে— হয় ধূম নাহয় তেজ মরুৎ এবং সলিলের সন্নিপাতে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাই। গাঁজা গুলী এবং চরসের পরিবর্তে ভদ্রসমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তো সে দুঃখের বিষয় নয়। সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ। 'প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এ মনুর বচন। এবং শাস্ত্রমতে যেখানে স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে শ্রুতি মান্য। রসিকতা ছেড়ে দিলেও, সুরাপানের দোষগুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথা নয়। সুরাপান একটি ব্যসন, ফ্যাশন নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, ইংরেজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ দুটি স্বতন্ত্র রিপু। আমার উদ্দেশ্য ইউরোপের মোহ নষ্ট করা, তার বেশি কিছু নয়। মানবজাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র করবার ভার সমাজনীতি এবং ধর্মপ্রচারকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

৭

আমার শেষ বক্তব্য এই, কেহ যেন মনে না করেন যে, কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নিন্দা করবার জন্যই আমি এসকল কথার অবতারণা করেছি। যেসকল ইউরোপীয় হালচাল আমি এ দেশের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয়

মনে করি, সেসকল কম-বেশি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশলাভ করেছে। আমি নিজে উপরোক্ত সকল দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। দৈনিক জীবনে আমরা নকলেই অভ্যস্ত, আচার-ব্যবহারের অধীন। ভুল করেছি— এই জ্ঞান জন্মানো মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পারলে ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।

১৩১২ ফাল্গুন

তরজমা

আমরা ইংরেজ জাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু জাতিকে তার চাইতেও বেশি জানি; আমরা চিনি নে শুধু নিজেদের।

আমরা নিজেদের চেনবার কোনো চেষ্টাও করি নে, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোনো ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জানবার মত কোনো পদার্থ আছে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।

বাঙালির নিজস্ব বলে মনে কিংবা চরিত্রে যদি কোনো পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই; তাই চোখের আড়াল করে রাখতে চাই। আমাদের ধারণা যে, বাঙালি তার বাঙালিত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হলে আমরা রাগ করে ঘরের ভাত (যদি থাকে তো) বেশি করে খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হলেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিস নয়। প্রথমটির অভাব হতেই দ্বিতীয়টি জন্মলাভ করে।

আমরা যে নিজেদের মান্য করি নে তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি— হয় বর্তমান ইউরোপের দিকে এগনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছনো। আমরা নিজের পথ জানি নে বলে আজও মনঃস্থির করে উঠতে পারি নি যে, পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু পা পিছিয়ে আসি, আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিশ করাটাই আমাদের নবসভ্যতার ধর্ম ও কর্ম।

উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবসূচক না হলেও মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে জানি, সে সম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই। আমরা দোটানার ভিতর পড়েছি— এই সত্যটি সহজে স্বীকার করে নিলে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে আসবে। যা আজ উভয়সংকট বলে মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখবার উভয়কূল বলে বুঝতে পারব। আমরা যদি চলতে চাই তো আমাদের একূল-ওকূল দু কূল রক্ষা করেই চলতে হবে।

আমরা স্পষ্ট জানি আর না-জানি, আমরা এই উভয়কূল অবলম্বন করেই চলবার চেষ্টা করছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয় কলিযুগ নয়— শুধু তরজমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও একেলে বিদেশি এবং সেকেলে স্বদেশি সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজির অনুবাদ করে পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য— সকল ক্ষেত্রেই তরজমা করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্তমান যুগটি তরজমার যুগ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে ঐ অনুবাদ-কার্যটি ষোলো আনা ভালোরকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে।

পরের জিনিসকে আপনার করে নেবার নামই তরজমা। সুতরাং ও কার্য করাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা, নিজের ঐশ্বর্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না। স্মৃতির মতে, দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হলে দানক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত ব্যক্তি দাতাও হতে পারে না, গ্রহীতাও হতে পারে না ; কারণ দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম। বুদ্ধদেব যিশুখৃস্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি-কোটি মানব ধর্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল। এবং শিষ্যপরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশি শক্ত কিংবা শিষ্য হওয়া বেশি শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, পুরাকালে গুরুরা কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করবার পূর্বে শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ করবার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা করতেন। উপনিষদ্‌কে গুহ্যশাস্ত্র করে রাখবার উদ্দেশ্যই এই যে, যাদের শিষ্য হবার সামর্থ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিদ্যে ফলাতে না পারে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র

উপায় পূর্বে ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। বর্তমান যুগে আমরা ভক্তি-পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দুয়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি ; কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারী-স্বত্বে কিংবা প্রসাদস্বরূপে লাভ করবার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করি নে, কেবল জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানা-ব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র ; এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন-পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ স্লেট নয়, যার উপর বাহ্যজগৎরূপ পেন্‌সিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায় ; অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনোরূপ অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া ধরে রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে পারি, তারই নাম জ্ঞান। আমরা মনে মনে যা তরজমা করে নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি ; যা পারি নে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তরজমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্র-ভাবে তরজমা-কার্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য সভ্যতার তরজমা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তরজমা না করে শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনোরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতঃই মানুষে যখন কোনো জিনিস রূপান্তরিত ক'রে নিজের জীবনের উপযোগী করে নিতে পারে না, অথচ লোভবশতঃ লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না ; তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চার অভাববশতঃ দিন-দিন সে শক্তি হ্রাস হতে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারিপাশে জড়ো করেও সেটিকে অন্তরঙ্গ করতে পারি নি ; তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝেমাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করি। মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না তাই ভস্মসাৎ করতে চায়। আমরা

মুখে যাই বলি-নে কেন, কাজে পূর্ব-সভ্যতা নয়, পশ্চিম-সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্তমান, অপর পক্ষে আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মামাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হলে বহু সাধনার আবশ্যক। তা ছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হলে অপর-একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্তৃক আবিষ্ট হলে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতালসিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে; কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণতঃ লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে যদি আমরা এই নবসভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তা হলেই সে সভ্যতা নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙালির বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।

তরজমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য হব সে সম্বন্ধে আমার দু-চারটি কথা বলবার আছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসারযাত্রার উপযোগী সকল কার্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম— যার ফল একে নয় দশে লাভ করে, তা— করবার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা-কিছু মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন-পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্যরূপে পরিণত হয়; কথার সূক্ষ্মশরীর কার্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে নিয়ে পরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষ-রূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারি, তা হলেই আমাদের সমাজ নব-

কলেবর ধারণ করবে। এই নবসভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক করতে পারলেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাকবে কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোনো অংশই আমরা জীর্ণ করতে পারব না। আমরা যে, ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তরজমা করতে পারি নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজি ভাব ভাষায় তরজমা করতে পারি নে বলেই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না, বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই; আমাদের নিজস্ব বলে কোনো পদার্থ নেই, আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহংকারে মাটিতে পা দিই নে। অপর পক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোকমুখে এমনি সুন্দর ভাবে তরজমা হয়ে গেছে যে, তা আর তরজমা বলে কেউ বুঝতে পারেন না। এ দেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ গ্রহণ করলে পূর্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহ ত্যাগ করে অপর-একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তা হলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

উপযুক্ত তরজমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাবসকল হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এ দেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্ততঃ এক ফোঁটাও গৈরিক রং না পাওয়া যায়। আর্য-সভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুষুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যদি আবশ্যক হয় তো সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বলতে পারলে অপরের মনের দ্বার আরব্য-উপন্যাসের দস্যুদের ধনভাণ্ডারের দ্বারের মত আপনি খুলে যায়। আমরা, ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা, জনসাধারণের মনের দ্বার খোলবার সংকেত জানি নে, কারণ আমরা তা জানবার চেষ্টাও করি নে। যেসকল কথা আমাদের মুখের উপর আল্‌গা হয়ে রয়েছে কিন্তু মনে

প্রবেশ করে নি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে পড়লেই যে অপরের অন্তরে প্রবেশ লাভ করবে, এ আশা বৃথা।

আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি তরজমা করতে অকৃতকার্য হয়েছি, তার প্রমাণ তো সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দু বেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত সংস্কৃত-'ছায়া'র সাহায্য ব্যতীত বুঝতে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নবসাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত ইংরেজি-ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক, সাহিত্যে 'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা'; কিন্তু আমাদের নবসাহিত্যের বস্তু যে চোরাই-মাল, তা ইংরেজি-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরেজি-সাহিত্যের সোনারুপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখি নি। এই তো গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি-বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার যে আগাগোড়াই নকল, এ বিষয়ে বোধ হয় আর দু-মত নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশি-কিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মনে-মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম এবং দর্শন এই দুটি জিনিস আমাদের একচেটে; এবং অন্য-কোনো বিষয়ে না হোক, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম রিলিজিঅন হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তরজমার বলে ব্যবহারশাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদজ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। ধর্মের অর্থ ধরে রাখা এবং মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দুয়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজিনবিশ আর্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।

গীতা আমাদের হাতে পড়বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে যায়। সেই কারণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তার পর গীতার কর্ম ইংরেজি work রূপ ধারণ ক'রে আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের কর্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে গণ্য হয়েছে। এই ভুল তরজমার প্রসাদেই, যে কর্মের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতি সাধন, পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়, সেই কর্ম আজকাল ইহলোকের অভ্যুদয়ের জন্য ধর্ম বলে গ্রাহ্য হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য

করে থাকে, তা করা কর্তব্য ; এইটুকু শেখাবার জন্য ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না, এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারি নে। ফলে, আমাদের-কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোনো কাজে লাগে না।

একদিকে আমরা এ দেশের প্রাচীন মতগুলিকে যেমন ইংরেজি পোশাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বদলে দিই, তেমনি অপর দিকে ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোকসমাজে বার করি।

নিত্যই দেখতে পাই যে, খাঁটি জর্মান মাল স্বদেশি বলে পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা করছে। হেগেলের দর্শন শংকরের নামে বেনামি করে অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শংকরেরও আবশ্যক আছে ; কিন্তু তাই বলে হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা পরিয়ে শংকর বলে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করে দেওয়াতে কোনো লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে যদি শংকরকে গৃহস্থ করতে পারি, তাতে আমাদের উপকার বেশি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তরজমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ ইভলিউশনের কথাটা ধরা যাক। ইভলিউশনের দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারি নে। আমরা উন্নতিশীল হই আর স্থিতিশীলই হই, আমাদের সকলপ্রকার শীলই ঐ ইভলিউশন আশ্রয় করে রয়েছে। সুতরাং ইভলিউশনের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি, তা হলে আমাদের সকল কার্যই যে আরম্ভে পর্যবসিত হবে সে তো ধরা কথা। বাংলায় আমরা ইভলিউশন 'ক্রমবিকাশবাদ' 'ক্রমোন্নতিবাদ' ইত্যাদি শব্দে তরজমা করে থাকি। ঐরূপ তরজমার ফলে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, মাসিক পত্রের গল্পের মত জগৎ-পদার্থটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য। সৃষ্টির বইখানি আদ্যোপান্ত লেখা হয়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প অল্প করে বেরচ্ছে, এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে তার থেকেই তার রচনাপ্রণালীর ধরন আমরা জানতে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ যত দিন যাবে তত সমস্ত জগতের এবং তার অন্তর্ভূত জীবজগতের এবং তার অন্তর্ভূত মানবসমাজের এবং তার অন্তর্ভূত প্রতি মানবের উন্নতি অনিবার্য। প্রকৃতির ধর্মই হচ্ছে আমাদের উন্নতি সাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জন্য নিজের

কোনো চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ-আকারে ইভলিউশন আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনুকূল মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এই 'ক্রম' শব্দটি আমাদের মনের উপর এমনি আধিপত্য স্থাপন করেছে যে, সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি, কোনো বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করি নে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউশন ক্রমবিকাশও নয় ক্রমোন্নতিও নয়। কোনো পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই, এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউশন জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। ইভলিউশনের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউশন অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার। তাই ইভলিউশনের জ্ঞান মানুষকে অলস হতে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ভুল তরজমা করে ইভলিউশনকে আমাদের চরিত্র-হীনতার সহায় করে এনেছি।

ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমরা তরজমা করতে কৃতকার্য হচ্ছি নে, নয় ভুল তরজমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে আমরা দু পাতা ইংরেজি পড়ে নব্যব্রাহ্মণসম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত সে বিষয়ে লক্ষ্য না করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে থাকতুম তা হলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নবপ্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে যা লাভ করেছি তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশসুদ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের cultureকে nationalize করতে পারি নি বলেই গবর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আইনের দ্বারা বাধ্য করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই। তাই গবর্নমেণ্টকে ভজাবার জন্য দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা শব্দের অর্থ শুধু লিখতে ও পড়তে শেখা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্নমেন্টই স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্নমেন্টকে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে রাজ্যিসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের নব-শিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারব ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্যন্ত ছোটছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারি নি। পড়তে শিখলে এবং পড়বার অবসর থাকলে এবং বই কেনবার সংগতি থাকলে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ-মহাভারতই পড়বে— আমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ-মহাভারতের কথা যে বইয়ে পড়ার চাইতে মুখে শোনা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ, তা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা। সে যাই হোক, আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে না স্থান পেত, তা হলে না-ভেবেচিন্তে লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম, লৌকিক ন্যায় এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরূপ মান্য করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের গুরু-নামক গোরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গোরু তাড়ানো শ্রেয়ঃ। 'ক' অক্ষর যে কোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু 'ক' অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকাও ভালো, কারণ পৃথিবীতে আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার পরিচ্ছদ গৃহ মন্দির, সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধারকার্যটি খুব ভালো; ওর একমাত্র দোষ এই যে, যাঁরা পরকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত তাঁরা নিজেদের উদ্ধার

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যতদিন শুধু ইংরেজির নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙুলের ছাপ ফুটবে না, ততদিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা। আমি জানি যে, আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে-কোনো সংস্করণের আবশ্যক থাক্ না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবশ্যক নেই।

১৩১৯ মাঘ

বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ

বর্তমান যুদ্ধের কার্যকারণ সম্বন্ধে ইউরোপে যদি কোনো বাজে কথা কিংবা অসংগত কথা বলা হয় তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা মানুষে যখন যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মনে যখন রাগ ও দ্বেষই প্রাধান্য লাভ করে তখন তার পক্ষে বাক্যের সংযম কতক পরিমাণে হারানো স্বাভাবিক।

ঘরে ডাকাত পড়লে তার সঙ্গে মিষ্ট এবং শিষ্ট আলাপ করা সম্ভবতঃ দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের পক্ষে নয়; এবং ইউরোপের লোক দেবতা নয়, মানুষ।

কিন্তু এই যুদ্ধ ব্যাপারটি আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার বিশেষ কোনো বাধা নেই। আমরা ও-জালে জড়িয়ে পড়ি নি; এখন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারের যা-কিছু যোগ আছে সে শুধু তারের— নাড়ির নয়।

ইউরোপে সুরাসুর মিলে যে ভবসমুদ্র মন্থন করেছেন তার ফলে অমৃতই উঠুক আর হলাহলই উঠুক, তার ভাগ আমরাও পাব; কিন্তু সে ভবিষ্যতে। সে বস্তু পান করবার পূর্বেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হবার কোনো কারণ নেই। বরং এই অবসরে আমরা যদি ব্যাপারটি ঠিক ভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখি তা হলে এর ভবিষ্যৎ ফলাফলের জন্য আমরা অনেকটা প্রস্তুত থাকব।

এই সমরানলে যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে সে কথা সত্য। কিন্তু 'বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা'র অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দেখতে পাই অনেকের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমনকি, কেউ কেউ এই উপলক্ষ্যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

আমার মতে ইউরোপের প্রতি অবজ্ঞার কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এ অবশ্য রুচির কথা; সুতরাং এ ক্ষেত্রে মতভেদের যথেষ্ট অবসর আছে। মনোভাব প্রকাশ না করলেই যে, সে ভাব মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা অবশ্য নয়। অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা মুখে কি বলি তার চাইতে আমরা মনে কি ভাবি তার মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশি; কেননা সত্যের জ্ঞান না হলে মানুষে সত্য কথা বলতে পারে না।

প্রথমতঃ কি স্বদেশি, কি বিদেশি, কি নবীন, কি প্রাচীন কোনো সভ্যতাকেই এককথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

একটি বিপুল মানবসমাজের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ও-রকম এক-তরফা ডিক্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়। বহু মানবে বহু দিন ধরে কায়মনোবাক্যে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার ভিতর যে মনুষ্যত্ব নেই, এ কথা বলতে শুধু তিনিই অধিকারী যিনি মানুষ নন। অপর পক্ষে 'চরম-সভ্যতা' বলে কোনো পদার্থ মানুষে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে নি এবং কখনও পারবে না। কেননা, পৃথিবী যে দিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে সে দিন মানুষের দেহমনের আর কোনো কার্য থাকবে না, কাজেই মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ করতে বাধ্য হবে। অন্ততঃ পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্যতা আজ পর্যন্ত হয় নি যা একেবারে নির্গুণ কিংবা একেবারে নির্দোষ। কোনো-একটি বিশেষ সভ্যতার বিচার করবার জন্য তার দোষগুণের পরিচয় নেওয়া আবশ্যক, মনকে খাটানো দরকার। যখন আমরা আলস্যে অভিভূত হয়ে হাই তুলি তখনই আমরা তুড়ি দিই, সুতরাং আমরা যখন তুড়ি দিয়ে কোনো জিনিস উড়িয়ে দিতে চাই তখন আমরা মানসিক আলস্য ব্যতীত অন্য কোনো গুণের পরিচয় দিই না। এ সত্য অবশ্য চির-পরিচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই চির-উপেক্ষিত।

২

ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, যে মনোভাবের উপর সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাসমর হচ্ছে তার স্বাভাবিক পরিণতি; কেননা এ যুগে ইউরোপ ধর্মপ্রাণ নয়, কর্মপ্রাণ। সে দেশে আজ আত্মার অপেক্ষা বিষয়ের, মনের অপেক্ষা ধনের মাহাত্ম্য ঢের বেশি। শিল্প-বাণিজ্যের পরিমাণ-অনুসারেই এ যুগে ইউরোপে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ করা হয় এবং সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে, মানবের ভ্রাতৃভাব নয় ভ্রাতৃ-বিরোধই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যুদয়ের একমাত্র উপায়। অতএব এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপের আজ এক শ বৎসরের কর্মফল।

এ অভিযোগের মূলে যে কতকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কতটা, তাই হচ্ছে বিচার্য।

আমরা মানবসভ্যতাকে সচরাচর দুই ভাগে বিভক্ত করি: প্রাচীন ও

নবীন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন-কোনো বর্তমান সভ্যতা নেই যা অনেক অংশে প্রাচীন নয়। যেমন আমাদের বর্তমান সভ্যতা কিংবা অসভ্যতা এক অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর-এক অংশে নব্য ইউরোপীয়, তেমনি ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা আট আনা নতুন হলেও আট আনা পুরনো। সুতরাং এই যুদ্ধের জন্য ইউরোপের নবমনোভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যেতে পারে না, বরং তার পূর্বসংস্কারকেই এর জন্য দোষী করা অসংগত হবে না।

মানুষে-মানুষে কাটাকাটি-মারামারি করা যদি অসভ্যতার লক্ষণ হয় তা হলে বলতে হবে ইউরোপের বর্তমান যুগের অপেক্ষা মধ্যযুগ ঢের বেশি অসভ্য ছিল। সে যুগে যুদ্ধপার্বণ বারো মাসে তেরো বার হত এবং সে কালের মতে ও-কার্যটি নিত্যকর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মধ্যযুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণযুগ বলেন, কিন্তু আসলে সেটি রক্তযুগ। আমরা আমাদের বর্তমান মনোভাববশতঃই যুদ্ধকার্যটি হেয় মনে করি, প্রাচীন মনোভাব থাকলে শ্রেয়ঃ মনে করতুম। ইউরোপের নবযুগ অবশ্য এক হিসাবে যন্ত্রযুগ, কিন্তু তাই বলে মধ্যযুগ যে মন্ত্রযুগ ছিল, তা নয়। যে হিসাবে মধ্যযুগ ধর্মপ্রাণ ছিল সে হিসাবে নবযুগ ধর্মপ্রাণ নয়। সে হিসাবটি যে কি, তা একটু পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্মের মত খৃস্টধর্মেরও ত্রিরত্ন আছে— সে হচ্ছে খৃস্ট ধর্ম ও সঙ্ঘ; এবং খৃস্টিয়ান মাত্রেই নামমাত্র এই তিনের শরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু যুগভেদে এই তিনের মধ্যে এক-একটি রত্ন সর্বাপেক্ষা মহামূল্য হয়ে ওঠে।

প্রথম যুগে (Primitive Christianity) খৃস্টিয়ানের পক্ষে খৃস্টই ছিল শরণ্য। মধ্যযুগে খৃস্টের স্থান খৃস্টসংঘ অধিকার করেন এবং ইউরোপের মনোরাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন; সে সংঘ সে আধিপত্যের ভাগ খৃস্টকেও দেন নি, ধর্মকেও দেন নি। প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে খৃস্টসংঘ মানবের বুদ্ধি ও আত্মাকে সমান অভিভূত করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সাংসারিক হিসাবেও এই সংঘ ইউরোপের রাজরাজেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। এই সংঘ মানুষের তনমনধনের উপর এই অসীম প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ধর্মের নামে কত যে অধর্মযুদ্ধের প্রবর্তন করেছেন তার প্রমাণ মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

এই সংঘের ধর্ম ও খৃস্টধর্ম এক বস্তু নয়। সুতরাং এই সংঘের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করে ইউরোপের যে ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে এ কথা বলা চলে না।

বরং পূর্বের অপেক্ষা বর্তমানে ইউরোপীয়দের যে ধর্মবুদ্ধি (conscience) অধিক জাগ্রত হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ ইউরোপের সকল আইনকানুনে সকল সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙে পড়ে নি; মানবমনের একটির পর আর-একটি তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে; সে তিন হচ্ছে ইতালির রেনেসাঁস্, জর্মানির রিফর্মেশন এবং ফ্রান্সের রেভলিউশন।

গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শে ইতালি যেদিন নবজীবন লাভ করলে সেইদিন ইউরোপে নবসভ্যতার সূত্রপাত হল। এই প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ নিজের শক্তি ও বাহিরের সৌন্দর্য আবিষ্কার করলে। মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখলে। মানুষের পক্ষে তার এই নব-আবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত শক্তির চর্চাই তার প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠল। যে প্রকৃতিকে ইউরোপীয়েরা হাজার বৎসর ধরে বিমাতা মনে করে আসছিল, তাকে তারা সেবাদাসীতে পরিণত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই নবজীবন শিল্পে বিজ্ঞানে কাব্যে ইতিহাসে বিকশিত হয়ে উঠল। এককথায় নবজীবন লাভ করে মানুষের চোখ-কান ফুটল এবং হাত-পায়ের খিল খুলে গেল।

এর পরবর্তী যুগে জর্মানি বাইবেলের আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের আত্মারও আবিষ্কার করলে; মানুষে এই সত্যের পরিচয় পেলে যে, ধর্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্মযাজকের মুখে নয়। খৃস্টের ধর্মের পরিচয় লাভ করে মানুষে খৃস্টসংঘের সংস্কারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। জর্মানির এই নবসংস্কারের গুণে ইউরোপের মানবশক্তি আবার অন্তর্মুখী হল। মানুষ আত্মদর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল।

এই রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে মানুষের কর্মবুদ্ধি এবং এই রিফর্মেশনের ফলে তার ধর্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে; কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

তার পর ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় মানব মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে জীবনেও স্বাধীনতা লাভ করলে। সুতরাং ইউরোপের নবযুগের সভ্যতায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে, হারাল না। যে মনোভাবের উপর এ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তা শান্তির পক্ষে অনুকূল বই

প্রতিকূল নয়। সামাজিক স্বাধীনতা যে সামাজিক মৈত্রীর প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রমাণ এই যুদ্ধেই পাওয়া যায়। আজ দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপের এক-একটি জাতি যেন এক-একটি ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছে; মধ্যযুগে এরূপ একজাতীয়তার ভাব মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল।

৩

আমি পূর্বে বলেছি যে, কোনো যুগের কোনো সভ্যতা একেবারে নির্দোষ কিংবা একেবারে নিগুর্ণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের সপক্ষে যে কিছু বলবার নেই, তা নয়। অন্ধকারেরও একটা অটল সৌন্দর্য আছে এবং তার অন্তরেও গুপ্তশক্তি নিহিত থাকে। যে ফুল দিনে ফোটে, রাত্রে তার জন্ম হয়— এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং নবযুগে যেসকল মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার অনেকগুলির বীজ মধ্যযুগে বপন করা হয়েছিল। কিন্তু নবযুগের আলোক না পেলে সেসকল বীজ বড়জোর অঙ্কুরিত হত, তার বেশি নয়।

ইউরোপের নবসভ্যতার আলোক সূর্যের আলো নয় যে, তা কেউ নেবাতে পারে না। এ আলো প্রদীপের আলো, আকাশ থেকে পড়ে নি, মানুষে নিজহাতে রচনা করেছে; সুতরাং ইউরোপের নিশাচররা এ আলো নেবাবার বহু চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের সঙ্গে পদে-পদে লড়াই করে নবযুগকে অগ্রসর হতে হয়েছে। রিফর্‌মেশনকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় দেড় শ বছর অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফরাসি-বিপ্লব আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, তা ইউরোপ-ময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। 'স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রী'র মন্ত্রে দীক্ষিত নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। স্বাধীনতার অবতার পরের স্বাধীনতা অপহরণ করা, মৈত্রীর অবতার পরের শত্রুতা করা এবং সাম্যের অবতার যে ইউরোপের একেশ্বর হওয়া তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন, এ কথা মনে করলে মানবসভ্যতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আজ এক শ বছর পরে নেপোলিয়নের এই বিরাট দস্যুতার বিচার করে দেখতে পাই যে, তার সুফল হয়েছে এই যে, ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর তার কুফল হয়েছে এই যে, সেই সঙ্গে নেপোলিয়নের মিলিটারিজ্‌ম্‌ও সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের প্রবল সংঘর্ষে যে অমৃত ও হলাহল উত্থিত

হয়েছে, ইউরোপের সকল জাতির দেহ ও মনে তার অল্পবিস্তর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান সমস্যাই এই যে, কি উপায়ে সভ্যসমাজের দেহ এই বিষমুক্ত করা যেতে পারে।

৪

এ সমস্যা অতি গুরুতর সমস্যা। কেননা, এক পক্ষে যেমন ইউরোপের সভ্যজাতিদের মনে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি কমে এসেছে, অপর পক্ষে তাদের জীবনে পরস্পর যুদ্ধ করবার নূতন কারণেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে ইউরোপের মুখে শান্তিবচন এবং হাতে অস্ত্র।

সকলেই জানেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল। শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার অর্থ হচ্ছে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করা; আর যুদ্ধের দ্বারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করার অর্থ হচ্ছে পরের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করা। এ দুটি মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগেই দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে অবজ্ঞা করে এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে ভয় করে। যে জাতির অধিকাংশ লোক শিল্পবাণিজ্যে ব্যাপৃত, সে জাতির যুদ্ধে প্রবৃত্তি না থাকাই স্বাভাবিক।

তার পর, শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে যুদ্ধের ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাপার আর নেই। যুদ্ধ যে মানুষের সকল কাজকর্ম সকল বেচাকেনা একদিনেই বন্ধ করে দেয়, তার প্রমাণ তো আজ হাতে-হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, যুদ্ধ জিনিসটি ইউরোপীয়দের স্বার্থের বিরোধী। আর-এক কথা, হার্বার্ট স্পেন্‌সর প্রমুখ দার্শনিকেরা আশা করেছিলেন যে, বর্তমান ইউরোপের বৈশ্যসভ্যতা পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপন করবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, বাণিজ্যের যোগসূত্র পৃথিবীর সকল জাতির সখ্যসূত্রে পরিণত হবে। এই অন্নবস্ত্রের অবাধ আদানপ্রদানের ফলে প্রতি জাতির কাছেই বসুধা কুটুম্ব হয়ে উঠবে। এই কারণে এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে ক্ষত্রিয়যুগের অপেক্ষা বৈশ্যযুগের সভ্যতা মানব-ইতিহাসের উন্নত স্তরের সভ্যতা। হার্বার্ট স্পেন্‌সরের এই আশা যে কবিকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজ দেখা যাচ্ছে যে, আগে যেমন রাজ্য নিয়ে রাজায়-রাজায় লড়াই করত, আজ তেমনি বাণিজ্য নিয়ে জাতিতে-জাতিতে লড়াই করছে

এবং এ লড়াই অতি ভীষণ এবং অতি নিষ্ঠুর। কারণ আগে মানুষ হাতে যুদ্ধ করত, এখন কলে যুদ্ধ করে। এই কারণেই বর্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার, কেননা বাহুবলের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু যন্ত্রবলের ভিতর নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, বৈশ্যসভ্যতা যুদ্ধের অনুকূল নয়, কেননা যুদ্ধ বৈশ্যধর্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

৫

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনো কারণে যুদ্ধ করাটা অকর্তব্য মনে করে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো বৈধ কারণ নেই। ইউরোপের নবযুগের নবসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্ছে এই দুটি দেশ। ইংরেজ ও ফরাসি উভয়েই ক্ষত্রিয়যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বৈশ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এঁদের দেহে রণসজ্জা থাকলেও মনে খাঁটি মিলিটারিজ্‌ম্‌ নেই। অপর পক্ষে জর্মানি হচ্ছে যুদ্ধপ্রাণ; মিলিটারিজ্‌ম্‌ জর্মানির যুগপৎ ধর্ম ও কর্ম। বর্তমান জর্মানির এরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী জর্মানির পূর্ব-ইতিহাস।

প্রায় আট শত বৎসর ধরে ইউরোপে জর্মানজাতির কোনোরূপ প্রভুত্ব ছিল না, তার কারণ জর্মানরা এই দীর্ঘকালের ভিতর একটি জর্মান-রাজ্য কিংবা একটি জর্মানজাতি গড়ে তুলতে পারে নি। যে কালে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বরাজ্য লাভ করেছিল, সে কালে জর্মানি শত শত পরস্পরবিরোধী খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ কতকটা জর্মানির কপালের দোষে, কতকটা তার বুদ্ধির দোষে। জর্মানি সমগ্র ইউরোপের সম্রাট্‌ হবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করত ব'লে স্বদেশেও একরাট্‌ হতে পারে নি।

কোনো কোনো বৌদ্ধদেশে দুটি করে রাজা থাকেন; একজন প্রকৃতি-পুঞ্জের আত্মার প্রভু, আর-এক জন দেহের। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে সমগ্র ইউরোপীয় মানবকে এইরূপ দুই ছত্রের অধীন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পোপ ইউরোপের ধর্মরাজের পদ এবং জর্মানরাজ দেবরাজের পদ অধিকার করে বসেছিলেন। ইউরোপ একটি মহাদেশ এবং ইউরোপীয়েরা নানা বিভিন্ন জাতীয়, সুতরাং ঐহিক কিংবা পারত্রিক কোনো বিষয়ে একজাতি হওয়া যে তাদের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা পোপও স্বীকার করেন নি, জর্মান-সম্রাট্‌ও স্বীকার করেন নি। জর্মানজাতি যে ইউরোপের অন্যান্য জাতি হতে মনে ও চরিত্রে পৃথক্‌,

এ সত্য উপেক্ষা করবার ফলে জর্মানি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। স্বদেশ এবং স্বজাতির উপর কোনোরূপ একাধিপত্য না থাকলেও জর্মান-সম্রাট্ তাঁর সম্রাট্-পদবী এবং সাম্রাজ্যের আশা ত্যাগ করতে পারলেন না, এবং স্বজাতিকে নিয়ে একটি স্বরাজ্য গঠন করবার চেষ্টামাত্রও করলেন না। এই কারণে জর্মানজাতির পূর্বে কোনোরূপ রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। অথচ জর্মানজাতির ভিতর কি দেহের কি বুদ্ধির কি চরিত্রের কোনোরূপ বলের যে অভাব ছিল না—জর্মান কাব্যে দর্শনে শিল্পে সংগীতে ধর্মে ও কর্মে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে জর্মানির মহাপুরুষেরা লৌকিকরাজ্যের আশা ত্যাগ করে চিন্তারাজ্য অধিকার করাই নিজেদের কর্তব্য বলে মেনে নিলেন। সম্ভবতঃ জর্মানজাতির ইতিহাস অদ্যাবধি ঐ একই পথ অনুসরণ করে চলত, যদি নেপোলিয়ন জর্মানজাতিকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে পদদলিত না করতেন। ১৮০৬ খৃস্টাব্দে জেনার যুদ্ধে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবার পর জর্মান মাত্রেরই এ জ্ঞান জন্মাল যে, জর্মানির খণ্ডরাজ্য-সকলকে একত্র করে একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত না করতে পারলে জর্মানজাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অসংখ্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক অধ্যাপক প্রভৃতি চিরজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করেও এ ব্রত উদ্যাপন করতে পারেন নি; কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিস্মার্ক দুটি যুদ্ধের সাহায্যে জর্মানজাতির প্রাণের আশা ফলে পরিণত করেছিলেন। বিস্মার্ক অস্ট্রিয়াকে পরাভূত করে উত্তর-জর্মানির এবং ফ্রান্সকে পরাভূত করে দক্ষিণ-জর্মানির যোগসাধন করেন। বিস্মার্ক বলতেন যে, রক্ত ও লৌহের রসান দিয়ে তিনি ভাঙা জর্মানিকে জোড়া দিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের দ্বারাই তার রক্ষা এবং যুদ্ধের দ্বারাই তার উন্নতি সাধন করতে হবে— এই হচ্ছে নবজর্মানির দৃঢ়ধারণা।

যুদ্ধকার্য অপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষার্থ যে তা করা কর্তব্য এ বিষয়ে ইংরেজ ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপের অগ্রগণ্য জাতির মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। জর্মানদের সঙ্গে আর-সকলের প্রভেদ এইখানে যে, জর্মানির কর্তৃপক্ষদের মতে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে তরবারি।

জর্মানির যোদ্ধাদলের মুখপাত্র জেনারেল বেয়ারনহার্ডি অতি স্পষ্টাক্ষরে

দুনিয়ার লোককে জর্মান রাষ্ট্রনীতির মূলকথা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কথা এই—

জর্মানজাতি গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তার থেকেই প্রমাণ হয় যে, কি বাহুবলে, কি বুদ্ধিবলে সে জাতির সমকক্ষ দ্বিতীয় জাতি পৃথিবীতে নেই। জর্মানির শ্রীবৃদ্ধি তার বাণিজ্যবিস্তারের উপর নির্ভর করে। যদিচ ভবের হাটে কেনাবেচার জন্য জর্মানজাতিই হচ্ছে জ্যেষ্ঠ অধিকারী তবুও এ ক্ষেত্রে সকলের শেষে উপস্থিত হওয়ার দরুন সে আজ সর্বকনিষ্ঠ, কেননা পৃথিবীর সকল হাটবাজার আজ অপরের সম্পত্তি। পরের হাটে কেনাবেচা করার অর্থ পর-ভাগ্যোপজীবী হওয়া; সুতরাং এ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জর্মানি অপরের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য। যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে জর্মানির পক্ষে তার জাতীয় স্বার্থসাধন করা অসম্ভব। অতএব মিলিটারিজ্‌ম্‌ হচ্ছে নবজর্মানির একমাত্র ধর্ম।

জেনারেল বেয়ারনহার্ডি যে স্পষ্টবাদী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দস্যুতাকে ধর্ম বলে প্রচার করতে লোকে সহজেই কুণ্ঠিত হয়। ও-রূপ মনোভাব প্রকাশ করতে হলে অপর দেশের লোকে অনেক বড় বড় নীতির কথায় তাকে চাপা দেয়।

কিন্তু জর্মান-রাজমন্ত্রী কিংবা জর্মান-রাজসেনাপতির পক্ষে এ বিষয়ে কোনোরূপ কপটতা করবার প্রয়োজন নেই। জর্মানির রাজ-গুরুপুরোহিতেরা যে নবশাস্ত্র রচনা করেছেন, জর্মানির রাজ-পুরুষদের রাজনীতি সেই শাস্ত্রসংগত।

জর্মান বৈজ্ঞানিকদের মতে ডারউইনের আবিষ্কৃত ইভলিউশনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে— জোর যার মুলুক তার। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে মানুষে শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবনটা যখন একটা মারামারি-কাটাকাটি ব্যাপার, তখন যে মারতে প্রস্তুত নয় তাকে মরতে প্রস্তুত হতে হবে— এই হচ্ছে বিধির নিয়ম। ইভলিউশনের এই ব্যাখ্যা, নীট্‌শে-নামক একটি প্রতিভা-শালী লেখক সমগ্র জর্মানজাতিকে গ্রাহ্য করিয়েছেন। নীট্‌শের মতে দয়া মমতা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনোভাব মানসিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা এসকল মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে মানুষের প্রকৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে; এবং দুর্বলতাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র পাপ এবং সবলতাই একমাত্র পুণ্য; শক্তিই হচ্ছে একাধারে সত্য শিব ও সুন্দর। ইউরোপীয় মানব যে এই সহজ সত্য ভুলে গেছল তার কারণ ইউরোপ খৃস্টধর্ম-নামক রোগে জর্জরিত।

খৃস্টধর্ম যে এশিয়ায় জন্মলাভ করেছে তার কারণ, এশিয়াবাসীরা দাসের জাতি, সুতরাং তাদের সকল ধর্মকর্ম দাসমনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এশিয়ার ক্যান্সার ইউরোপের দেহ হতে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইউরোপের নবযুগের সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি মনোভাব ঐ প্রাচীন রোগের নূতন উপসর্গ মাত্র। সুতরাং ফরাসি ইংরেজ প্রভৃতি যেসকল জাতির দেহে এইসকল রোগের লক্ষণ দেখা যায়, তাদের উচ্ছেদ করা জর্মান ক্ষত্রিয়দের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নীট্‌শের এই মত জর্মানজাতির মনে যে বসে গেছে, তার কারণ নীট্‌শে কালি-কলমে লেখেন নি, তার প্রতি অক্ষর বাটালি দিয়ে খোদা।

জর্মান-পণ্ডিতদের মত, কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়, লোকহিতের জন্যও, জর্মানির পক্ষে দিগ্বিজয় করা আবশ্যক। জেনারেল বেয়ারনহার্ডি বলেন—

জর্মান লেবার এবং জর্মান আইডিয়লিজ্‌মের প্রচার ব্যতীত মানবজাতির উদ্ধার হবে না। সুতরাং যেমন তরবারির সাহায্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে জর্মান মাল গ্রাহ্য করাতে হবে, তেমনি ঐ একই উপায়ে জর্মান-তত্ত্বকথাও গ্রাহ্য করাতে হবে। এই হচ্ছে জর্মানির বিধিনির্দিষ্ট কর্ম।

এ স্থলে জর্মান-আইডিয়লিজ্‌মের অর্থ কাণ্ট প্রভৃতির দর্শন নয়; কেননা, বেয়ারনহার্ডি কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বেয়ারনহার্ডির মতে এইসকল বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিষয়বুদ্ধিহীন দার্শনিকদের অমার্জনীয় অপরাধ এই যে, তারা বিশ্বমানবের কাছে শান্তির বারতা ঘোষণা করেছিলেন। জর্মানি আজ তাই তার নব-আইডিয়লিজ্‌ম্ প্রচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আধ্যাত্মিক জগতের নব্যপন্থীদের সার কথা এই যে, বৈশ্যসভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। বৈশ্যযুগে মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে। মানুষ বিষয়প্রাণ হলে তার মনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে আত্মার অপেক্ষা দেহকে প্রাধান্য দেয় তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, মানবজীবনকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তোলাই এ সভ্যতার লক্ষ্য। ভয় না থাকলে ভক্তি থাকে না, অথচ বর্তমান সভ্যতা জনসাধারণকে রাজভয় দস্যুভয় ও মৃত্যুভয় এই ত্রিবিধ ভয় থেকে মুক্ত করেছে। অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা অবশ্য জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু অর্থকেই জীবনের সার পদার্থ করে তুললে মানুষ অন্তঃসারশূন্য হয়ে

পড়ে। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার জন্য সামাজিক জীবন আবার বিপদসংকুল করে তোলা দরকার। এ যুগে এক যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। অতএব ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্বার ক্ষত্রিয় শাসনাধীন করা আবশ্যক ; কেননা, বৈশ্যবুদ্ধি যুদ্ধের প্রতিকূল। এবং ইউরোপের রাজনীতি ক্ষাত্রধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা একমাত্র জর্মানির আছে ; কেননা জর্মানির বৈশ্যশূদ্রের আজও কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই। সুতরাং অর্থরাজ্যের উচ্ছেদ করে পৃথিবীতে ধর্মরাজ্যের সংস্থাপন করবার ভার জর্মানির হাতে পড়েছে। এই কারণে যুদ্ধ করা জর্মানির পক্ষে সর্বপ্রথম কর্তব্য। জর্মানির নব-মিলিটারিজ্‌মের প্ররোচনাই এই যুদ্ধের সাক্ষাৎকারণ।

এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মিলিটারিজ্‌ম্ ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ মাত্র। জর্মানির পরশ্রীকাতরতাই এর যথার্থ মূল, এবং এ মূল জর্মানির প্রাচীন ইতিহাস থেকে রস সঞ্চয় করেছে। জর্মানির বর্তমান উচ্চ আশার ভাষা নতুন হলেও তার ভাব পুরাতন। মধ্যযুগে জর্মানি একবার ইউরোপের সার্বভৌম চক্রবর্তীত্ব-পদ লাভ করবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছিল ; আশা করি এবারেও হবে। জর্মানজাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে, কিন্তু বিস্‌মার্কের হাতে-গড়া জর্মান-সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই ; সুতরাং জর্মানির দিগ্বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র। এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ইউরোপের বর্তমান সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে না ; কারণ মিলিটারিজ্‌ম্ সে সভ্যতার গৃহশত্রু।

ইউরোপের সকল জাতির দেহেই এই মিলিটারিজ্‌ম্ অল্পবিস্তর স্থান লাভ করেছে ; একমাত্র জর্মানি তা পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকার করেছে। যা অপর সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জর্মানিতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে বরফের এই কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে মিলিটারিজ্‌ম্ ভস্মসাৎ হয় তা হলে যে কেবল অপরজাতি-সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জর্মানিও পরিবর্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে। যে জাতি মানবাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে দেশে কাণ্ট হেগেল গ্যেটে শিলার বীঠোভেন মোজার্ট জন্মলাভ করেছে, সে জাতির কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা চিরঋণী। এই মিলিটারিজ্‌মের মোহমুক্ত হলে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।

মিলিটারিজ্‌ম্‌ হেয় বলে বর্তমান বৈশ্যসভ্যতাই যে শ্রেয়ঃ এ কথা আমি বলতে পারি নে। কোনো সভ্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়, বৈশ্যসভ্যতাও নয়। তবে কোনো বর্তমান সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে হলে তার অতীতের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা চাই, তার ভবিষ্যতের প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। বর্তমান যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলমাত্র এ কথা ভোলা উচিত নয়। বর্তমানের যেসকল দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তার নিরাকরণ হবার আশা আছে কি না, এ সভ্যতা স্বীয় শক্তিতে স্বীয় রোগমুক্ত হতে পারবে কি না, এই হচ্ছে আসল জিজ্ঞাস্য। আমার বিশ্বাস, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সে শক্তি আছে। সে যাই হোক, বৈশ্যসভ্যতার রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ— জর্মানির অস্ত্রচিকিৎসা নয়।

১৩২১ অগ্রহায়ণ

নূতন ও পুরাতন

আমাদের সমাজে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টন্‌টনে হয়ে উঠেছে, এরূপ ধারণা আমার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই এক-পথের পথিক, এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেউ-বা পুরাতনের কাছ থেকে বেশি সরে এসেছি, কেউ-বা কম। আমাদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে মত নিয়ে। মনোজগতে আমরা নানা পন্থী। আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যে সব সময়ে মিল থাকে, তাও নয়।

এমনকি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে যাদের সামাজিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাদের মধ্যেও সামাজিক মতামতে সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকে, অন্ততঃ মুখে। সুতরাং নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়।

এ বাদানুবাদ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তাই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই পরস্পরবিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করে দিতে উদ্যত হয়েছেন[১]। তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন, যেটি অবলম্বন করলে নূতন ও পুরাতন হাত-ধরাধরি করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে— যে পথে দাঁড়ালে নূতন ও পুরাতন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং উভয়ে মনের মিলে সুখে থাকবে; সে পথের পরিচয় নেওয়াটা অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক। যারা এ-পথও জানে, ও-পথও জানে কিন্তু দুঃখের বিষয় মরে আছে, তারা হয়তো একটা নিষ্কণ্টক মধ্যপথ পেলে বেঁচে উঠবে।

২

ঘটকালি করতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলাই হচ্ছে মামুলি দস্তুর। সুতরাং নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বিপিনবাবুও নানা কথার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার অনেক ছোটখাট কথা সত্য, আর কতক বড় বড় কথা নতুন। তবে তাঁর কথার ভিতর যা সত্য তা নতুন নয়, আর যা নতুন তা সত্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

---

১ 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১। "নূতনে পুরাতনে"

বিপিনবাবু প্রথমে আমাদের সমাজে নূতন ও পুরাতনের বিরোধের কারণ নির্ণয় করে পরে তার সমন্বয়ের উপায়-নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে আমরা—

> ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া· ·ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম।

এই ছোটাটাই হচ্ছে নূতন, এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এইখানেই সূত্রপাত। আবার আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। অতএব এখন মিলনের কাল উপস্থিত হয়েছে। গত-শতাব্দীতে দেশসুদ্ধ লোকের মন যে এক-লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং এ শতাব্দীতে সে মন যে আবার উলটো লাফে দেশে ফিরে এসেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের মনের দিক থেকে দেখতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে যে বিশেষ কোনো প্রভেদ আছে তা নয়, যদি থাকে তো সে উনিশ-বিশ। আজ-কালকার দিনে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ঢের বেশি লোকের মনে ঢের বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে। বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বহু ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে গেছে যে, সে ভাব দেশি কি বিদেশি তাও আমরা ঠাওর করতে পারি নে। উদাহরণ স্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষজাতীয় মনোভাব, যার ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশি, তাকে আমরা বলি স্বদেশি।

ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের দিকটা দেখে অবশ্য জনকতক সেদিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাঁদের ঘরে ফিরে না আসাতে দেশের কোনো ক্ষতি নেই, বরং তাঁদের ফেরাতে বিপদ আছে। বিপিনবাবু বলেন—

> একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম, আজ বাড়ি খাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছি। সত্য কথাটা তাহা নয়।

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের মধ্যে যারা ইউরোপের সভ্যতার বাহ্যচাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বেড়া ভেঙে ছুটেছিল তারাই আবার বাড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। পাঁচনই তাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করেছে। কেননা, ও-জাতির অন্ধতা সারাবার শাস্ত্রসংগত বিধান এই— 'নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্ত্বা' দেগে দেওয়া।

বিপিনবাবু বলেন—

কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিপিনবাবুর মতে এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে যে মোটেই বিরল নয়, সে কথা নারায়ণ পত্রে[২] ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতে—

য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎপরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি।

ডাক্তার শীল বলেন—

[এরূপ বিচার] স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট, [অতএব] সত্যভ্রষ্ট।

আমাদের পক্ষে এরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে যে সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা, ইউরোপের জনসাধারণের জাতীয় অহংকার জাতীয় অভ্যুদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের জাতীয় অহংকার জাতীয় হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইউরোপের অহংকার তার কৃতিত্বের সহায়, আমাদের অহংকার আমাদের অকর্মণ্যতার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নূতন ও পুরাতনের বিরোধের যে সমন্বয় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা। যাঁরা মদ ছেড়ে আফিং ধরেন তাঁরা যদি কোনো-কিছুর সমন্বয় করতে পারেন তো সে হচ্ছে এই দুই নেশার। মদ আর আফিং এই দুটি জুড়িতে চালাতে পারে সমাজে এমন লোকের অভাব নেই।

আসল কথা, নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে ন-শ নিরানব্বই জন কস্মিন্‌কালে প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে বসনে ব্যসনে ও ফ্যাশনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে আসছেন; কেননা, এসকল নিয়ম লঙ্ঘন করবার দরুন তাঁদের কোনোরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না। পুরাতন সমাজধর্মের অবিরোধে নূতন-

২ অগ্রহায়ণ ১৩২১। "হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব"

কামের সেবা করাতে সমাজ কোনোরূপ বাধা দেয় না, কাজেই শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেওয়াটাই তাঁদের জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা দায়ে পড়ে সমাজের যেসকল পুরনো নিয়ম মেনে চলেন, অপরের গায়ে পড়ে তারই নতুন ব্যাখ্যা দেন। এঁরা নূতন-পুরাতনে বিরোধভঞ্জন করেন নি; যদি কোনো-কিছুর সমন্বয় করে থাকেন তো সে হচ্ছে সামাজিক সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত আরামের সমন্বয়।

পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশ জনে করেছেন, যাঁরা সমাজের মরচে-ধরা চরকায় কোনোরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন— সে তেল দেশিই হোক, আর বিদেশিই হোক। এর প্রমাণ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এর প্রথম তিন জন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি খাঁটি দেশি এবং সংস্কৃত। অথচ এঁরা সকলেই সমাজদ্রোহী বলে গণ্য।

সমাজসংস্কার, অর্থাৎ পুরাতনকে নূতন করে তোলবার চেষ্টাতেই এ দেশে নূতন-পুরাতনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপিনবাবুর মুখের কথায় যদি এই বিরোধের সমন্বয় হয়ে যায়, তা হলে আমরা সকলেই আশীর্বাদ করব যে, তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

৩

দুটি পরস্পরবিরোধী পক্ষের মধ্যস্থতা করতে হলে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, অথচ একপক্ষ-না-একপক্ষের প্রতি টান থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপিনবাবুও এই সহজ মানবধর্ম অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর নানান উলটাপালটা কথার ভিতর থেকে তাঁর নূতনের বিরুদ্ধে নূতন ঝাঁজ ও পুরাতনের প্রতি নূতন ঝোঁক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি কথার উল্লেখ করছি।

সকলেই জানেন যে, পুরাতন সংস্কারের নাম শুনতে পারে না; কারণ সুপ্তকে জাগ্রত করবার জন্য নূতনকে পুরাতনের গায়ে হাত দিতে হয়— তাও আবার মোলায়েমভাবে নয়, কড়াভাবে। বিপিনবাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজ অটল করতে চায় তাদের পক্ষে।

বিপিনবাবু বলেন—

> দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই।

দুনিয়াটা যে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা জানি নে, তার কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও-কাজ করেন নি। তবে তিনি যে পালমহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সৃষ্টি করেছেন, এমনও তো মনে হয় না। কারণ, দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্ট হোক, বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয় নি। সৃষ্টির পূর্বের খবর আমরাও জানি নে, বিপিনবাবুও জানেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। ম্লেচ্ছ ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দুদর্শনের ভাষায় তার নাম 'ইদং'। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নারায়ণ পত্রে সেই ইদংএর নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়েছেন—

> ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্তাও বলা যায়— সেই মানুষ অহং পদবাচ্য।

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার জ্ঞাতা ও কর্তা। শুধু তাই নয়, মানুষ ইদংএর কর্তা বলেই তার জ্ঞাতা। মনোবিজ্ঞানের মূল সত্য এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যদি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারবার না থাকত তা হলে তার কোনো-রূপ জ্ঞান আমাদের মনে জন্মাত না। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার মূলসম্পর্ক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। আমাদের ক্রিয়ার বিষয় না হলে দুনিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও হত না, অর্থাৎ তার কোনো অস্তিত্ব থাকত না। এবং সে ক্রিয়াফল হচ্ছে ইদংএর 'পরিচালন ও পরিবর্তন', আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সংস্কার। সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব না জানলেও মানুষে এ কথা জানে যে, তার জীবনের নিত্য কাজ হচ্ছে সৃষ্টপদার্থের সংস্কার করা। মানুষ যখন লাঙলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অপর কোনো কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়, অহং। সুতরাং সংস্কারকদের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করে বিপিনবাবু দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু বক্রতার।

শাস্ত্রে বলে যে, ক্রিয়াফল চার প্রকার— উৎপত্তি প্রাপ্তি বিকার ও

সংস্কার। কি ধর্ম কি সমাজ কি রাজ্য, যার সংস্কারে হাত দেন তারই বিকার ঘটান, এমন লোকের অভাব যে বাংলায় নেই, সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একই উপাদান নিয়ে কেউ গড়েন শিব, কেউ-বা বাঁদর। এ অবশ্য মহা আক্ষেপের বিষয় ; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, দেশসুদ্ধ লোকের মাটির সুমুখে হাতজোড় করে বসে থাকতে হবে।

৪

বিপিনবাবুর মতে নূতনে-পুরাতনে মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নূতন ; কারণ নূতনই হচ্ছে মূল বিবাদী। সুতরাং নূতনকে বাগ মানাতে হলে তাকে কিঞ্চিৎ আক্কেল দেওয়া দরকার।

নূতন তার গোঁ ছাড়তে চায় না, কেননা সে চায় উন্নতি। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, জাগতিক নিয়মানুসারে উন্নতির পথ সিধে নয়, প্যাঁচালো। উন্নতি যে পদে-পদে অবনতিসাপেক্ষ তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। বিপিনবাবু এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির বক্ষ্যমাণ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

> তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা সরলরেখার ন্যায় উর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না। ·· কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটীর গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই, উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যকগতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে, ইহাকে স্পাইর‍্যাল মোষণ spiral motion বলে। সমাজবিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইর‍্যাল, একান্ত সরল নহে। ·· আপনার গতি-বেগের অবিছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ উর্দ্ধমুখী তির্য্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।

বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতিতত্ত্ব যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য।

বিপিনবাবু বলেন যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সত্যজ্ঞান নয়, ভ্রম। এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু রজ্জুতে লতাজ্ঞান যে সত্যজ্ঞান, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ কি। রজ্জু জড়পদার্থ, এবং সতেজ ব্রততী সজীব পদার্থ। দড়ি

বেচারার আপনার 'গতিবেগ' বলে কোনোরূপ গুণ কি দোষ নেই। ও বস্তুকে ইচ্ছে করলে নীচে থেকে জড়িয়ে উপরে তুলতে পার, উপর থেকে জড়িয়ে নীচে নামাতে পার, লম্বা করে ফেলতে পার, তাল-পাকিয়ে রাখতে পার। রজ্জু উন্নতি অবনতি তির্যকগতি কি সরলগতি— কোনোরূপ গতির ধার ধারে না। বিপিনবাবু এ ক্ষেত্রে রজ্জুর যে ব্যবহার করেছেন তা জ্ঞানের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার পর বিপিনবাবু এ সত্যই-বা কোন্ বিজ্ঞান থেকে উদ্ধার করলেন যে, মানুষের মন ও মানবসমাজ উদ্ভিদ্‌জাতীয়? সাইকলজি এবং সোশিয়লজি যে বটানির অন্তর্ভূত, এ কথা তো কোনো কেতাবে-কোরানে লেখে না। তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব মেনে নিলেও সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয় না। মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মানুষের মন ও মানবসমাজ উদ্ভিদ্ হলেও ঐ দুই পদার্থ যে লতাজাতীয়, এবং বৃক্ষজাতীয় নয়, তারই-বা প্রমাণ কোথায়। গাছের মত সোজাভাবে সরলরেখায় মাথাঝাড়া দিয়ে ওঠা যে মানবধর্ম নয়, কোন্ যুক্তি কোন্ প্রমাণের বলে বিপিনবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা আমাদের জানানো উচিত ছিল; কেননা পালমহাশয়ের আপ্তবাক্ আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই। উক্তি যে যুক্তি নয়, এ জ্ঞান বিপিনবাবুর থাকা উচিত। উত্তরে হয়তো তিনি বলবেন যে, ঊর্ধ্বগতিমাত্রেই তির্যকগতি— এই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঊর্ধ্বগতিমাত্রকেই যে স্ক্রুর আকার ধারণ করতে হবে, জড়জগতের এমন-কোনো বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না জানি নে। যদি থাকে তো মানুষের মতিগতি যে সেই একই নিয়মের অধীন এ কথা তিনিই বলতে পারেন, যিনি জীবে জড় ভ্রম করেন।

> আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তর যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধমুখী তির্য্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।

বিপিনবাবুর এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল তা তাঁর প্রদর্শিত উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়। 'তালগাছ যে সরলরেখার ন্যায় ঊর্ধ্বদিকে উঠে'— তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যে নিজের জোরে ওঠে সে সিধেভাবেই ওঠে; আর যে পরকে আশ্রয় করে ওঠে সেই পেঁচিয়ে ওঠে, যথা, তরুর আশ্রিত লতা।

দশ ছত্র রচনার ভিতর ডাইনামিক্‌স্ বটানি সোশিয়লজি সাইকলজি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের নানা সূত্রের এহেন জড়াপট্‌কি বাধানো যে সম্ভব, এ জ্ঞান

আমার ছিল না। সম্ভবতঃ পালমহাশয় যে 'নূতন দৃষ্টি' নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, স্বর্গের সিঁড়ি গোল সিঁড়ি। যদি তাই হয়, তা হলে এ কথাও মানতে হবে যে, পাতালের সিঁড়িও গোল; কারণ ওঠা-নামার জাগতিক নিয়ম অবশ্যই এক। সুতরাং ঘুরপাক খাওয়ার অর্থ ওঠাও হতে পারে, নামাও হতে পারে। এ অবস্থায় উন্নতিশীলের দল যদি কুটিল পথে না চলে সরল পথে চলতে চান, তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

৫

বিপিনবাবু যে তাঁর প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে নানারূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্য একত্র করতে কুণ্ঠিত হন নি তার কারণ তিনি ইউরোপীয় দর্শন হতে এমন-এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের থিসিস্ অ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্‌থেসিস্ এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে তার আর আশ্চর্য কি। হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, 'ভাব' (being) এবং 'অভাব' (non-being) এই দুটি পরস্পরবিরোধী— এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে 'স্বভাব' (becoming)। মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা এ জগৎ চৈতন্যের লীলা। অর্থাৎ তাঁর লজিক এবং ভগবানের লজিক যে একই বস্তু, সে বিষয়ে হেগেলের মনে কোনোরূপ দ্বিধা ছিল না। তার কারণ হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভগবানের শুধু অবতার নন— স্বয়ং ভগবান। হেগেলের এই ঘরের খবর তাঁর সপ্রতিভ শিষ্য কবি হেনরি হাইনের Henri Heine গুরুমারাবিদ্যের গুণে ফাঁশ হয়ে গেছে। বিপিনবাবুরও বোধ হয় বিশ্বাস যে, হেগেলের কথা হচ্ছে দর্শনের শেষকথা। সে যাই হোক, হেগেলের এই পশ্চিম-মীমাংসার বলে বিপিনবাবু নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় করতে চান। তিনি অবশ্য শুধু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, তার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

৬

হেগেলের মত একে নতুন তার উপর বিদেশি; সুতরাং পাছে তা গ্রাহ্য করতে আমরা ইতস্ততঃ করি এই আশঙ্কায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হেগেলও যা, বেদান্তও তাই, সাংখ্যও তাই।

সমন্বয় অর্থে বিপিনবাবু কি বোঝেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে—

> সমন্বয় মাত্রেই যে-বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দাবী-দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া, একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়।

অর্থাৎ থিসিস্‌কে কিছু ছাড়তে এবং অ্যান্টিথিসিস্‌কে কিছু ছাড়তে হবে, তবে সিন্‌থেসিস্ ডিক্রি পাবে। তাঁর দর্শনের এ ব্যাখ্যা শুনে সম্ভবতঃ হেগেলের চক্ষুস্থির হয়ে যেত; কেননা তাঁর সিন্‌থেসিস্ কোনোরূপ রফাছাড়ের ফল নয়। তাতে থিসিস্ এবং অ্যান্টিথিসিস্ দুটিই পুরামাত্রায় বিদ্যমান; কেবল দুয়ে মিলিত হয়ে একটি নূতন মূর্তি ধারণ করে। সিন্‌থেসিসের বিশ্লেষণ করেই থিসিস্ এবং অ্যান্টিথিসিস্ পাওয়া যায়। এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।

তার পর মীমাংসা অর্থে যদি রফাছাড়ের নিষ্পত্তি হয় তা হলে বলতেই হবে যে, বিপিনবাবুর মীমাংসার সঙ্গে ব্যাস জৈমিনির মীমাংসার কোনোই সম্পর্ক নেই। বেদান্তের মীমাংসা আর যাই হোক, আপস-মীমাংসা নয়। বেদান্তদর্শন নিজের দাবির এক পয়সাও ছাড়ে নি, কোনো বিরোধী মতের দাবির এক পয়সাও মানে নি। উত্তর-মীমাংসাতে অবশ্য সমন্বয়ের কথা আছে, কিন্তু সে সমন্বয়ের অর্থ যে কি, তা শংকর অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র, অনুমান বা যুক্তি গাঁথিবার নহে। ইহাতে নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য-সকল আহৃত হইয়া মীমাংসিত হইবে।

এবং শংকরের মতে মীমাংসার অর্থ 'অবিরোধী তর্কের সহিত বেদান্ত বাক্য-সমূহের বিচার'। এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ পরস্পরবিরোধী নয়। হেগেলের পশ্চিম-মীমাংসার সহিত ব্যাসের উত্তর-মীমাংসার কোনো মিল নেই; না মতে, না পদ্ধতিতে। ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্ম, হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় অপরব্রহ্ম। নিরুক্তের মতে ভাববিকার ছয় প্রকার, যথা: সৃষ্টি স্থিতি হ্রাস বৃদ্ধি বিপর্যয় ও লয়। শংকর হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়কে গণনার মধ্যে আনেন নি, কেননা তাঁর মতে এ তিনটি হচ্ছে স্থিতিকালের ভাববিকার। অপর পক্ষে এই তিনটি ভাবই হচ্ছে হেগেলের অবলম্বন, কেননা তাঁর অ্যাব্‌সলিউট্ হচ্ছে ইটর্নল্ বিকামিং।

সুতরাং হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম— অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান্ হয়েছিলেন। শংকর যে জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, সে জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া নয়; অপর পক্ষে হেগেলের জ্ঞান ক্রিয়ারই যুগপৎ কর্তা ও কর্ম।

বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় যুক্তি নয়; অপর পক্ষে হেগেলের মতে যুক্তির উপরেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। থিসিস্ এবং অ্যান্টিথিসিসের সুতোয় সুতোয় গেরো দিয়েই এক-একটি ব্রহ্মমুহূর্ত পাওয়া যায়। বেদান্তের ব্রহ্ম স্থির-বর্তমান, হেগেলের ব্রহ্ম চির-বর্ধমান— অর্থাৎ একটি স্ট্যাটিক্ অপরটি ডাইনামিক্। আসল কথা এই যে, বেদান্ত যদি থিসিস্ হয়, তা হলে হেগেল তার অ্যান্টিথিসিস্— এ দুই মতের অভেদ জ্ঞান শুধু অজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব।

৭

বিপিনবাবুর হাতে পড়ে শুধু বাদরায়ণ নয়, কপিলও হেগেলে লীন হয়ে গেছেন।

বিপিনবাবু আবিষ্কার করেছেন যে, যার নাম থিসিস্ অ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্‌থেসিস্, তারই নাম তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব। কেননা তাঁর মতে থিসিসের বাংলা হচ্ছে স্থিতি, অ্যান্টিথিসিসের বাংলা বিরোধ, এবং সিন্‌থেসিসের বাংলা সমন্বয়। এ অনুবাদ অবশ্য গায়ের জোরে করা। কেননা, থিসিস্ যদি স্থিতি হয় তা হলে অ্যান্টিথিসিস্ অ-স্থিতি (গতি) এবং সিন্‌থেসিস্ সংস্থিতি। সে যাই হোক, সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গে অবশ্য হেগেলের ত্রিসূত্রের কোনো মিল নেই; কেননা সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়, সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব রজঃ তমের মিলন নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ; অপর পক্ষে হেগেলের মতে থিসিস্ এবং অ্যান্টিথিসিসের মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিপিনবাবুর ন্যায় পূর্ব পশ্চিম সকল দর্শনের সমন্বয়কারের কাছে অবশ্য এ-সকল পার্থক্য তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব সর্বথা উপেক্ষণীয়।

তমঃ ও রজের মিলনে যে বস্তু জন্মলাভ করে, তা হেগেলের সিন্‌থেসিস্ হতে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের সত্ত্ব নয়। এ কথা দুটি-একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে

মানুষের মন ও মানবসমাজের উন্নতির পদ্ধতি। বিপিনবাবুর উদ্‌ভাবিত কপিল-হেগেল-দর্শন-অনুসারে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

তামসিক মন = সুপ্ত রাজসিক মন = জাগ্রত
সাত্ত্বিক মন = ঝিমন্ত
তামসিক সমাজ = মৃত রাজসিক সমাজ = জীবিত
সাত্ত্বিক সমাজ = জীবন্মৃত

অর্থাৎ সমন্বয়ের ফলে রজোগুণের উন্নতি নয়, অবনতি হয়। সত্ত্বগুণ যে তমোগুণ এবং রজোগুণের মাঝামাঝি একটি পদার্থ, এ কথা সাংখ্যাচার্যেরা অবগত নন, কেননা তাঁরা হেগেল পড়েন নি। উক্ত দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অতিরিক্ত, অন্তর্ভূত নয়। সাত্ত্বিক ভাব যে বিরোধের ভাব নয়, তার কারণ রজোগুণ যখন তমোগুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়, তখনই তা সত্ত্বগুণে পরিণত হয়। হেগেলের মত অবশ্য সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকে উলটে ফেললে যা হয়, তারই নাম হেগেল-দর্শন। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অনুলোমক্রমে স্থূল হয়, হেগেল-মতে ঐ একই পদ্ধতিতে স্থূল সূক্ষ্ম হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি হেগেলের পুরুষ। সাংখ্যের মতে সৃষ্টিতে প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হন, হেগেলের মতে পুরুষ সাকার হন।

বিপিনবাবু দেশি-বিলাতি-দর্শনের সমন্বয় করে যে মীমাংসা করেছেন সে হচ্ছে অপূর্ব মীমাংসা; কেননা, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ইতিপূর্বে এরূপ অদ্ভুত মীমাংসা আর কেউ করেন নি।

নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ের এই যদি নমুনা হয় তা হলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই সমন্বয়কারকে বলবে— 'ছেড়ে দে বাবা, লড়ে বাঁচি'।

বিপিনবাবু যাকে সমন্বয় বলেন, বাংলা ভাষায় তার নাম খিচুড়ি।

সমাজদেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়িভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন, যিনি তার প্রসাদ পাবেন তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আসল কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের মোটা কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করা নয়, তার কাছ থেকে পলায়ন করা। দর্শন কি বিজ্ঞান যে আজ পর্যন্ত এমন-কোনো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন নি যার সাহায্যে কোনো বিশেষ বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করা যায়, তার কারণ সকল বিশেষ বস্তুর বিশেষত্ব বাদ দিয়েই সর্বসাধারণে গিয়ে

পৌঁছন যায়। বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন। সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেওয়াই দার্শনিকদের চিরকেলে অভ্যাস। এ উপায়ে সম্ভবতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ হয় না। সমাজের উন্নতি দেশকালপাত্র-সাপেক্ষ, সুতরাং দেশকালের অতীত কিংবা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোনো সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা। ফিজিক্স কিংবা মেটাফিজিক্সএর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়, এবং এ দুই তত্ত্ব যে পৃথক্ জাতীয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত উর্ধ্বগতির দৃষ্টান্ত থেকেই দেখানো যেতে পারে। এমন-কোনো জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম; সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। তা ছাড়া মানবের উন্নতি যে ক্রমোন্নতি হতে বাধ্য, এমন-কোনো নিয়মের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। বরং ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বিপর্যয়ের ফলেই মানব অনেক সময়ে মহা উন্নতি লাভ করেছে। যেসব মহাপুরুষকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করি, যথা বুদ্ধদেব যিশুখৃস্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি এঁরা মানুষের মনকে বিপর্যস্ত করেই মানবসমাজকে উন্নত করেছেন; এঁরা স্পাইরাল্ মোশন্এর ধার ধারতেন না, কিংবা স্থিতি ও গতির মধ্যে দূতীগিরি করে তাদের মিলন ঘটানো নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেন নি।

মানুষের মনকে যদি গেরোবাজের মত আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত, এবং মানবসমাজকে যদি লোটনের মত মাটিতে লুটতে লুটতে এগোতে হত, তা হলে এ দুয়ের বেশিক্ষণ সে কাজ করতে হত না, দু দণ্ডেই তাদের ঘাড় লটকে পড়ত। সুতরাং কি মন কি সমাজ, কোনোটিকেই পাক-চক্রের ভিতর ফেলবার আবশ্যকতা নেই। বিপিনবাবুর বক্তব্য যদি এই হয় যে, পৃথিবীতে অবাধগতি বলে কোনো জিনিস নেই, তা হলে আমরা বলি— এ সত্য শিশুতেও জানে যে পদে-পদে বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হয়। তাই বলে স্থিতি-গতির সমন্বয় করে চলার অর্থ যে শুধু হামাগুড়ি দেওয়া, এ কথা শিশুতেও মানে না। অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির পথে যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এ তো সর্বলোকবিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বিরুদ্ধে গতি নামক 'বিরোধটি জাগিয়ে' রাখা মূর্খতা এবং সেটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি

করেই জীবন স্ফূর্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি। কোনো নূতনের বরের ঘরের পিসি ও পুরাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দুই পক্ষের ভিতর যে চিরশান্তি স্থাপিত হবে, এ আশা দুরাশা মাত্র।

আমি পূর্বে বলেছি যে, নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়। আমার বিশ্বাস যদি অন্যরূপ হত, তা হলে আমি বিপিনবাবুর কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমতঃ আমি সমাজসংস্কার-ব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোন্‌টি বিগ্রহের এবং কোন্‌টি সন্ধির যুগ তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ, বিপিনবাবুর উদ্‌ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন-পুরাতনের জমাখরচ করলে সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শুধু শূন্য। সুতরাং কি নূতন, কি পুরাতন, কোনো পক্ষই ও উপায়ে কোনো সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টামাত্রও করবেন না। তৃতীয়তঃ, ডাক্তার শীলের মতে—

> সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই।

যে সমাজ হাজার বৎসর এক স্থানে এক ভাবে বসে আছে তার আসন টলাবার শক্তি আমাদের মত সাহিত্যিকের শরীরে নেই। বিপিনবাবুর মতামত কর্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডের বস্তু বলেই এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁর বর্ণিত সমন্বয়ের কোনো সার্থকতা সমাজে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে নেই। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে দুধের সঙ্গে জলের সমন্বয়-প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে জলোদুধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারি নে। কারণ ও বস্তু অন্তরাত্মার পক্ষে মুখরোচকও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। অথচ সরস্বতীর মন্দিরে কিঞ্চিৎ দুধ আর কিঞ্চিৎ মদের সমন্বয় যে জ্ঞানামৃত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যের এই পাঞ্চ্ পান করে আমাদের সমাজের

আজ মাথা ঘুরছে। এই ঘুরুনির চোটে অনেকে চোখে এত ঝাপসা দেখেন যে, কোন্ বস্তু নূতন আর কোন্ বস্তু পুরাতন, কোন্‌টি স্বদেশি আর কোন্‌টি বিদেশি— তাও তাঁরা চিনতে পারেন না। এ অবস্থায় বাঙালির প্রথম দরকার সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়, মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত তাই বিশ্লেষণ ক'রে পরিষ্কার করা।

১৩২১ পৌষ

রায়তের কথা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় সুহৃদ্বরেষু, দেশের লোককে পলিটিকাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি ?

বই পড়ানো যে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে? তাও অবশ্য নয়। কেননা ওসব জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার বি. এ. - এম. এ. পাশ করবার জন্যে, এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্ততঃ চাষাভুষোর পক্ষে তো নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে তাদের কাছে rights of manএর ব্যাখ্যান করার অর্থ, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে। তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সেসব বুঝবে না, নয় উলটো বুঝবে; আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্তব্য ?— উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায়, এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিকাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্ছে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য, আর অসাধারণ জন অর্থাৎ ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দশাপন্ন, সে জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাংলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক, সে দেশের অবস্থাই-বা কি আর দেশবাসীদেরই-বা

অবস্থা কি। অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। তোমরা সকলে লাট-দরবারে ঢুকতে চাচ্ছ শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্যে, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক-সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে, জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তাঁর ছেলেদের ডেকে বলেন যে, তাঁর খেতে ধনরত্ন পোঁতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তাঁর ছেলেরা সেই খেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলটপালট করলে; কিন্তু পোঁতা ধনের কোথাও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে ঐরকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র; ওর বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাংলাদেশ যে সোনার খনি নয়, তা বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দু দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তা হলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানবজমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এ দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আগামী ইলেক্‌শনের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে বাংলার কৃষকের, ওরফে বাঙালি জাতির, অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্র জাতির দুরবস্থা দূর করা যে কত কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই, এ কথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে, কেননা সে চেষ্টার ফল ভালো না হয়ে যায় না।

কৃষকের অবস্থা

ইলেক্‌শনের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিশিয়ানদেরই তৈরি করতে হবে, কেননা দেশ-উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, সেই মর্মে প্রোগ্রাম তৈরি করা অবশ্য আমাদের পলিটিশিয়ানদের পক্ষেই কর্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরি করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই, তুমি যখন আধ-আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে—

জমিদারের ঐশ্বর্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে, কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন।

বঙ্কিমের যুগে পলিটিশিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল, ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাংলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি ওকালতি ও ডাক্তারির উপর। ডাক্তারি-কেরানিগিরির সঙ্গে জমিজমার কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিলসম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিপদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বেঙ্গল টেন্যান্সি জানা এক কথা, আর বেঙ্গল টেন্যান্ট্রি জানা আর-এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর-একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস, বেশির ভাগ শহুরে উকিল মহোদয়েরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন। আর যাঁরা জানেন তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন, কিন্তু বিনে পয়সায় তার কথার কথক নন। বাংলার উকিল-রাজ হচ্ছেন জমিদারের মিত্র-রাজ। এ আঁতাৎ কর্দিয়াল -এর ভিতর যথেষ্ট অর্থ আছে। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত, তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল ; এঁরা গাছেরও পাড়েন, তলারও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধদৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়,

তার পর আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজা-মুড়ো দুইই। পলিটিশিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবি করতে প্রস্তুত নন— আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয়, তা হলে তার জন্য প্রধানতঃ পলিটিশিয়ানরাই দায়ী। মডারেট এক্সট্রিমিস্ট কোনো দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি, এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনোরূপ অভিপ্রায় আছে, তার কোনো আভাসও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে, মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে, নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের কো-অপারেশনের উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে তাঁদের অন্য প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। 'জোর যার ভোট তার' —এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে এক্সট্রিমিস্ট দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনোই ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাংলাদেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন, যে দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ যে দেশে

লোকে গাই বলদে চষে,
দাঁতে হীরে ঘষে,
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে।

এ সংকল্প যে অতি সাধু সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহ আছে তার সিদ্ধির উপায় নিয়ে। স্বদেশকে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরনের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা ছেলেভুলোনো ছড়া ভালো করে বাঁধতে ও কাটতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্তব্য, ও-জিনিস গদ্যে খাপ খায় না। আর পলিটিক্সের তুল্য ঝুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে হয় তাঁদের কোনো মত

নেই আর নাহয় তো সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। সম্ভবতঃ তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রাম প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করছেন এই ভয়ে যে, পাছে অপরে তা চুরি করে। সাহিত্যে ও পলিটিক্সে চোরাই-মালের কারবার যে-রকম বেড়ে গেছে, তাতে এ ভয় অকারণ নয়। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে-রকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয়সংকটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন, এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই-না ব্যুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে, আমাদের ন্যাশনালিস্টরা আপাততঃ বিদেশি বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে, স্বদেশি ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুরসত নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজারাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন রাজা-উজির মারতে বসে, তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

রায়তের প্রোগ্রাম

দেশের পলিটিশিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন, তখন যা-হোক-একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরি করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন—

যার কর্ম তার সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে।

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালি সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকারচর্চা নয়, এর ভালো ভালো নজির আছে। বাঙালির মধ্যে যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুরু বলে মান্য করি, তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। তাঁদের শিষ্যত্বই হচ্ছে এ বিষয়ে কথা কইবার আমার দ্বিতীয় দলিল।

তুমি আমি যখন বালক সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রজার অবস্থা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রায়তকে যে অবস্থায় আমরা রেখেছি, তার ফল ত্রিবিধ— দারিদ্র্য মূর্খতা দাসত্ব। তিনি আরও বলেন যে—

ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ, আজকের দিনেও বাংলার রায়তের দল দরিদ্র মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ, সে বিষয়ে তো আর কোনো মতভেদ নেই। তার পর তারা আইনতঃ না হলেও বস্তুতঃ যে দাস, ক্রীতদাস না হলেও যে গর্ভদাস, এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরেজের আইন তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। টেন্যান্সি অ্যাক্ট আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসল-ক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকিখাজানার নালিশ; আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও তো করো তার নামে বাকি-পড়া ও খাসদখলের নালিশ।

তবে যে প্রজা টিকে আছে তার কারণ, বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফবাবুরা জমিদারের দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক সুমারেরই হোক, পারতপক্ষে প্রামাণিক বলে গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ, এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি সব সময় সুবিচার করেন তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচেবর্তে থাকে সে মুনসেফবাবু ও সেটেলমেণ্ট আপিসের গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজকর্মচারীরাই হচ্ছেন বাংলার রায়তের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী রাজনীতিব্যবসায়ী উকিল-মোক্তারেরা নন। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ, তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ব্যারিস্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন বেঙ্গল ল্যাণ্ড্‌ হোলডার্স্‌দের তরফ থেকে গবর্নমেণ্টকে যে পত্র লিখেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

Bengal, if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community— seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent of the peasantry out of the seventy-seven

per cent of the whole population is so poor, that the income *per capita* is not more than a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal.—*Statesman*, 5th March, 1920.

অস্থ বাংলা—

বাংলা, যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়, বাংলা সম্ভবতঃ বাকি ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র, এবং তারা নিত্য পেট ভরে না খেয়েই শুতে যায়।

চক্রবর্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাংলাদেশে শতকরা সত্তর জন লোক বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক— এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায়, তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। তবে এ কথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা তাঁর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, চক্রবর্তী সাহেবের কখনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষতঃ তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহাম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে দাঁড়িয়েছি।

প্রজার দুর্দশা সম্বন্ধে আর-একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন, সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবতঃ সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীর-গতিক কি রকম, তার পরিচয় সরকারের তরফ থেকে বর্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এ স্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable.—*Statesman*, 6th March, 1920.

অসুস্থ বাংলা—

মোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাংলাদেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার জনের মৃত্যু হয়েছে, এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, যেসব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে তার অধিকাংশই নিবার্য।

এই তো গেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ জীবন্মৃত। আর বলা বাহুল্য যে, এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজাসাধারণকে।। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে কথা উল্লেখ·করবার কি আর কোনো দরকার আছে? যারা বারোমাস একসন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে শুতে যায়, তারা যে রোগশয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য কি।

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে, যার বলে বাংলার রায়ত মূর্খতা দারিদ্র্য দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাংলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিশিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সংগত হয়, তা হলে তা আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রোগ্রামের পরিচয়

কিছুদিন আগে ইংলিশম্যান কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে, বেহারের রায়তেরা মজঃফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে—

প্রথম। দেশময় কম্‌পালসরি প্রাইমারি এডুকেশন্ প্রচলিত হওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চার মাইল অন্তর একটি ক'রে দাতব্য ঔষধালয় থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্বত্র আইনতঃ হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্তব্য; অর্থাৎ, উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে; অর্থাৎ, প্রজা সে গাছের স্বত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ি তৈরি করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না; অর্থাৎ, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রই আইনতঃ মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজাপক্ষের প্রথম দুটি দাবি যে ন্যায্য, সে বিষয়ে কোনোরূপ মতভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিশিয়ানরা তো সমান চীৎকার করছেন। এবং গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না ব'লে আমরাও সরকার কর্তব্যের অবহেলা করেছেন ব'লে তাঁর প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তার পর, প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গবর্নমেণ্টের কর্তব্য, সে কথা গবর্নমেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে, আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—

the provision of schools and dispensaries within reasonable distance—these are the things that make all the difference to his life,

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদারপক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর পূর্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে, বাংলার ভবিষ্যৎ গবর্নমেণ্টকে এই দুই কর্তব্য সর্বাগ্রে পালন করতে হবে—

1. Sanitation—involving, as it must, ways and means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similar scourges.

অস্যার্থ—

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করতে হবে, অর্থাৎ, ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the light of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ—

নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাংলার ঘাড়ে পড়বে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

বলা বাহুল্য যে, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে যা দু-কথায় বলা হয়েছে, জমিদারপক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু

একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিসপেনসারি, আর জমিদারপক্ষ চান দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন। অবশ্য এ দুইই আমাদের চাই। তবে সর্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে; যদি আমরা হাত-হাত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি, তা হলে স্যানিটেশনের দৌলতে দেশকে যেদিন স্বর্গ করে তুলব, সেদিন হয়তো দেখব যে, দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিসপেনসারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ তার উন্নতিসাধন করে। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপর আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার বিষয় একজন জর্মান লেখকের বই সেদিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিস্টার উক্ত জর্মান ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন, তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি—

আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না-করা বড়লোকের মরজির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যাহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নিই। যে শিলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে, এবং উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ-দুয়ের ভিতর কোনো তফাত নেই, দুইই এক-জাতীয় ঘটনা।[১]

আমি জিজ্ঞেস করি যে, আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাত আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস'মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সবচেয়ে সর্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে, তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। নিজের দাসত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়াই মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তির পথ যে জ্ঞানমার্গ, এ সত্য বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে, আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আবহাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে

১ *Le Debacle Russe*, Hugo Ganz.

আসলে মনের স্যানিটেশন বই আর কিছুই নয়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

His mind has been made up for him by his landlord or his banker or his priest or his relatives or the nearest official.

অর্থাৎ—

রায়তের মন, হয় তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়স্বজন, আর নাহয় তো হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তোলেন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে একটা জিনিস জন্মাবে।

দেখা গেল যে, রায়তদের শিক্ষার দাবি ও স্বাস্থ্যের দাবি সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের স্বত্বের দাবির কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন—এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যাঁরা সমর্থন করতে উদ্যত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারও মতে সে বলশেভিক, কারও মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে-বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের মারামারি-কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তা হলেই দেখতে পাবেন যে, এসকল অপবাদ কতদূর অমূলক।

প্রথমতঃ, বলশেভিক জন্তুটি যে কি, তা তাঁরাও জানেন না আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপরকে দেখানোও যেমন অনুচিত, নিজে পাওয়াও তেমনি ছেলেমি।

দ্বিতীয়তঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে স্টেটের। সমস্ত বাংলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয় খাজানা কমবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়তঃ, নতুন অধিকারের দাবি যে-কেউ করে, তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাংলার জমিদার-

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কুসংস্কার আমার নেই, এবং থাকতে পারে না। আমার মন স্বতঃই এঁদের প্রতি অনুকূল, কেননা আমার আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার— কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ, অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন, সে আক্রমণ করতে আমি অপারগ, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়। ভালোমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে ; কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার, আর যাই হোক, মহাজন নয়। আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস যে, প্রজার স্বত্বের দাবি মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়তো দুদিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকি ক'টি দাবি যদি গ্রাহ্য হয় তো আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবিগুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরযোগ্য কিংবা নয়, এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্ছে যে, যে জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে, সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে ; আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই, সে স্থলে তার দান-বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জান?— ও-জোত সমগ্র বাংলায় নিত্যনিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন, সে শুধু দাখিল-খারিজের একটা মোটা রকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথাও-বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও-বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, যাঁর যে রকম প্রবৃত্তি ও শক্তি তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সেই অনুসারে দুইয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তর জন বারোমাস একদিনও পেটভরে খেতে পায় না,

তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিল-খারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারি সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। জোতখরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ সুমার-নবিশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে, আশা করি, বলশেভিজ্‌মের পরিচয় দেওয়া হয় না।

আমার এ কথা শুনে হঠাৎ-প্রজাহিতৈষীর দল কি জবাব দেবেন তা জানি। তাঁরা বলবেন যে, প্রজার ভালোর জন্যই তাকে জোত হস্তান্তর করবার অধিকারে বঞ্চিত করা কর্তব্য। নচেৎ বাংলার জমি দেনার দায়ে মহাজনের হাতে চলে যাবে, ও বাংলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে। এ আপত্তির বিচার বারান্তরে করব। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জোত যখন দু বেলা কেনা-বেচা হচ্ছে, তখন জমিদারের জরিমানার দায় থেকে প্রজাকে অব্যাহতি দেওয়া কর্তব্য। কৃষকের জোত অ-কৃষকে কিনতে পারবে কি না, এ সমস্যার সঙ্গে জমিদারের লাভালাভের কোনোই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে রাষ্ট্রের সঙ্গে।

তার পর, নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা শস্য কাটবার অধিকার আছে, তার নিজের পোঁতা গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে। উকিলবাবুরা আমাদের ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্ট পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে, বাংলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও তো প্রপার্টি সম্বন্ধে অনেক পুঁথিগত বিদ্যে ভুলতে হবে। কায়ক্লেশে বেঁচে থাকবার জন্যেও প্রজার আমকাঁঠালের তক্তার প্রয়োজন আছে— শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুঁটির জন্যে ; আর যদি বল যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই, তা হলেও তাদের কাঠের দরকার আছে— ম'লে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে

অধিকার আছে, তার গর্ভে অনন্তশয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন-কিছু অপরাধ নয়, যার জন্যে তাকে দণ্ড দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের কথাটা স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম ?

তার পর আসে কুয়ো খোঁড়বার, কোঠাবাড়ি তৈরি করবার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্ছে একটা বেজায় রহস্য। আইনের বলে যাতে জোতের উন্নতি হয়, তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে, সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক ও দেদার নজির আছে। বেঞ্চ এবং বার্ -এর এইসব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা লূতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ি তৈরি করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হতে হবে, এর চাইতে আর অদ্ভুত ব্যবস্থা কি হতে পারে ? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে-বোনা আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাংলার প্রজা অতঃপর আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবি এই যে, তার জোত মৌরসী ও মোকররি হবে। অর্থাৎ অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে রেকর্ড অব রাইট্স্ প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য করে দেয়, সেই জমাই আইনতঃ চিরস্থায়ী হওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ, যতদিন স্টেটের সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবি অপূর্বও নয় অদ্ভুতও নয়। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লামেণ্টারি কমিশনের সুমুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবি উপস্থিত করেছিলেন। বাংলা-দেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য, তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তার পর আমার মতের সপক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা আবার উদ্‌ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গবর্নমেণ্টকে লিখেছেন—

It would be iniquitous to think of taxing a population so poor

as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation.

অস্থ বাংলা—

এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর ট্যাক্স বসানোর চিন্তাও পাপকার্য হবে, এবং আমার কমিটি এ স্থলে আবার নূতন কোনো ট্যাক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোরগলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে।

উপরোক্ত কথা ক'টির মধ্যে ট্যাক্স কথাটি বদলে তার জায়গায় খাজানা বসিয়ে দিলে আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। ট্যাক্স অবশ্য স্টেট আদায় করে আর খাজানা জমিদার, অর্থাৎ, প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে টাকা জাতীয় কার্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপকার্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি এর উত্তরে পলিটিশিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্তমান স্টেট তো জাতীয় নয়, ও হচ্ছে বিদেশি গবর্নমেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে স্টেটের স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তথাস্তু। কিন্তু নূতন ট্যাক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্তী সাহেব প্রমুখ জমিদারবর্গের জোরগলায় ঘোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে— রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন ট্যাক্সের চাপ আর তিলমাত্রও সইতে না পারে, তা হলে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে আমি বুঝতে পারি নে ব'লে যে পলিটিশিয়ানরা বুঝতে পারেন না তা অবশ্য হতেই পারে না। সুতরাং জমিদার কর্তৃক হতদরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কিসব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিস্ট ওরফে স্বদেশি ও স্বরাজি যুক্তি আছে, শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিশিয়ানদের পেট্রিয়টিক জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভালো চান, তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবি ক'টি প্রসন্নমনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্তব্য। প্রথমতঃ, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে; দ্বিতীয়তঃ, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক

শিক্ষার বলে তাদের 'দাস'বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও উন্নতি ঘটানো।

পূর্বে যে রাশিয়ান ব্যারিস্টারের উক্তি উদ্‌ধৃত করে দিয়েছি, তিনিই তাঁর জর্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন, সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। সে কথা এই—

আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?—স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে, স্বত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এ দেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।

বাংলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠাবাড়ি করবার, কুয়ো খোঁড়বার অধিকার পায়, এবং সেইসঙ্গে তার জোত মৌরসী-মোকররি হয়, তা হলে সে ইংরেজিতে যাকে বলে peasant proprietor তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান রাশিয়া। যাঁরা বলশেভিজ্‌মের ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাংলার রায়তকে বাংলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এসব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই তো কাল তারা তা নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক সুখের পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ সবাই আজ রাতারাতি বড়মানুষ হতে চায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রজার এক নম্বর ও দু নম্বর দাবি আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই তার কারণ, আমরা জানি কাজে তা পূরণ করতে হবে না; কেননা তা করা এত কঠিন যে, একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশজোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার, সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে, তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয়বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি

করা চলে না, আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতুবি থাকবে। কতদিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ রাজি হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের যেসব অকিঞ্চিৎকর ও লোক-দেখানো বন্দোবস্ত করা হবে, তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনোই সুসার হবে না— মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবিগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবামাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে দিতে পারি। টেন্যান্সি অ্যাক্টের গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য উদ্ধার হয়ে যায়। প্রথমতঃ এতে কোনো খরচা নেই, দ্বিতীয়তঃ ব্যুরোক্রাসি এতে বাদ সাধবে না।

তবে বর্তমান টেন্যান্সি অ্যাক্টের উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব যে, ও-কার্য করাও যা আর ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই তো, আজকাল ধর্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম, সে-কালে ধর্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে, প্রজার দাবি অনুযায়ী টেন্যান্সি অ্যাক্টের বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জান?— চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে, এর বেশি কিছুই নয়।

আমার এ কথা যে সত্য, তা যিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মবৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয়-স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে জিনিস ইংরেজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা মান্ধাতার আমলের বলে মেনে নিই। অতএব এ স্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়ে বসলেন, এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে আসলে একটি emergency legislation, যেমন গতকল্যের ঘী অ্যাক্ট এবং আগামীকল্যের রেণ্ট অ্যাক্ট ; এ রকম আইন অবশ্য মেয়াদিই (temporary) হয়ে থাকে ; কিন্তু জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ, আর কতকটা ইংরেজের বুদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল, তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাংলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল, তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

সুজা খাঁ নবাবসুত সর্‌ফরাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥··
কটকে হইল আলিবর্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥··
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥

এই তো গেল মোগলের ব্যবহার। তার পর শোন মারহাট্টার কীর্তি—

স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥··
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥

নবাব বর্গির ভয়ে কোঠে পালিয়ে রইলেন বটে, কিন্তু বেচারা বাঙালির উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বই কমল না। আবার ভারতচন্দ্রের কথা শোন—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি ॥· ·
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥· ·
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ ॥
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়, খাঁটি ইতিহাস। আলিবর্দি খাঁ যে প্রজা-পীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌথ দেবার জন্য। একদিকে দিল্লির বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তাঁর নবাবি থাকে না, কাজেই বাংলার প্রজাকে সর্বস্বান্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্মচারী, যে সরকারের তরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলত। এবং এইসব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা অংশ উদ্‌ধৃত করে দিতে এই কারণে বাধ্য হলুম যে, অন্নদামঙ্গল আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে মেঘনাদবধ। বাংলার চেয়ে লঙ্কা একালে আমাদের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

১৭৫৬ খৃস্টাব্দে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাংলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরতেই বাংলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব, যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈত্রিক প্রাণ, দুইই হারালেন। একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানির সেকালের কর্তাব্যক্তিরা

সকলেই এ ব্যাপারকে রেভলিউশন বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানি বাহাদুর বাংলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ-পরগনার জমিদারিস্বত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলমালে কেটে গেল। ফলে বাংলার অরাজকতা দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলল।

তার পর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবির মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাংলার প্রজার রক্তশোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি। রাজা টোডরমলের সময় বাংলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে ল্যাণ্ড ট্যাক্স বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে, নবাবের পর নবাব শুধু আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবওয়াবকে cess বলা যেতে পারে। মিরকাশিমের হাতে এই আবওয়াব কিরকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল, তার সাক্ষাৎ পাবে ফিফ্‌থ্‌ রিপোর্টএ। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তার পর ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে দিল্লির বাদশা কোম্পানি বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ, সর্‌ফরাজ খাঁর আমলে আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে, আলমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার নবাব কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, আর কোম্পানি বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লির বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানি পেলেন বাংলার অর্ধেক রাজত্ব, আর বাকি অর্ধেক রইল নবাব নাজিমের হাতে। একালের ভাষায় বলতে হলে, দিল্লির বাদশা ডায়ার্কির সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারি সংক্রান্ত সকল রাজকার্য নবাব নাজিমের হাতে রিজার্ভড সাবজেক্ট-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানির হাতে যে কি কি বিষয় ট্রান্সফার্ড হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার; কেননা এই ট্রান্সফার-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করল। বলা বাহুল্য, নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লির বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানি বাংলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানি নিজ হাতে

নিলেন না— নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তার পর ১৭৬৯ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে (বাংলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাংলায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহাশ্মশানে পরিণত হল, তখন কোম্পানির বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে হেস্টিংস সাহেবকে বাংলার গবর্নরপদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন— প্রধানতঃ খাজানা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা আদায় হয়, তার পূর্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্বনাশ ঘটেছিল তার পরিচয় হান্টারের *Annals of Rural Bengal* -এ পাবে। এর ভোগ বাঙালি জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এই মন্বন্তরের ধাক্কা বাংলা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি এমার্জেন্সি লেজিস্‌লেশন্ বলেছি।

হেস্টিংস সাহেব কলকাতায় এসে বাংলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত, ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্বিচারে সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, এইসব ইজারাদার বাংলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং হেস্টিংস সাহেব এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে হেস্টিংস সাহেবের পরম শত্রু ফ্রান্সিস সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানির বিলেতি ডিরেক্টরদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টর মহোদয়দের এ বিষয়ে যা-হোক-একটা মন স্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলা-কওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ-উপদেশমতই ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ, যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship -এর সূত্রপাত হল, সেই বৎসরই বাংলার প্রজা জমির উপর তার সকল স্বত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে—

১. বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে— প্রজার সঙ্গে, না, জমিদারের সঙ্গে?

২. জমিদার বলতে কি বোঝায়— ভূম্যধিকারী, না, সরকারের ট্যাক্স কলেক্টর?

৩. যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তা হলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে?

৪. জমিদারকে যদি মৌরসীপাট্টা দেওয়া হয়, তা হলে তার দেয় মাল-খাজানা চিরদিনের মত নির্ধারিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে; এবং তার কারণ এই যে, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, কেননা কোম্পানির গবর্নমেন্ট হচ্ছে বিদেশি গবর্নমেন্ট।

কি-সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল, তার আনুপূর্বিক বিবরণ ফিফ্থ্ রিপোর্টএ দেখতে পাবে। এ স্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে সার জন্ শোর প্রমুখ কোম্পানির প্রধান কর্মচারীরা যেসকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তারই উল্লেখ করছি—

প্রথম। জমি রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এ দেশে জমি-জমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব, — বিশেষতঃ তাঁরা যখন বাংলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরি করবার, খাজানা আদায় করবার, বাকিবকেয়ার হিসাবকিতাব রাখবার ভার দেশি আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুশি তাই করবে, তহবিল তছরুপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরেজ কলেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশি তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেবনিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরেজ কলেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়মমত ও নিয়মিত আদায় করতে হয়, তা হলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়ঃ।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিংবা ট্যাক্স-কলেক্টর, তা বলা অসম্ভব; কেননা ওনারশিপ বলতে ইংরেজ যা বোঝে, এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি অস্টিন্এর ভাষায় স্বত্বের অর্থ হচ্ছে—

A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration.

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ স্বত্ব আছে, এ কথা সেকালে কোনো জমিদারও দাবি করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তী জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাংলার নবাব ও দিল্লির বাদশা, এঁদের ভিতর যাঁর খুশি তিনিই যখন-তখন জমিদারের গালে চড় মেরে তাঁর জমিদারি কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদকুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বে বাংলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে, জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয়, তো আইনতঃ তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে ইংলিশ ল্যাণ্ডলর্ডদের সঙ্গে আইরিশ টেন্যাণ্টদের যে সম্বন্ধ ছিল। এ স্থলে সার জন শোর -এর মত উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused.* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar, is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary right— the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot be a zemindar to the simple principles of landlord and tenant.[১]

এই উদ্‌ধৃত বাক্য-ক'টির বাংলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই; কেননা কি বাংলা কি সংস্কৃত, এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংরেজি real propertyর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-আপদ কস্মিন্‌কালেও ছিল না।

---

১ Fifth Report, vol. ii.

শোর সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এ দেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তার কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্তন রয়েবসে করতে চেয়েছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের কিন্তু আর স্বর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে এক ঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্বস্বামিত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাংলার জমির নিরূঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক আর-এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন, তা হলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজাপ্রজার যে সম্বন্ধ সেকালের ইংরেজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল, কালক্রমে তার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড় শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, রায়তের আর যাই থাক্, জমির উপর কোনোরূপ মালিকীস্বত্ব নেই, এবং পূর্বেও ছিল না। লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এ স্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরেজের কথা নিম্নে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

It is well-known that in the only place where the 'Laws of Manu' allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source— still so universally acknowledged throughout India— that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain-produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that, out of his grain-heap at the threshing-floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers have customary rights to certain shares— if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made

the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual 'property' may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.[২]

কষ্ট করে এর বাংলা করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চা ক'রে যাঁদের মন ও মত সার জন শোর -এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে, সে আইনের নজির যাঁদের নজরবন্দী করেছে, তাঁদের দৃষ্টির জন্যই ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল। আশা করি এতে তাঁদের চোখ ফুটবে।

যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজার তার পর আর পাঁচজনের, যথা, গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজরাজ যখন বিদেশিরাজ, তখন দেশে এমন-একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরেজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদেবিপদে এই দল ইংরেজ-রাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহুল্য, তখন সে মালিকীস্বত্ব চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। যে স্বত্ব unlimited in point of duration নয়, সে স্বত্ব ইংরেজের মতে আইনতঃ মালিকীস্বত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তার পর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য করে দেবার প্রস্তাব ফ্রান্সিস সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানি বাহাদুর বাংলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা—not a tribute imposed on a conquered people, but its land revenue.

মনে রেখো যে, এ সময়ে জন কোম্পানি রাজা হিসেবে নয়, দিল্লির বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয়সংকুলান করবার জন্য যে-পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক, তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা ফ্রান্সিস সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসংগত। তাঁর নিজের কথা এই—

২ Baden Powel, *Village Community*, pp. 130-31.

The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for ; with an allowance of a reasonable reserve for contingencies. . . I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects ; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the government needed to raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and 'fixed for ever'.[৩]

সংক্ষেপে ফ্রান্সিস সাহেবের মতে গবর্নমেন্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয়-আয়ের একটা বজেট তৈরি করে আবহমানকালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাংলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক। এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিসই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার স্বত্ব আরো পাকা হল কিংবা একদম কেঁচে গেল।

প্রজার যে ভিটে ও মাটি দুয়েরই উপর কিছুকিছু স্বত্ব ছিল, সে সত্য সার্ জন শোর প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই-না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল। একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত উভয়েরই যে একযোগে স্বত্বস্বামিত্ব কি করে থাকতে পারে, এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি রোমান ল, কি বিলাতের কমন ল, ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না। ফলে, যে সম্বন্ধ ছিল মিশ্র, তাকে তাঁরা করতে চাইলেন শুদ্ধ। ভারতবর্ষের মাটির এমনি গুণ যে, সে মাটি যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ফলে এ দেশের প্রাকৃত প্রথা তাঁরা সংস্কৃত করতে প্রবৃত্ত হলেন।

৩ Fifth Report, vol. i

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্তু ও ক্ষেত্র দুই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা ; আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে স্থরত জমি চাষ করে, তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাস্বত্ব শুধু খোদকস্ত-প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত-প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামিত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ স্বত্ব ছিল না।

সেকালের প্রজাস্বত্বের মোটামুটি ফর্দ এই—

১. প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ তার জোত ছিল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট।

২. সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার অধিকার খোদকস্ত-রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার স্বত্ব যে মালিকীস্বত্ব, এ বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন, এ দুয়েরই বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত-প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

৩. জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি প্রমাণ এই যে, বাংলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবওয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মাত্র, সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার চিরাগত প্রথা অনুসারে রাজারও ছিল না।

খালি বাংলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এইসকল স্বত্বে স্বত্ববান্ ছিল। প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 'পেশবাদিগের রাজ্যশাসনপদ্ধতি' নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— মিরাসদার বা মিরাসী [খোদকস্ত] ও উপরি [পাইকস্ত]। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজানা বাকি না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে, তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকি খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ত্রিশ চল্লিশ এমন কি ষাট বৎসর পরেও বাকি রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া

পাইত।··মিরাসীরা গ্রামপ্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন।··অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্মচারীগণ 'পাটীলে'র [মণ্ডল] সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন।[৪]

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এ রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরেজিতে যাকে বলে ট্যাক্স-কলেক্টর, অর্থাৎ জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিশন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারিতে তহশিলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিল-দারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেতেন।

জন কোম্পানি কিন্তু এ দেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন, এই সম্বন্ধ উলটে ফেলে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাংলার মাটির স্বত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্তন কোম্পানির বড়কর্তারা স্বেচ্ছায় করলেও স্বচ্ছন্দচিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গেসঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্তব্য, সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম ফ্রান্সিস সাহেবের, তার পর লর্ড কর্নওয়ালিসের; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের জনক, আর একজন তার জননী—

Mr. Francis proposed that it should be made an indispensable condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants, either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree.

ফ্রান্সিস সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শোর সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই—

The former is the custom of the country, this will become a

৪ ভারতবর্ষ ফাল্গুন, ১৩২৬

new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zemindar's quit rent.[৫]

এখন লর্ড কর্নওয়ালিসের কথা শোনা যাক—

Unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindars, every *begha* of land possessed by them must have been cultivated under an expressed or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more.[৬]

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যেসকল স্বত্বের দাবি করছে, সেসকল স্বত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ঐসব মামুলি স্বত্ব যে তাঁরা আইনতঃ রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—

It being the duty of the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependant taluqdars, ryots and other cultivators of the soil.[৭]

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি মোটেই পালন করেন নি ; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃস্টাব্দে পার্লামেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানি বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানির আমল শেষ হয়ে যখন মহারানীর আমল শুরু হল, তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের দশ-আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে টেন্যান্সি অ্যাক্টের প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হয়েছে, তা স্বত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ ইংরেজিতে যাকে বলে half measures, অর্থাৎ আধাখেঁচড়া ব্যবস্থা, যার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবি আইনতঃ গ্রাহ্য হলে প্রজা যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই ; এবং জমিদারবর্গের নিকট

---

৫ Fifth Report, vol. ii. ৬ Fifth Report, vol. ii. ৭ cl. I. s. 8, Reg. I of 1793.

আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার স্বার্থের হন্তারক না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে এ কথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে শুরু না করি, তা হলে দু দিন্ বাদে হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—

তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচ-কুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই— তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা।[৮]

তিনি আরও বলেন—

এক্ষণে এসকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জান?— ইংরেজিতে যাকে বলে কম্যুনাল প্রপার্টি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant proprietor না করে তুলি তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশিদিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালি সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের কো-অপারেশন-এর প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ যখন বাংলার বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান। এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের সার কথা।

১৩২৬ ফাল্গুন

---

৮ সাম্য। ১৮৭৯

বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌

জনৈক বন্ধুকে লিখিত

আজ বিজয়া। এই শুভদিনের শুভকামনা জানিয়ে এই পত্র আরম্ভ করছি। আজকের দিনে আত্মীয়স্বজনের বন্ধুবান্ধবের শুভকামনা করাটা আমাদের মধ্যে অবশ্য একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ইংলণ্ডে নূতন বৎসরের প্রথম দিনে পাঁচজনকে অন্তরের শুভকামনা জানানোটা হচ্ছে সে দেশের ভদ্রসমাজের একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, তেমনি এ দেশেও পাঁচজনকে বিজয়ার হয় প্রণাম নয় আশীর্বাদ জানানো সর্বসাধারণের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

তবে এ উভয় প্রথা মামুলি হলেও এ দুয়ের ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, পয়লা জানুয়ারির সঙ্গে খৃস্টধর্মের কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ আছে বলে তো জানি নে; যদি থাকে তো সে এত দূরসম্পর্ক যে, তা না থাকারই শামিল। ফলে এই বিজয়ার দিনে আমরা পরস্পরের যে শুভকামনা করি তার ভিতর শুধু ভদ্রতা নয়, আন্তরিকতাও থাকে।

আমি এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, আমার পক্ষে এ দিন তিন শ পঁয়ষট্টির ভিতর একটা দিন নয়, কিন্তু তিন শ চৌষট্টি ছাড়া আর-একটা দিন; অর্থাৎ এ দিনে অকারণে মনের ভিতর আশা ও আনন্দ যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, বৎসরের অপর কোনো দিনে সকারণেও ঠিক তেমনটি হয় না। এই একটি মাত্র দিনেই আমরা বাঙালিরা বিশেষ ক'রে নিজের অন্তরে একটা জাতীয় আনন্দের আস্বাদ পাই।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভুলে যেয়ো না যে আমি একে বাঙালি, তার উপর আবার শাক্ত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। বালককাল হতে সাবালক হওয়া পর্যন্ত বছরের পর বছর দুর্গোৎসবই ছিল আমার কাছে বৎসরের সব-চাইতে বড় উৎসব। ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প চন্দন অর্ঘ্য নৈবেদ্য এইসকলের বর্ণ গন্ধ ও শব্দের সংশ্রবে শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে আমার সকল ইন্দ্রিয় যুগপৎ তুষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে। এর থেকে মনে ভেবো না যে দুর্গোৎসবের সঙ্গে আমার শুধু ইন্দ্রিয়েরই সম্পর্ক ছিল, মনের কোনো

সম্পর্ক ছিল না। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য কোথায় শেষ হয় আর মনের রাজ্য কোথায় আরম্ভ হয় তার পাকা সীমানা আজও কেউ নির্ধারণ ক'রে দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি জিনিসটে হচ্ছে সংক্রামক, বিশেষতঃ অর্বাচীনের মনের পক্ষে। সুতরাং তুমি ধরে নিতে পার যে, দুর্গাপ্রতিমার প্রতি আমার মনেরও ভক্তি ছিল। ভক্তি যে ছিল তার প্রমাণ, আমি আরতির সময় মাটির প্রতিমার মুখে হাসি দেখেছি। হাসি কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, সেকালের প্রতিমার মুখের যে ভাব আমাদের চোখে পড়ত সে ভাব হচ্ছে প্রসন্ন-করুণ।

দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তবের একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি—

কেনোপমা ভবতি তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

আমরা দেবীর দৃষ্টিতে যার সাক্ষাৎপরিচয় পেয়েছি সে 'সমরনিষ্ঠুরতা'র নয়, চিত্তকৃপার।

আমার এ কথা শুনে তুমি যা উত্তর দেবে তা জানি। তুমি বলবে, ওসব হচ্ছে illusion আর delusion। অবশ্য তাই। কিন্তু এ সত্যটিও মনে রেখো যে illusion আর delusion থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। সারাজীবন এই দুটিকে নিয়েই আমরা ঘর করি, এক রকম delusionএর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে আর-এক রকম delusionএর বশীভূত হই। এক ঠাকুরকে বিসর্জন দিয়ে আর-এক ঠাকুরের পুজো করতে শুরু করি। তা ছাড়া যেসকল ভুলবিশ্বাস আমাদের মন থেকে চলে যায়, মনের উপর সেসকল তাদের ছায়া আলো দুই রেখে যায়, স্মৃতি আজীবন তার জের টেনে চলে। আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর কাটা-ছাঁটা হীরকখণ্ডের মত নিরেট কঠিন জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে, তার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে যত অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভাব। আর আমাদের মতামত কার্যকলাপের উপর এইসকল অস্পষ্ট মনোভাবের প্রভাব বড় কম নয় এবং সে প্রভাবকে দূর করা কঠিন, কারণ-তা অলক্ষিত। আমার এসব কথা শুনে ভয় পেয়ো না যে আমি আবার কেঁচে পৌত্তলিক হতে যাচ্ছি। আমার চিরজীবনের শিক্ষা সে ফেরবার পথে কাঁটা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের— ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালির— বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। তা ছাড়া

আমাদের মনের পক্ষে কালাপানি পার হবারও কোনোই দরকার নেই, স্বদেশের মনোজগতে কিঞ্চিৎ পিছু হটলেই এমন জায়গায় পৌঁছনো যায়, যেখানে যাবামাত্র আমাদের প্রতিমাভক্তি উড়ে যায়। 'ন প্রতিকে ন হিংস' এ সূত্র তো বেদান্তেই আছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ যুগে আমরা সবাই বৈদান্তিক, অর্থাৎ আমরা ধর্ম মানি, কিন্তু কোনো ধর্মই মানি নে।

আমার মনের কথা তোমাকে এতটা খুলে বলবার উদ্দেশ্য এই সত্যটা স্পষ্ট করা যে, আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলতঃ বাঙালি। বাঙালি হিন্দুর মনের ধর্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালির চিরাগত ধর্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও দুর্গোৎসব জাতীয়-উৎসব নয়। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। যোড়শোপচারে এই মূর্তি-পূজার প্রসাদেই বাঙালিজাতির মনের poetic এবং aesthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনো ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু তার সৌরভটুকু সেখানে রেখে যায়। এটা কখনো লক্ষ্য করেছ যে, দর্শন-বিজ্ঞানের আক্রমণে ধর্ম কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত? কোনো বিশেষ ধর্মমতকে যখন আর সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না, তখন বৈষয়িক লোকের কাছে তা শিব ব'লে গ্রাহ্য হয়, আর অবৈষয়িক লোকের কাছে সুন্দর ব'লে। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত, পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম যাই হোক-না কেন, বাঙালির জাতীয়-পূজার প্রভাব বাঙালির সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালির হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।

তুমি মনে ভাবতে পার যে, আমি এ উৎসবের একটি কলঙ্কের কথা, বলিদানের কথা, চেপে গিয়েছি। ধর্মের নামে পশুহত্যা আমরা ছাড়া ভারত-বর্ষের অপর কোনো সভ্যজাতি করে না। আর এ হত্যা যে যেমন অনর্থক তেমনি বর্বর, আজকের দিনে কোনো শিক্ষিত বাঙালি তা স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না। নিরীহ ছাগশিশুকে হাড়কাঠে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা 'সমরনিষ্ঠুরতা'র অভিনয় করছেন, তাঁদের পৌরুষের

বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে পলিটিক্সের বাকযুদ্ধ। হত্যাকে ধর্ম বলতে আমরা অবশ্য কেউ প্রস্তুত নই। তবে সত্যের খাতিরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, যারা বৈদিক তান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়েছে সেসকল বাঙালির পক্ষে জবাফুল চক্ষুশূল নয়, আর রক্তচন্দনের ফোঁটায় তাদের কপালও চড়চড় করে না। এ জ্ঞান তাদের আছে যে, মানুষের জীবনরাগিণীতে কড়ি ও কোমল দুই রকম সুরই সমান লাগে। এই রাজসিক পূজা আমাদের মনকে সকল প্রকার রাজসিক ধর্মের প্রতি অনুকূল করেছে। তা সে ধর্ম সাহিত্যেরই হোক, আর সমাজেরই হোক। এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য তোমাকে বোঝানো যে, আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ শূন্যগর্ভ নয়; অস্পষ্ট আশার স্পর্শে তা মুকুলিত, অহৈতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।

২

এই সূত্রে এই সুযোগে আমি তোমার কাছে আমার সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তোমার কাছে আমার বকেয়া কৈফিয়তটি আজ সুদ-সুদ্ধ শুধে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি। অমৃতশহর কন্‌গ্রেসের পিঠ-পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি; কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আন যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালির পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সেসকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাংলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজ্‌মের প্রত্যাশা কর। আমি যে ইংরেজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজ্‌ম্ আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোনো দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজ্‌মের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি

প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কন্‌গ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ওসকল সভার তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক, কোনোরূপ ভালোবাসার কৈফিয়ত চাওয়াও যেমন অন্যায় দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা— কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালোবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালোবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন— জড়পদার্থ; কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক ওসব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতিপ্রীতির কৈফিয়ত কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজনবাৎসল্য-রূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জুনেরও ছিল, তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আর বাঙালি বাঙালি-মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালিদের পরস্পরের প্রতি নাড়ির টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পুরো কৈফিয়ত দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলেবেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কষতে দিতেন, যা আমরা সকলে কষে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই—

আছিল দেউল এক পর্বতপ্রমাণ
তেহাই সলিলে তার· ·

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর কতটা পোঁতা আছে আঁক কষে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্বতপ্রমাণই হোক, আর বল্মীকপ্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরে তরল ভাবে ডুবে আছে; যেটুকু জেগে আছে

সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময়ে নিজেও জানি নে, অতএব পরকেও জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যেসব তর্কযুক্তি দেখায় সেসব ষোলোআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে, পৃথিবীতে যেসকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সেসকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্মিক, উপরন্তু মহাপেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে, আমি আমার বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্ সমর্থন করে তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। সবুজ পত্রে তোমার অনুরোধ মত আমার কৈফিয়ত-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুন সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' সেই ভাবে আমার কৈফিয়ত তোমার পত্রের অনুচর হয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশলাভ করবে, তা হলে আমার মরচে-পড়া ওকালতি বুদ্ধি মেজে-ঘষে তার সাহায্যে এমন-একটি বর্ণনাপত্র তৈরি করে দিতুম যাতে সত্যমিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিকাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিতে পারতেন না।

৩

সংস্কৃতে বলে গতস্য শোচনা নাস্তি, কিন্তু ইংরেজিতে বলে it is never too late to mend। আমি ইংরেজি-শিক্ষিত, অতএব ঐ ইংরেজি বচন শিরোধার্য করে এ কৈফিয়ত লিখতে বসেছি এই আশায় যে, সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ আগামী স্বরাজের *lingua franca*য়, প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালি নই। একছত্র একদণ্ড ইংরেজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে,

আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজি-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইণ্ডিয়ান ওরফে নন্-ইণ্ডিয়ান, অর্থাৎ কন্‌গ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো তাই বলব। বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের মূলে আছে বাঙালি জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations -এর মতানুসারে বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমতঃ আমরা একটি বিশেষ জাতি, তার পর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি; সুতরাং আমাদের সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন-বিরোধী হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্। আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ সর্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশিই হোক আর বিদেশিই হোক। ইংরেজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে, জর্মানির ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্মানির এই স্বদেশি ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ জর্মান জাতির নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল তো আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেননা তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বল যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন যদি না খাটে তো ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোনো জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমনকি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানিরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ান্‌রা আঁত্‌কে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও-মনোভাব জাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর

শোনে অমানুষে। ধর, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিশিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজ্‌মের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন।— তার উত্তর, আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশি রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনো প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিকাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং' এই উপদেশ কিংবা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই— স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্মের চর্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্যস্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কন্‌গ্রেসী ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশপাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচ জন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচ জন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কন্‌গ্রেসী মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের

সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের ভিত্তির উপরেই বাক্য-গত নয়, বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজ্‌ম্ গড়ে উঠবে।

ছেলেবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল-শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্দেশাৎ আগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি স্ম।

রাত্রিকালে নানা দিগ্দেশ হতে পাখিরা এসে গোদাবরীতীরে সেই শিমুল গাছে জড়ো হত কেন?— কিছুক্ষণ কচায়ন করে তার পর আরামে নিদ্রা দেবার জন্য। এ বিষয়ে সকল পক্ষীর স্বার্থ একই। কচায়ন শব্দের মানে বোধ হয় জান না। পক্ষীর ভাষায় ও-শব্দের অর্থ পক্ষীসভার রাজনৈতিক আলোচনা।

আমরাও যে ভারতবর্ষের এই রাত্রিকালে কন্‌গ্রেসে গিয়ে দিন-তিনেক ধরে কচায়ন করে তার পর নিদ্রা দিই, সেও ঐ একই কারণে। এ কচায়ন করা যে সম্ভব হয়, তার কারণ ইংরেজ-দত্ত শিক্ষার গুণে আমাদের সকলের মুখেই এক বুলি। এ বুলি যে শুধু আমাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়, এ অপবাদ আমি দিচ্ছি নে। আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কন্‌গ্রেসী পেট্রিয়টিজ্‌মের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক্। আর, আমাদের ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্থল হতে। বিদেশি শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক Know thyself, এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজ্‌মের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

৫

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে ধনধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ তো হবারই কথা। আমরা

যখন প্রাণী, ও প্রাণের সর্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাইই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড় বড় কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড় কথা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম্ এবং বল্‌শেভিজম্, বাদবাকি আর যত রকম ism আছে সে সবই হয় ক্যাপিটালিজ্‌ম্ নয় বলশেভিজম্‌এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম এতই পরস্পরবিরোধী যে, উভয়ের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবনমরণের যুদ্ধ চলছে। অথচ এই উভয় পলিটিকাল ধর্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস্ হচ্ছে অন্ন। তবে মানবজাতি যে দু ভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। ক্যাপিটালিজ্‌মের মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহু অন্ন, আর বলশেভিজ্‌মের মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনোটিই টিকবে না। কেননা, ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর বলশেভিজ্‌ম্ মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যতঃ এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ, মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপর পক্ষে একমাত্র তড়িতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই তো মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই; জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের ন্যাশনালিজ্‌মের নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের ন্যাশনালিজ্‌মের বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা ন্যাশনালিজ্‌ম্ শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি-কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদানপ্রদানের বস্তু, এককথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনো জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর মেটিরিয়ালিস্ট, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mindও matterএর মত দেশের গণ্ডিতে বদ্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার বেনামিতে জড়বাদ যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিক স্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্নসমস্যার সমাধান করা। আর, বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান সাপেক্ষ। কথার রাজ্য থেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশশাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখনই দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক-পেট্রিয়টিজ্‌ম্। যে রুসোর পলিটিকাল মতামতের ঘষা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজ্‌মের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে অনেকটা সংকুচিত করে আনতে হয়।

সে যাই হোক, আমার বাঙালি-ন্যাশনালিজ্‌ম্ মুখ্যতঃ মানসিক এবং গৌণতঃ রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মনে স্বরাট্ হবার একটি উপায় মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬

এখন বাঙালির মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা বাঙালির ন্যাশনাল

সেল্‌ফ-কন্‌শাসনেস কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই ন্যাশনাল সেল্‌ফ-কন্‌শাসনেস কথাটা আমাদের স্বদেশি-যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক এ কথাটা তার পলিটিকাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাংলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেননা, তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনো জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐসমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনো ভাষায় ওটির সঠিক তরজমা করা চলে না।

মানুষ মাত্রেই মুখ্যতঃ এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর, ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্পবিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিকাল মতামত যে ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস,

এ তো সবাই জানে। দেশসুদ্ধ লোকের পলিটিকাল আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে এ কথা এক পেশাদার ন্যাশনালিস্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরও কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্যবিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। ল্যাফ্‌কাডিয়ো হার্ন-এর বইয়ে পড়েছি যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক জাপানিদের মনের কোনোখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয়, ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে; ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যানধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই-না বাঙালি যুবক আইনস্টাইনের নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাংলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালির এতটা ঝোঁক।

এসব কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে, বাঙালির জ্ঞান জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনো কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালি ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি, এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস, এ অক্ষমতার জন্য যত-না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কলকারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবতঃ বাঙালির নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক, যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালি মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয়-জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির

উলটো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালি সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ যে-বাঙালির চিন্তা করবার অভ্যাস আছে সেই জানে যে উচ্চশিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্‌বোধিত করবার সর্বপ্রধান উপায়। কোনো জাতির পক্ষে স্বধর্ম হারিয়ে স্বরাট্ হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশই তার শিক্ষাদীক্ষার উপর অপর কোনো প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা-না-একটা বিশেষ জাতীয়-আদর্শ থাকে, এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজত্ব বলে কোনো জিনিস নেই, অথবা নিজত্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন নেই ; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোনো অর্থও নেই। স্বত্বসাব্যস্ত করবার জন্যই তো স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকি ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিকাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিকাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিকাল মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূতও নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেসওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না ; যদি মানতেন, তা হলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবকশ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব, অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট্ হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর এ ধারণা এ যুগের বহু বাঙালির মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদ-পত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুক করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই, তা নিয়ে প্রকাশ্য ঢাক পেটানো অসম্ভব ; আমরা ঢাক

পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে, কতকটা পরীক্ষার ফলে, আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ; এবং আত্মজ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে ব'লে তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পুষ্ট-পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে; আর আমাদের দুর্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে আমরা লোকের জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয় করে রাখা পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করি নে। কোনো জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়; এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধনপদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুক নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ-পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে, এবং সে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন; কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিক-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি; তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আব-হাওয়ায় মানুষ হয়েছি; সুতরাং আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কোনো মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে, তবে তা যে তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজকাল যেসকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সেসব পুরোমাত্রায় তামসিক। সেসবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এককথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাংলার মন। যদি তাই হয় তো বাঙালির ন্যাশনালিজমের আদর্শ যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ

হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালির যদি কোনো আন্তরিক প্রার্থনা থাকে তো সে এই—

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

কিন্তু এ প্রার্থনা কোনো বাইরের শক্তির কাছে নয়, নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয়— এসকলই আত্মবলে অর্জন করতে হয়, প্রার্থনাবলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ আইডিয়ালের মধ্যে তো সেল্‌ফ-স্যাক্রিফাইস-এর কথা নেই? তার উত্তরে আমি বলি, সেল্‌ফ-স্যাক্রিফাইস কোনো জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে সেল্‌ফ-রিয়ালাইজেশন। আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু লোকের পক্ষে সেল্‌ফ-রিয়ালাইজেশনের ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়— ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালি-পেট্রিয়টিজম্ বর্তমান ভারতবর্ষীয়-পেট্রিয়টিজ্‌মের বিরোধী নয়। আর-এক কথা, যে-ন্যাশনালিজম্ বিদ্বেষবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ন্যাশনালিজ্‌মের ফলে শুধু পরের নয় নিজেরও যে সর্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

১৩২৭ অগ্রহায়ণ

পূর্ব ও পশ্চিম

জ্ঞান হয়ে অবধি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে মস্ত একটা প্রভেদ আছে, এইরকম একটা কথা শুনে আসছি। কিন্তু সে প্রভেদটা যে কি ও কোথায়, তা এতদ্দেশীয় কোনো বক্তা কি লেখক আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন নি। অন্ততঃ আমার মন যেসকল কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে, এমন কথা আমি তো অদ্যাবধি কোনো স্বদেশি বক্তা কিংবা লেখকের মুখে শুনি নি।

পূর্ব-পশ্চিমের কথা উঠলেই সূর্যের উদয়-অস্তের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। আর তার পিঠ-পিঠ নানারকম উপমা এসে আমাদের নয়ন-মন অধিকার করে বসে। যথা, সভ্যতার উদয় পূর্বে, অস্ত পশ্চিমে। আলো আগে পুবে ওঠে, তার পর পড়ে পশ্চিমে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে, জিয়োগ্রাফির পূর্ব অলক্ষিতে আমাদের মনে হিস্টরির পূর্ব হয়ে ওঠে, আর তখন আমরা দেশের ধর্ম কালের উপর আরোপ করি, আর কালের ধর্ম দেশের উপর। আর এর ধর্ম ওর ঘাড়ে চাপাবার ফলে আমাদের মন চিন্তারাজ্যে দিশেহারা হয়ে যায়।

সত্য কথা এই যে, যখন আমরা পূর্ব-পশ্চিমের কথা বলি তখন আমরা ইউরোপ ও এশিয়ারই ভেদাভেদের কথা ভাবি। বর্তমান ইউরোপের সঙ্গে বর্তমান এশিয়ার অবশ্য কতকগুলো স্পষ্ট প্রভেদ আছে। সাংসারিক হিসেবে ইউরোপ সমৃদ্ধ, এশিয়া দরিদ্র। দেহে-মনে যেসকল গুণের সদ্‌ভাবে মানুষের পলিটিকাল ও ইকনমিক ঐশ্বর্য লাভ হয়, সেসকল গুণ ইউরোপীয়দের দেহ-মনে যে-পরিমাণে আছে আমাদের দেহ-মনে সে পরিমাণে নেই ; এটি তো প্রত্যক্ষ সত্য। এই মোটা সত্য থেকে একটি মোটা তথ্য জন্মলাভ করেছে। সে তথ্য এই যে, পূর্ব হচ্ছে স্পিরিচুয়াল এবং পশ্চিম মেটিরিয়ালিস্টিক।

২

স্পিরিচুয়ালিটি এবং মেটিরিয়ালিজম্, দুটো কথাই আমরা বিলেত থেকে আমদানি করেছি। প্রমাণ, এ দুটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। স্পিরি-চুয়ালিটি-র তরজমা আমরা সংস্কৃতের সাহায্যে কোনোরকমে করতে পারি, কিন্তু তাও ভুল অনুবাদ হবে। সংস্কৃত আধ্যাত্মিক শব্দ ইংরেজি স্পিরিচুয়ালিটি-র

প্রতিশব্দ নয়। কিন্তু মেটিরিয়ালিজম্-এর তরজমা করতে মোটেই পারি নে। সাংসারিক অভ্যুদয় সাধনের প্রবৃত্তি মানুষমাত্রেরই অন্তরে আছে; সুতরাং সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অক্ষমতার নাম স্পিরিচুয়ালিটি নয়, আর ক্ষমতার নাম মেটিরিয়ালিজম্ নয়। কারণ মেটিরিয়ালিজম্ নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে কর্মকুশলতার কোনো যোগাযোগ নেই; এবং স্পিরিচুয়ালিটি নামক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে অকর্মণ্যতারও কোনো যোগাযোগ নেই।

বড় বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারণ সেসব কথা নানা লোকে নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করে। কিন্তু সেইসব বিভিন্ন মনোভাবের একই নাম থেকে যায়, এবং সে নাম বাদ দিয়ে কোনো বিষয়ের আলোচনা করাও অসম্ভব। অথচ এই দার্শনিক কথাবার্তা নিয়ে নিয়ত আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা, সেই আলোচনাসূত্রেই সেই কথাগুলোর অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যাক যে, আমরা স্পিরিচুয়াল এবং ইউরোপের লোক মেটিরিয়ালিস্টিক। এই ইউরোপীয় মেটিরিয়ালিজ্‌মের প্রভাব আমাদের মনের উপর কি সূত্রে কতদূর হয়েছে, এবং আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির প্রভাব ইউরোপীয় মনের উপর কি ভাবে কতটা হয়েছে, আর সে প্রভাবের ফল বিশ্বমানবের পক্ষে আশঙ্কার কথা কিংবা আশার কথা— তাও বিবেচ্য।

৩

ইউরোপ যে কর্মক্ষেত্র এবং এশিয়া যে ধর্মক্ষেত্র, এইরকম একটা ধারণা উক্ত দুই ভূভাগের লোকের মনে অনেক দিন থেকে দিব্যি বসে গিয়েছে; এবং সে কারণ ইউরোপের লোকেরা এই ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এশিয়াতে কর্ম নেই; আর আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, ইউরোপে ধর্ম নেই। দু পক্ষই এই ভেবে মনস্থির করেছিলেন যে, কর্মরাজ্যে এশিয়া ইউরোপের ঘাড়ে চড়তে পারবে না; আর ধর্মরাজ্যে ইউরোপও এশিয়ার ঘাড়ে চড়তে পারবে না। একটা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য মত পেলেই মানুষে মনের আরামে থাকে। আর ইউরোপের লোক যে সব পুরুষ ও এশিয়ার লোক যে সব মেয়ে, এর চাইতে সহজ ভাগ আর কি হতে পারে?

ফলে এশিয়ার কাছ থেকে ইউরোপের কোনো ভয় ছিল না। গত-যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে ইউরোপের মনে নানা রকম ভয়ভাবনা

জন্মেছে। নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের লোকের মনে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাসের গোড়া আলগা হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা নানা দিকে নানা রূপ বিভীষিকা দেখছে। ইউরোপের, বিশেষতঃ ফরাসিদেশের, বর্তমান সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, এশিয়া এখন সে দেশের সাহিত্যিক মনের অনেকটা অংশ অধিকার করেছে। যেসকল ইউরোপীয়েরা এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবেন তাঁরা এশিয়ার কথা বাদ দিয়ে ইউরোপের ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন না। ফলে নিজের নিজের প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে কেউ-বা এশিয়ার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার পরিপন্থী মনে করেন, কেউ-বা তাকে আবার তার সহায় মনে করেন।

৪

এই উভয় শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে মতের অনৈক্য কোথায় এবং কি কারণে, তা ফরাসিদেশের হুটি গণ্যমান্য সাহিত্যিকের লেখায় খুব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। আমি সংক্ষেপে উভয়ের বাদানুবাদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। কারণ এ দেশে যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ নিয়ে মাথা বকান, পশ্চিমের লোকেরা সে বিষয়ে কি ভাবছে তা জানবার জন্য আশা করি তাঁদের কৌতূহল আছে।

মাসি Massis বর্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্ধর লেখক। তিনি প্রথমে ছিলেন রেনাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁস-এর মন্ত্রশিষ্য। পরে তিনি আরিস্টটল ও যীশুখৃস্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর পূর্ব শিক্ষাগুরু ও সতীর্থদের উপর নির্মমভাবে সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করছেন। তাঁর সমালোচনার বাণ উক্ত সাহিত্যিকদের বধ না করতে পারুক, কিছুকিঞ্চিৎ জখম যে করেছে, সে বিষয়ে ফ্রান্সের সাহিত্যসমাজে দ্বিমত নেই। মাসি প্রথমতঃ অতি চটকদার লেখক দ্বিতীয়তঃ অতি শক্তিমান লেখক; উপরন্তু খৃস্টান ধর্ম ও খৃস্টান দর্শনে তাঁর বিশ্বাস অটল। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং মারাত্মক লেখক, হয়ে উঠেছেন। তাই যাঁরা তাঁর মতাবলম্বী নন তাঁরাও স্বীকার করছেন যে, তাঁর মতামতের ভিতর অনেক নিগূঢ় সত্য আছে। তবে সকলেই বলেন তাঁর দোষ এই যে, অবিশ্বাসী সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর কোনোরূপ মায়ামমতা নেই। দ্বিতীয় কুমারিল ভট্টের মত তিনিও ফরাসি সাহিত্যরাজ্যে নাস্তিকনিগ্রহ করতে বদ্ধপরিকর

হয়েছেন। ইনি সম্প্রতি 'ইউরোপের আত্মরক্ষা' নামক একখানা বই লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন এদ্‌মঁ ঝালু Edmond Jaloux নামক জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সাহিত্যসমালোচনা যে কাকে বলে, ঝালুর সমালোচনাকে তার আদর্শ বলা যায়। উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্— এ কথা যে সাহিত্যরাজ্যেও খাটে, তার জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছেন উক্ত সমালোচক।

৫

মাসি মহোদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইউরোপ ধ্বংসপথের যাত্রী হয়েছে। তাই তিনি ইউরোপকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মরক্ষার অর্থ— আত্মার রক্ষা। তাঁর বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রতি জাতেরই একটি বিশেষ নিজস্ব আত্মা আছে, আর স্বকীয় আত্মার সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করারই নাম আত্মরক্ষা। কারণ কোনো জাতি যদি তার আত্মাকে সজীব ও সুস্থ রাখতে পারে তা হলে সে জাত জীবনেও সুস্থ ও সফল হতে বাধ্য।

তাঁর মতে ইউরোপীয় মন যুগযুগ ধরে গ্রীকসাহিত্য ও খৃস্টধর্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় মনের যা-কিছু শক্তি, যা-কিছু সৌন্দর্য, যা-কিছু মহত্ব আছে, সে সবই ঐ দুই প্রভাবের ফল। ইউরোপের লোক প্রায় দু হাজার বৎসর ধরে এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, এ বিশ্বের মূলে আছেন ভগবান, এবং তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময় পুরুষ, ভাষান্তরে সগুণ ঈশ্বর। ইউরোপের লোক যে কর্মজগতে এত ঐশ্বর্য লাভ করেছে, তার কারণ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করাই ইউরোপের যথার্থ আদর্শ। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, যুগযুগ ধরে ইউরোপের লোক শুধু ধর্মভাবে প্রণোদিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে। অধিকাংশ মানুষ শুধু নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই কর্ম করে; ইউরোপের অধিকাংশ অধিবাসী তাই করেছে। কিন্তু আমাদের যেসকল প্রবৃত্তি পশু-সামান্য, তারই চরিতার্থ করাটা আমরা পূর্বে কখনো সভ্য মনোভাব বলে গ্রাহ্য করি নি। যে মনোভাবকে পূর্বে ইউরোপের মনীষিবৃন্দ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ মনে করতেন, সে মনোভাব হচ্ছে: ভগবৎশক্তি এবং ভগবৎ-অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর; এবং বহুকাল ধরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপের মনকে এই সত্য ভুলতে দেয় নি তার কড়া শাসনের বলে।

৬

ইউরোপের এই আদর্শের উপর প্রথম ধাক্কা লাগায় ইটালির রেনেসাঁ, তার পর জর্মানির রিফর্‌মেশন। রেনেসাঁ আত্মার চাইতে বুদ্ধির, অন্তরের চাইতে বাহ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করলে; আর রিফর্‌মেশন অথরিটির চাইতে লিবার্টির শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করলে। এর ফলে সাধারণ লোকে বুঝলে যে, অথরিটি না মানার নামই লিবার্টি। মানুষ নামক পশু অথরিটি মেনেই, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বহির্ভূত অনেক সত্য অর্থাৎ মনোভাবকে মেনে নিয়েই যে মানুষ হয়, এ কথা ইউরোপের অধিকাংশ লোক ভুলতে আরম্ভ করলে। আর সেই অবধি লিবার্টির অর্থ হল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার স্বাধীনতা। এই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার অধোগতির প্রথম পদ।

এখন আবার এশিয়ার মনোভাব ইউরোপের মন অধিকার করছে, এবং সে মনোভাবের বশবর্তী হলে ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এশিয়ার মনোভাব অবশ্য মেটিরিয়ালিস্টিক নয়। মনোজগতে ইউরোপের উপর এশিয়ার আক্রমণ হচ্ছে ইউরোপীয় স্পিরিচুয়ালিটির উপর এশিয়াটিক স্পিরিচুয়ালিটির আক্রমণ। আসলে মেটিরিয়ালিজ্‌মের চাইতে এ ঢের প্রবল শত্রু। কারণ ইউরোপীয় মেটিরিয়ালিজ্‌মের শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়। রেনাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, জীদ্‌, রোমাঁ্যা রলাঁ প্রভৃতির বাণী সবই অন্তঃসারহীন। কারণ এঁদের সকলেরই আত্মা ক্ষুদ্রাত্মা। কিন্তু এশিয়ার স্পিরিচুয়ালিটির অবতার হচ্ছেন চীনের লাও-ৎসে আর ভারতবর্ষের বুদ্ধ। এ দু জনেই মহাপুরুষ ও অসামান্য মহৎ অন্তঃকরণের ব্যক্তি। এঁদের কথাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা চলে না। কিন্তু তা হলেও এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বুদ্ধ ও লাও-ৎসের মতের বশবর্তী হলে ইউরোপীয় মনোরাজ্যে অরাজকতা ঘটবে।

৭

মাসি-র মতে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মমত যার মনে বসবে, সে ভালোমন্দ সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য, অবশ্য সে যদি লজিকাল হয়। আর কর্মযোগী হওয়াই ইউরোপের বড় আদর্শ। তা ছাড়া এশিয়ার দর্শনের সার কথা হচ্ছে অহং subject এবং ইদং object -এর অভেদজ্ঞান। অপর পক্ষে ইউরোপের মন এ দুয়ের একান্ত ভেদজ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই এশিয়াটিক মনোভাব ইউরোপীয় মনের অন্তরে কোন্ ছিদ্র দিয়ে কি সূত্রে প্রবেশ করছে।

মাসি বলেন, প্রথমতঃ জর্মানির, দ্বিতীয়তঃ রাশিয়ার মারফত।

শনিমঙ্গলবারের মড়া দোসর খোঁজে। গতযুদ্ধের পর জর্মানি যখন আবিষ্কার করলে তার স্বার্থান্ধ সভ্যতা ম্রিয়মাণ হয়েছে, তখন সে বাদ-বাকি ইউরোপীয়দের ধ্বংসপথের যাত্রী করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল। জর্মানি কামানের গোলা দিয়ে যখন ইউরোপকে মারতে পারলে না, তখন সে সাহিত্যিক পয়জন্-গ্যাস্ দিয়ে ইউরোপীয়দের মোহাচ্ছন্ন করবার চেষ্টা শুরু করলে। আর আমাদের মন ও চরিত্র দুর্বল করবার তারা অব্যর্থ উপায় ঠাউরেছে, এশিয়ার ধর্মমত ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচার করা। তারা সকলে আমাদের বোঝাচ্ছে যে, মুক্তির মানে নির্বাণ, আর নির্বাণপ্রাপ্তিই ইউরোপীয়দের আদর্শ হওয়া উচিত। শ্পেঙ্ল্যর, কাইজর্লিঙ্ প্রভৃতি এ যুগের জর্মান দার্শনিকেরা মাসি-র মতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

আর রুশ সাহিত্যেরও প্রধান কথা হচ্ছে যে, ইউরোপ এতদিন ধরে যে সভ্যতার সাধনা করে এসেছে, তার ষোলো কড়াই কানা। ধর্ম রীতিনীতি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিলেই মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে, এই হচ্ছে রুশ সাহিত্যের বাণী। আর রাশিয়ানরা যে এশিয়াটিক, তা সকলেই জানে। এ ছাড়া ফ্রান্সের বহুলোক আজ লাও-ৎসে ও বুদ্ধের ভক্ত হয়ে উঠেছে।

৮

এখন এর উত্তরে ঝালু কি বলেন শোনা যাক। তিনি বলেন যে, মাসি-র রচনাচাতুর্য এতই অপূর্ব এবং তাঁর চিন্তা এতই সুশৃঙ্খলিত যে, তাঁর লেখা প্রথমেই মনকে অভিভূত করে, এবং তখন মনে হয় যে, তাঁর সকল কথাই তো সত্য। লেখক হিসাবে মাসি-র শক্তির মূলে আছে তাঁর ধর্মনীতি প্রভৃতি জিনিসে অটল বিশ্বাস। তাঁর মনে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। যার মনে কোনো-রূপ দ্বিধা নেই, সে ব্যক্তির অদম্য শক্তির পরিচয় কর্মজগতেও যেমন পাওয়া যায় মনোজগতেও তেমনি। কিন্তু আমাদের মন যখন নানা বিষয়ে সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, তখন মাসি-র কথার মোহ কেটে গেলেই আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন ওঠে। তিনি আমার মনে যেসকল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছেন, একে একে সেগুলি প্রকাশ করছি।

ইউরোপের বর্তমান মনোভাব দেখে মাসি যে ভয় পেয়েছেন, সে ভয় অকারণ নয়। বর্তমান ইউরোপের লোকের প্রকৃতি যে মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়ছে, এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত। এমনকি ইউরোপের যে-দলের লোক সব-চাইতে জ্ঞানান্ধ, অর্থাৎ পলিটিশিয়নরা, গতযুদ্ধের ধাক্কা খেয়ে তাঁরাও চোখ মেলে দেখছেন যে, যাকে তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতা বলেন তার অন্তরে ঘুণ ধরেছে। কিন্তু আমাদের এই অধোগতির জন্য এশিয়া কি হিসেবে দায়ী তা ঠিক বোঝা গেল না।

এশিয়ার কথা মনে করতে মাসি-র মন কি জন্য আতঙ্কে ভরে ওঠে? তিনি কি ভয় পান— এশিয়া আমাদের বাহুবলে পঙ্গু করবে, না, মন্ত্রবলে নির্জীব করবে? তাঁর ভয়টা পলিটিকাল না দার্শনিক?—মাসি হয়তো উত্তরে বলবেন যে, মানুষের দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ।

দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে পলিটিকাল মনোভাবের যে একটা সুদূর ও অস্পষ্ট যোগাযোগ আছে এ কথা স্বীকার করলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দার্শনিক মন ও পলিটিকাল মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জ্ঞান ও কর্মের অভেদ-জ্ঞান আমার আজও হয় নি। সে যাই হোক, পলিটিকাল হিসাবে এশিয়া ইউরোপের স্কন্ধে ভর করবে কি না, সে বিষয়ে কোনোরূপ মত দিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ। কারণ, এত অসংখ্য ও অজ্ঞাত ঘটনার সমবায়ের উপর এই দুই ভূভাগের পলিটিকাল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যে, ভবিষ্যতে ইউরোপ যে এশিয়ার দাস হবে, এ ঘটনা ঘটা যেমন সম্ভব তেমনি অসম্ভব। আর যদিই-বা তাই হয়, তা হলেই যে সৃষ্টির ধ্বংস হবে তা তো মনে হয় না।

ওসব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়। সুতরাং ইউরোপের পলিটিকাল সমস্যার মীমাংসা পলিটিশিয়ানরা করুন; আমরা মাসি মহোদয় যে দার্শনিক বিপদের কথা বলেছেন, তারই বিচার করব।

৯

জর্মানি ও রুশিয়ার এশিয়াটিক মনোভাবের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। মাসি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের যে পরিচয় দিয়েছেন, সংক্ষেপে তারই বিচার করা যাক। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয় আমারও নেই, মাসি-রও নেই। আমরা উভয়েই গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্যেই শিক্ষিত

হয়েছি। তবুও জিজ্ঞাসা করি, তিনি হিন্দু মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর মতামত কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন। ঋগ্‌বেদ থেকে, না, গান্ধীর কাছ থেকে, না, রোম্যাঁ রলাঁর বই পড়ে? তিনি যাঁর কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করুন, তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের যে বর্ণনা করেছেন তা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্তসার তো নয়ই, এমনকি তা ক্যারিকেচর পর্যন্ত নয়। এমন কথা আমি বলতে সাহসী হয়েছি, কারণ বুদ্ধের বাণী আমার কানে লেগে আছে। আমি ফ্রান্সের সেই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল দলের অন্যতম, যাদের অন্তরে বুদ্ধবচন বিশেষ করে ঘা দেয়। মাসি আরও বলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর সে রস নেই, যে রস বিশ্বমানবের মন সরস করতে পারে। আমরা দেশসুদ্ধ লোক যে হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু-সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন, তার জন্য দায়ী ইউরোপের ওরিয়েন্টালিস্টরা। এই ওরিয়েন্টালিস্টদের দল দার্শনিকও নয়, আর্টিস্টও নয়; তাঁরা প্রায় সকলেই ফিললজিস্ট মাত্র। কাজেই এইসব পণ্ডিতের লেখা তাঁদের সমব্যবসায়ী পণ্ডিতের দলেরই পাঠ্য। আর এঁরা যখন ফিললজি ছেড়ে হিন্দুসভ্যতার ব্যাখ্যান শুরু করেন তখনই ধরা পড়ে যে, কোনো বড় জিনিস এঁদের ধারণার বহির্ভূত। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের একজন বড় ওরিয়েন্টালিস্ট, সিলভ্যাঁ লেভির কথা ধরা যাক। লেভি বলেছেন যে, হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসাহিত্যের ভারতবর্ষের বাইরে কোনো সার্থকতা নেই। তার ভিতর এমন কিছুই নেই যা সকল দেশের সর্বকালের মানুষের মনকে উন্নত করতে ও আনন্দ দান করতে পারে; যেমন পারে গ্রীক সাহিত্য। আমি জিজ্ঞাসা করি, এসব কথার কি কোনো অর্থ আছে? হোমারের ইলিয়ড যদি সকলের মনের জিনিস হয়, তবে বাল্মীকির রামায়ণই-বা তা হবে না কেন। রামায়ণ যে কাব্য হিসাবে সত্য-সত্যই একটি মহাকাব্য, তা উক্ত কাব্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না; অবশ্য কাব্য কাকে বলে সে সম্বন্ধে যদি তাঁর কোনোরূপ ধারণা থাকে। আমরা যে ইলিয়ডের এতদূর ভক্ত, তার কারণ ছেলেবেলা থেকে আমরা তা পড়তে বাধ্য হয়েছি। হোমার পড়া আমাদের কলেজি শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। আর রামায়ণের উপর আমাদের যে কোনোরূপ ভক্তি নেই, তার কারণ রামায়ণ আমাদের কেউ পড়ায় নি, আমরাও অধিকাংশ লোক তা পড়ি নি। গ্রীক সাহিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, কেননা সে সাহিত্য আমরা জানি; আর ছেলেবেলা থেকে সে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের গুরুরা আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাসি যে সিলভ্যাঁ

লেভির মত ওরিয়েন্টালিস্টদের কথায় আস্থাস্থাপন করে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিচার করেছেন, তাতেই তিনি তার উপর অবিচার করতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রীক মন উদার আর হিন্দু মন সংকীর্ণ, এমন কথা বলায় ইউরোপীয় মনের উদারতা নয়, সংকীর্ণতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

১০

এখন হিন্দুদর্শনের কথা যাক। মাসি-র বিশ্বাস যে, ইদং এবং অহং -এর অভেদজ্ঞানের নিরাকার ভিতের উপরেই হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এত বড় একটা মেটাফিজিক্সের মতবাদ যে ভারতবর্ষে সর্বলোকসামান্য, এ কথা মানা কঠিন; কারণ অধিকাংশ লোক দ্বৈতবাদ কিংবা অদ্বৈতবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করে তার পর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে আরম্ভ করে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, পৃথিবীর অপর দেশেও যেমন ভারতবর্ষেও তেমনি মেটাফিজিক্সের সমস্যা আছে শুধু মেটাফিজিশিয়ান্‌দের কাছে। অন্যান্য দেশেরও যেমন, সে দেশেরও তেমনি সভ্যতা গড়ে উঠেছে বহুবিধ মানব-মনোভাবের উপর। যে ধর্মমতকে মাসি ইউরোপীয়দের একচেটে মনে করেন, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে তার সন্ধান মিলবে। এক দেশের লোক যে আগাগোড়া কর্মযোগী, আর অপর এক দেশের লোক যে আগাগোড়া জ্ঞানযোগী, এরকম রূপকথায় ছোট ছেলেরাই শুধু বিশ্বাস করে। আর যদি তাই হয় তো ইউরোপের জন্য মাসি-র কোনো ভয় নেই। ইউরোপের সব লোক— মায় কুলিমজুর পলিটিশিয়ান কলওয়ালা, সবাই— যে জ্ঞানযোগী হয়ে উঠবে, তার কোনো সম্ভাবনা নেই। বর্তমান ইউরোপ যে তার পূর্ব স্পিরিচুয়াল সভ্যতা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ তারা সব অতিমাত্রায় মেটিরিয়ালিজ্‌মের ভক্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং তারা যে আবার হিন্দু স্পিরিচুয়ালিটির বশবর্তী হবে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, সম্ভাবনা আছে শুধু আর-এক বিপদের। সে বিপদ এই যে, নবীন এশিয়ার লোক সব নকল ইউরোপীয়ান হয়ে উঠবে। আমাদের ব্যবহার দেখে ও আমাদের দত্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ ক'রে তারাও সব পলিটিক্স ও ইণ্ডাস্‌ট্রিয়ালিজ্‌মের মহাভক্ত হয়ে উঠবে, আর তখন বুদ্ধদেবের বাণী এশিয়ার কোনো লোক আর প্রচারও করবে না, কেউ তার প্রতি কর্ণপাতও করবে না। ইউরোপই এখন এশিয়ার মনকে বিপর্যস্ত করছে, এশিয়া বেচারা ইউরোপের মন ঘুলিয়ে দিচ্ছে না।

১১

ইউরোপে বুদ্ধদেবের বাণী মর্মস্পর্শ করেছে শুধু জনকতক সাহিত্যিকের ও আর্টিস্টের। এ জাত ইউরোপের সর্বনাশ করবে না, কারণ তাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে, তারা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নয়। ইউরোপের এ যুগের ভাগ্যনিয়ন্তা হচ্ছে নব বুদ্ধিপৌরুষহীন পলিটিশিয়ান ও কলকারখানার মালিক ; আর গুরু-পুরোহিত হচ্ছে সেই দলের লোকেরা যারা বিজ্ঞানদর্শনের বড় বড় কথার দোহাই দিয়ে মানুষের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। সুতরাং আমাদের মত সাহিত্যিক ও আর্টিস্টদের মনোভাবের কোনো প্রভাব এ সমাজের উপর হবে না।

বর্তমান ইউরোপ যে নীচাশয়তার পঙ্কে নিমগ্ন হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত্। এ পাঁক থেকে ইউরোপের মনকে কে টেনে তুলবে? মাসি-র বিশ্বাস রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ইউরোপের মন কামনার বিষে জর্জরিত, সুতরাং তার মন থেকে কামিনী-কাঞ্চনের উন্মত্ত কামনা দূর করতে না পারলে তাকে আবার সুস্থসবল করতে পারা যাবে না। মাসি-র বিশ্বাস এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে চার্চ, কারণ চার্চের মূলমন্ত্র হচ্ছে ত্যাগ (renunciation)। চার্চ যে আবহমান কাল ত্যাগের ধর্ম প্রচার করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা করেছে শুধু আংশিক ভাবে। চার্চের ত্যাগধর্মের ভিতর অনেকখানি বিষয়বুদ্ধির ভেজাল চিরকাল ছিল, আজও আছে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাত শুধু পূর্ণত্যাগধর্মের মহিমা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করেছে। বুদ্ধ মানুষের শুধু ঐহিক নয়, পারলৌকিক অভ্যুদয়ের বাসনাকেও নির্মূল করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন ; হিন্দুদার্শনিকরাও তাই করেছেন। বুদ্ধের বাণী যদি ইউরোপীয় সামাজিক লোকের মনে বসে, তা হলে তারা বৌদ্ধ হবে না, হবে শুধু মাসি-র আদর্শ খৃস্টান। ইউরোপের মনকে যদি বৌদ্ধধর্মের বরফ-জলে নাইয়ে তোলা যায় তা হলে সে মন আবার সুস্থ সবল ও সুন্দর হবে।

১২

আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দুটি ফরাসি সাহিত্যিকের পূর্বপশ্চিম সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করলুম। পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, এঁরা কেউ নির্বোধ নন। শুধু মাসি হচ্ছেন বীরপ্রকৃতির লেখক, আর ঝালু শান্তপ্রকৃতির।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, মাসি-র ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, আর ঝালুর ভয়ই সকারণ। বর্তমান ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের ছোপ লাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা— এ কথা ইউরোপের কানে ঢুকবে না। বর্তমান ইউরোপের মেটিরিয়ালিজম্ই নবীন এশিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কারণ এ মেটিরিয়ালিজ্ম্ দার্শনিক মেটিরিয়ালিজ্ম্ নয়, ব্যাবহারিক মেটিরিয়ালিজ্ম্। এ মেটিরিয়ালিজ্ম্ সাংখ্যদর্শনের 'প্রধানবাদ' নয়, চার্বাকদর্শনের প্রধান কথা; এবং চার্বাকের মতে

নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাদেব পুরুষার্থে ী

এ নীতির মানে পলিটিক্স এবং ইকনমিক্স। আর এ মত যে সর্বলোকসামান্য, তা প্রাচীন হিন্দুরা জানতেন; এ মতকে তাঁরা 'লোকায়ত' বলেছেন।

১৩৩৪ আষাঢ়

ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি[১]

ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি, এ প্রশ্ন আজকাল ইউরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের কোনো জহরীর মনে কোনো রূপ দ্বিধা আছে। অবশ্য ইউরোপীয় বিশেষণটি বাদ দিয়ে সভ্যতা বস্তুটি যে কি, সে প্রশ্ন সে দেশের কোনো লোকের মনে উদয় হয় না। এর কারণ বোধ হয় এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যার নাম ইউরোপীয় সভ্যতা, তার নামই সভ্যতা; আর যার নাম সভ্যতা, তার নামই ইউরোপীয় সভ্যতা। এ ধারণা যাদের মজ্জাগত, তাদের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠে কেন।

ইউরোপের গত যুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। ইউরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল; সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করবে। ফলে সকল জাতিকে একদল-বদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিশিয়ানরা করছেন। পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ দূর না করতে পারলে যে সকলের স্বার্থরক্ষা করা যাবে না, এ ধারণা অনেকের মনে জন্মেছে।

কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্যস্থাপন না করতে পারলে ইউরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধরে-বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানির পিরীত করানো যাবে না, এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে। ফলে স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী ও মহদাশয় ব্যক্তিরা ইউরোপের প্রতি তাঁদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, ইউরোপীয়েরা আসলে সকলেই মনে ও চরিত্রে এক; যেসব বিষয়ে তাদের প্রভেদ আছে সেসব সভ্যতার অঙ্গও নয়, ফলও নয়। তাঁরা নিজে যা আবিষ্কার করেছেন সেই সত্যটি পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলেই তাঁদের মতে ইউরোপের বাঘে-বক্‌রিতে এক ঘাটে জল খাবে। আর গতযুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে মহা সুফল ঘটেছে

---

১ *What is European Civilization*, by Wilhelm Haas, Professor of the Technological College, Charlottenburg, and Lecturer of the Deutsche Hochschule *für* Politik.

এই যে, ইউরোপীয় মনের মূলগত ঐক্যের প্রতি সকল জাতির চোখ এখন ফোট'-ফোট' করছে।

২

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জর্মান পণ্ডিতের মত শোনা যাক। ডক্টর হাস্ Haas ইউরোপের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং সেইসঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ, তিনি জাতিতে জর্মান। যে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হয় সেই যেমন শংকরের অংশ-অবতার, তেমনি যে জর্মানিতে ভূমিষ্ঠ হয় সেও কান্টএর অংশ-অবতার। ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া যেমন সহজ, জর্মানদের পক্ষেও, ধরে নেওয়া যেতে পারে, দার্শনিক হওয়া তেমনি সহজ। একাধারে যিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' তখন মীমাংসকেরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ? ব্রহ্ম যদি থাকেন তো এত বড় সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই ? দ্বিতীয়তঃ, এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি ? মানুষের কর্মজীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি ?

এ যুগেও তেমনি ইউরোপের কর্মীর দল 'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি' এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোনো বস্তু থাকে তো সেই প্রকাণ্ড জলজ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ ? আর তার গূঢ় মর্ম জেনেই-বা কার কি লাভ ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে ?

আর যদি জনসাধারণের কথা বল তো এ জ্ঞান লাভ করায় তাদের কি লাভ ? তারা তো ইউরোপীয় সভ্যতার ফলভোগী মাত্র। হিন্দুস্থানীরা বলে, 'আম খাও, পেঁড় মত খোঁজ' ; উক্ত উপদেশ অনুসারে তাদের ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ জানবার ও মূল অনুসন্ধান করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। 'যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও' বলেই নিশ্চিন্ত থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব জিজ্ঞাসা যে নিষ্ফল, এ আপত্তি চারি ধার থেকে উঠবে। এ আপত্তির খণ্ডন না ক'রে কোনো দার্শনিক অগ্রসর হতে পারেন না। সেকালে শংকরও পারেন নি, একালে হাস্‌ও পারেন নি।

৩

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *für* Politikএর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক। ইউরোপীয়েরা যে প্রকৃতপক্ষে এক জাতি, এ বিষয়ে ইউরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে—

Europe has reached a turning-point in its history and that it must collect its forces for a decisive struggle against Asia or other important enemies.

অর্থাৎ জ্ঞাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে ইউরোপের বর্তমানে কর্তব্য হচ্ছে তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এশিয়া। কারণ, other important enemies যে কারা, সে কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

যেমন উক্ত জর্মান পণ্ডিতের মতে সমগ্র ইউরোপ একমন একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস সমগ্র এশিয়াবাসিরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব জর্মান কাইজরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এশিয়াবাসীরা যে ইউরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনো বাহ্যপ্রমাণ নেই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে যে-এশিয়া মারবে সে-এশিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।

এসব কথা শুনে মনে হয়, এশিয়ার উপর ইউরোপের যে বর্তমান আধিপত্য আছে, ভবিষ্যতে তা নষ্ট হতে পারে। এই ভয়েই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় আকুল হয়েছেন। এশিয়ার অভ্যুদয় হলেই যে ইউরোপ অধঃপাতে যাবে, এই বোধ হয় জর্মান দর্শনের স্থিরসিদ্ধান্ত। আমার ছেলে বাড়লেই যে তোমার ছেলে বামন হবে, এ সত্য কোন্ লজিকের হাতে ধরা পড়ে তা আমার অবিদিত। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকরা যাকে কন্‌জার্ভেশন অব এনার্জি বলেন, তারই যোগবিয়োগের নিয়মানুসারে।

কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকীস্বত্ব বজায় রাখতে হয় তো ইউরোপীয়দের

দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে লীগ অব নেশন্‌স্‌, ডিসআর্মামেণ্ট, ইকনমিক কনফারেন্সেস, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা-যে মনে এক, তা প্রমাণ না করতে পারলে তাদের জীবনে এক করা যাবে না। অতএব ইউরোপীয় মনের মূল ঐক্যের সন্ধান নিতে হবে।

৪

ইউরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায় তার সন্ধান নিতে হলে প্রথমেই জানা দরকার, ইউরোপ বলতে কি বোঝায়। তাই অধ্যাপক হাস্‌ প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন, What is Europe।

তাঁর মতে ইউরোপের অর্থ একটি বিশেষ ভূভাগ নয় ; কেননা, পুরাকালে ভৌগোলিক হিসেবে ইউরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক-না কেন, বর্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্ততঃ থাকবে না। কারণ—

Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance.

এ সত্যটি ইউরোপীয়দের স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক ছিল। কারণ, গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, ইউরোপীয়দের মাহাত্ম্যের মূলে আছে ইউরোপের মাটি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন যে, 'বিলেত-দেশটা মাটির'। ও-কথা শুনে আমরা হেসে কুটি-কুটি হয়েছিলুম, কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, বিলেত-দেশটা মাটির হলেও যে-সে মাটির নয়, একেবারে বিলেতি মাটির। অতএব তা নির্গুণ নয়, সগুণ। আমরাও দেখতে পাই যে, ন্যাংড়া-আমের আঁঠি বাংলায় পুঁতলে সে আঁঠির গাছে আম ফলে না, ফলে আমড়া। মাটির গুণের ভক্ত হবার জন্য বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, কবি হলেই আমরা ভক্তি-গদগদকণ্ঠে 'আমার দেশ' বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি। অনেক ছেলেমি কথা পাকামি করে বললেই যে তার নাম হয় বৈজ্ঞানিকদর্শন তার পরিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শাস্ত্রে দেদার মেলে। সুতরাং ইউরোপের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, একমাত্র মাটির উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক হাস্‌ যে ঠিক কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না।

দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত। তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদলে গেছে, তা নয়— অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোনো অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুনছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায় নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায় নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের ফিজিকাল ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই তাদের ভিতর সাইকলজিকাল ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় অধ্যাপকমহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের decisive struggleএর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

৫

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাংলা মাটি শব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি। আর বছর পঞ্চাশেক আগে আমি যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সেকালের B. A. M. A.রা ভক্তিভরে Buckle's *History of Civilization* পড়তেন; আর সেই পুস্তকেই, শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।

তার পর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিয়োগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয় তা হলে রেড্-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বর্তমান আমেরিকানদের সভ্যতার অর্থাৎ কৃতিত্বের আকাশপাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার অন্তরে soil নয়, race; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন।

এই বস্তাপচা বিচার এথ্‌নলজি অ্যান্‌থ্রপলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে নববিজ্ঞানরূপে পরিচিত হল। এই নববৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে এরিয়ান্ নামে এক দেবজাতি আছে। সেই জাতিই মানব-সভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়বে। কারণ, progress করা তাদের জাতিধর্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তরজর্মানিতে। মানুষের মধ্যে ইউরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্য-শোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে। তাই অধ্যাপক হাস্ বলেছেন—

It is true that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India.

বোধ হয় এই কারণে যে, ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে তাদের রক্তের নীল রং ঝলসে গিয়েছে ও লাল গোলাপি হয়েছে।

অতএব ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

৬

ইউরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম ইউরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, ইউরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিয়োগ্রাফি করে না, করে হিস্টরি ; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে—

It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us.

এর পরই অধ্যাপকমহাশয় প্রশ্ন করেছেন—

Europe, its spirit, its civilization, is something unique.

এ হেন কথা কি সত্য।

তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিকরা, যথা ভল্টেয়ার্ রুসো প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র, এবং পিকিং থেকে প্যারিস পর্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানবগোত্র। এ মত যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আজকের দিনে—

Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own.

অর্থাৎ মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ-বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও অনেক অংশে প্রভেদ আছে। আর এই ভেদজ্ঞানটুকু উপেক্ষা ক'রে সাধারণ মানবচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা

যায়, সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। আর আমরা যাকে মানবসভ্যতা বলি, তা কোনো একটি বিশেষ জাতির মানসিক বিশিষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব বলে কোনো এক শ্রেণীর জন্তু নেই।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে what is the specifically European element -এরই অনুসন্ধান করতে হবে; এবং তার সন্ধান আমরা পাব, যদি আমরা ধরতে পারি—

What is common to their culture, despite all national differences, without its being a characteristic of mankind in general.

সংক্ষেপে, কোন্ গুণে সকল ইউরোপীয় এক, এবং অন্-ইউরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক্, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক।

৭

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল যদি ইউরোপ নামক দেশের অন্তরেও না পাওয়া যায়, ইউরোপীয় মানবের দেহের অন্তরেও না পাওয়া যায়, তা হলে সে মূল কোথায় নিহিত? অধ্যাপকমহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা ইউরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় যাকে স্পিরিট বলে, তার বাংলা কি সংস্কৃত প্রতিবাক্য আমি জানি নে। কারণ, আত্মা ও স্পিরিট পর্যায়শব্দ নয়। স্পিরিটকে আত্মা বলা বোধ হয় ঠিক নয়, অহং বলাই উচিত। কারণ, অহং জিনিসটে ভেদবুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ প্রবন্ধে আমি ইউরোপীয়ান স্পিরিটকে ইউরোপীয় আত্মা বলব; কিন্তু সে আত্মাকে অহং অর্থেই বুঝতে হবে।

ইউরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।

এখন এ সত্যটি যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি স্পষ্ট যে, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে টেক্‌নিকাল সিভিলাইজেশন্ অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল্ সায়েন্স্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হচ্ছে আসলে ব্যাবহারিক সভ্যতা। প্রকৃতির যে মতিগতি সায়েন্স আবিষ্কার করেছে, সেই মতিগতিকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে নিয়োগ করা, এক কথায় প্রকৃতিকে মানুষের সেবাদাসীতে পরিণত করাই ইউরোপীয়দের চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু কোনো নায়িকাকে বশ করা যে কেবলমাত্র কামনাসাপেক্ষ নয়, এ

কথা সেকেলে তান্ত্রিকরাও জানতেন। বশীকরণের পিছনে মন্ত্র থাকা চাই। প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। ইউরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। বিজ্ঞানের কঠোর সাধনার ফলে ইউরোপীয়রা সমগ্র অনাত্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু ইউরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসীগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি, করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে— অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা। জ্ঞানই তাদের মুখ্য বস্তু ছিল, কর্ম তার ফল মাত্র। বিজ্ঞানের আচার্যেরা কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং তা ছিলেন বলেই এ বিদ্যা তাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কথা সত্য এবং আমার বিশ্বাস, অধ্যাপকমহাশয় যদি ফলনিরপেক্ষ হয়ে ইউরোপ সভ্যতা বস্তু কি জিজ্ঞাসা করতেন, তা হলে তিনিও তার সন্ধান পেতেন।

৮

তিনি বলেন যে, এই সূত্রেই আমরা ইউরোপীয় আত্মার বিশেষত্বের সন্ধান পাই। ইউরোপীয় আত্মার ধর্মই এই যে—

to organize everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity.

অর্থাৎ বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার শক্তি। এককথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organize করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে ইউরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব। কেপ্‌ল্যর Kepler আবিষ্কার করেছিলেন যে—

Wherever there was matter, there was geometry.

তার পর গ্যালিলিয়ো আবিষ্কার করেন যে—

The book of nature is written in the language of mathematics.

এবং এ দুটি কথাই হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। এবং এই মন্ত্রের সাধনা করেই ইউরোপ জড়প্রকৃতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এই জন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্‌ভাবন করে; তার

পর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্‌ভাবন করে রোমানরা। তার পর মধ্যযুগে ইউরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্তমান technical civilizationএর সৃষ্টি করেছে। অতএব ইউরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্‌গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে; এবং বর্তমানে ইউরোপের পক্ককষায় মন থেকেই টেক্‌নিকাল সিভিলাইজেশন উদ্‌ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে ইউরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই ইউরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, তবে প্রলয়ের আশঙ্কার কারণ কি?

৯

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসি লেখকের মতামত শোনা যাক। ল্যুসিআঁ রোমিয়ে Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য নন, তিনি একজন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র; সুতরাং পূর্বোক্ত জর্মান অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা ফরাসি সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশি সহজ-বোধ্য। জড়ানো হাতের লেখার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের যে প্রভেদ, জর্মান পাণ্ডিত্যের রচনার সঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের রচনার সচরাচর সেই একই প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি, সে বিষয়ে ফরাসি মত সত্য হোক মিথ্যা হোক, জর্মান পণ্ডিতের মতের চাইতে অনেক সুবোধ; এবং সম্ভবতঃ সুবোধ বলেই রমিয়ে-র *Nation et Civilization* ইংলণ্ডের যে সম্প্রদায় লেখাপড়ার কারবার করেন, সে সম্প্রদায়ের মনকে বেশি করে স্পর্শ করেছে।

রোমিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন, qu'est-ce quel' Europe? অর্থাৎ ইউরোপ বস্তু কি? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্বমানবের কাছে ইউরোপের নামডাক অসম্ভব-রকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং ইউরোপ বলতে কি বোঝায়, তা বুঝতে হলে ইউরোপের জিয়োগ্রাফির এবং ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, উপরন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম উদ্‌ঘাটিত করতে হলে ইউরোপ নামক ভূভাগ ও তার অধিবাসিদের raceএর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, ইউরোপ নামক দেশটা যে তার অধিবাসীদের অনেক পরিমাণে গ'ড়ে তুলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধনী হবার, শক্তিমান হবার যতটা সুযোগ ইউরোপের অধিবাসীরা তাদের দেশের কাছ থেকে পেয়েছে, পৃথিবীর অন্য জাতিরা ততটা পায় নি; ইউরোপের সৌভাগ্য যে সে কতক অংশে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা অস্বীকার করা মূর্খতা।

১০

কিন্তু ইউরোপের মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন ইউরোপের যথার্থ সিভিলাইজেশন নয়। যাঁরা মনে করেন, ইউরোপের ঐশ্বর্যই তার সভ্যতার চরম ফল তাঁদের বলা দরকার যে, যদিও তাই হয় তা হলে ভবিষ্যতে তাঁদের ঐশ্বর্য দিন দিন বৃদ্ধি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতীতে যেসব কারণে ও যেসব উপকরণের সাহায্যে ইউরোপ তার বর্তমান ধনদৌলত লাভ করেছ, সে-সব কারণ যে ভবিষ্যতেও তার সহায় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে এক্‌স্‌প্লয়েট করতে শিখেছে, এবং করছে; এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে ইউরোপের মত সমান কৃতকার্য হবে। অর্থাৎ মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশনে ইউরোপ অপর সকল দেশের উপর চিরকাল টেক্কা দিতে পারবে না। যাকে বলে টেক্‌নিকাল বিদ্যা তা বিশ্বমানবের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং টেকনিকাল সিভিলাইজেশনই যদি ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন হয়, তা হলে সে সিভিলাইজেশনের ইউরোপীয় নামের কোনো সার্থকতা থাকবে না।

সত্য কথা এই যে, ইউরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিস্টরি, জিয়োগ্রাফি নয়; অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়; আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ 'moral and intellectual tradition'। সেই ভিত্তির উপরই ইউরোপীয় সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে, এবং সেই ভিত আলগা হলেই ইউরোপীয় সভ্যতা ভেঙে পড়বে। এই ভিত্তির গোড়া আলগা হয়েছে বলেই ইউরোপ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতা যাঁরা রক্ষা করতে চান তাঁদের

জানা উচিত ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি। কারণ ইউরোপে তথাকথিত মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন যাঁরা যথার্থ সিভিলাইজেশন ব'লে ভুল করেন তাঁরাই ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফল মাত্র, তার মূল নয়।

১১

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃস্টধর্ম— এই তিনে মিলে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে।

গ্রীক জাতি বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করে গিয়েছেন; রোমান জাতি সমাজরক্ষার ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করে গিয়েছেন। খৃস্টধর্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধরে প্রচার করেছে।

খৃস্টধর্মের আইডিয়ালিজ্‌ম্, গ্রীক রিয়ালিজ্‌ম্ ও রোমান লিগ্যালিজ্‌ম্ -এর মিলনের ফলে ইউরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু রেনেসাঁর যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃস্ট নীতি ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্ হতে শুরু করে। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যালান্স ভঙ্গ হয়। ব্যালান্স যে ভঙ্গ হয়েছে, এ সত্য অনেক দিন আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। শেষটা পলিটিকাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ যখন ইউরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃস্ট ধর্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে ইউরোপীয়েরা এখন আর একটা বড় সভ্যতার প্রতিনিধি বলে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য। তারা আজকের দিনে স্বার্থসাধন করতে অতিশয় পটু; কিন্তু এ নিপুণতা এ পটুতার অন্তরে কোনোরূপ বিশেষ সভ্য মনোভাব নেই। কারণ, এ জাতীয় কর্মকৌশল পৃথিবীর অপর সকল জাতিই আত্মসাৎ করতে পারে, সেইসঙ্গে ইউরোপের ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌মের ধর্মেও অনুপ্রাণিত হতে পারে। আর যখন পলিটিকাল ন্যাশনালিজ্‌ম্ এবং ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ -এর মূলমন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যেসব জাতিকে ইউরোপ এই নব মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সেসব জাতি ইউরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার

জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে ইউরোপের তথাকথিত নবসভ্যতার কর্মফল।

১২

এখন দেখা গেল যে, জর্মান বৈজ্ঞানিক ও ফরাসি সাহিত্যিক উভয়েই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে; অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তার পর ইউরোপীয় সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃস্টধর্ম— এ তিনের সমবায়ে গড়ে উঠেছে, এ বিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্মান অধ্যাপকের মতে টেক্‌নিকাল সিভিলাইজেশন হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি; ফরাসি লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ, সভ্যতার যা প্রাণ— অর্থাৎ intellectual and moral tradition— বর্তমান ইউরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন ইউরোপে রোমান রাজনীতিই প্রভুত্ব করছে। বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব করাই এ যুগে ইউরোপের একমাত্র মনোভাব। এ মনোভাব সভ্য মনোভাব নয়, এবং এই মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারে নি বলেই রোমান সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়েছে।

জাতিতে জাতিতে যে মনের ও চরিত্রের প্রভেদ আছে সে কথা ফরাসি লেখকও মানেন, এবং স্বধর্মপালন করেই জাতি যে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, এই তাঁর দৃঢ় ধারণা; সুতরাং তিনিও ন্যাশনালিজ্‌মের মহাভক্ত। কিন্তু যে ন্যাশনালিজ্‌ম্ অপর ন্যাশনালিজ্‌মের হন্তারক সে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌কে তিনি পলিটিকাল ন্যাশনালিজ্‌ম্ বলেন। কারণ, এ ন্যাশনালিজ্‌ম্ intellect ও morals -এর ধার ধারে না; অতএব হিংস্র হতে বাধ্য।

এখন ইউরোপীয় সভ্যতা কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে? ফরাসি লেখক বলেন যে, ইউরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্মজ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে তা হলেই ইউরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়। কিন্তু তা করবে কে?

জর্মান পণ্ডিতের মতে যদিও ইউরোপীয় সভ্যতা তার চরমপদ লাভ করেছে তবুও তার আরও উন্নতির অবসর আছে। এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা ক'টি উদ্‌ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

If it is true that it has passed through all spheres of being and accomplished all tasks, it will begin the cycle a second time, and

enriched by the experience and success of the first cycle, will be able to attain new heights. Perhaps the time is not far off when, following the example of the Greeks, it will once more find its chief aim in the shaping of man. Let us hope so. For it has become very necessary.

আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ তৈরি করা কি সভ্যতার শেষ কথা না প্রথম কথা? আগে মানবসভ্যতা গ'ড়ে তার পর মানুষ গড়া, গাড়ির লেজে ঘোড়া জোতার মত বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয় কি?

১৩

ইউরোপীয় সভ্যতা-যে কালে ভেঙে পড়বে এ ভয় আমরা পাই নে। কারণ, যে গুণে ইউরোপ সভ্য সে গুণের ধ্বংস নেই। জর্মান অধ্যাপক ও ফরাসি সাহিত্যিক উভয়ের মতেই পুরাকালের গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান, রোমের কল্পিত ধর্মশাস্ত্র ও মধ্যযুগের ধর্মমনোভাবই ইউরোপীয় সভ্যতার মালমসলা। এককথায়, ইউরোপীয়দের মনই তাদের সভ্যতা গড়েছে।

গ্রীক সভ্যতা অনেক কাল হল ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্তু গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্য আজও মানুষকে সভ্য করছে।

রোমের সাম্রাজ্য সেকালে ইউরোপের অসভ্য জাতিদের এক ধাক্কায় সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল; কিন্তু আজও সমগ্র সভ্যজগৎ রোমের বিধিনিষেধ শাস্ত্র মেনেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।

মধ্যযুগের ধর্মপ্রাণ সভ্যতার বিষয় আমরা বেশি কিছু জানি নে, সুতরাং জর্মান ও ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের কথা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। মধ্যযুগের সভ্যতা জ্ঞানকর্মহীন ছিল। একমাত্র ভক্তির উপর কোনো সভ্যতাই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। ফলে, ইউরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হল; যেমন এ যুগে আমরা ইউরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি। তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ইউরোপীয় মানবের ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান মধ্যযুগের সৃষ্টি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। ইউরোপের নব ধর্ম ডিমোক্রাসির মূল গ্রীক-দর্শন নয়, নব বিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপর ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত সে মনোভাবের স্রষ্টা হচ্ছেন যিশুখৃস্ট।

এর থেকে দেখা যায় যে, কোনো জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যেই সত্যের সন্ধান পাক-না কেন, সে সত্য সর্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হল বিশ্বমানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হল, কিন্তু তার সাহায্যে ইউরোপের তির্যক্-সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা গড়ে তুললে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যা (থিয়োলজি) গড়ে উঠেছে আরিস্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খৃস্টসংঘ (চার্চ) গড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসংঘের অনুকরণে।

১৪

সভ্যতা বলতে অধিকাংশ লোকে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না, বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্। এবং যে সমাজে মানুষের এ দুটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, সে সমাজ কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। যাকে আমরা মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন বলি সে বস্তু হচ্ছে সকল সভ্যতার যুগপৎ আধার ও ফল। না খেয়ে-প'রে মানুষ যে বাঁচতে পারে না, এ কথা কে না জানে? আমাদের পূর্বপুরুষরাও উপবাসী হয়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে পারেন নি। এ হিসাবে ইউরোপের বর্তমান মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন অবজ্ঞার বস্তু নয়।

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যা সর্বলোকবিদিত—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

এই অর্থগত সভ্যতা গড়বার বিদ্যা গ্রীসেরও জানা ছিল না, রোমেরও জানা ছিল না। এ উভয় জাতিই পরস্ব অপহরণ করেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখতেন। গ্রীক সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল দাসের কর্মশক্তির উপর; আর রোমক সভ্যতা অপর দেশ লুঠতরাজের উপর। ফলে উভয় সভ্যতারই ভিত নেহাত কাঁচাই ছিল।

বর্তমান ইউরোপ যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জন করেছে। এ হিসাবে সায়েন্সকেই ইউরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন যেমন ও দুই সভ্যতার একচেটে জিনিস নয়— বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তেমনি মডার্ন সায়েন্সও বর্তমান ইউরোপের

একচেটে জিনিস নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে, এ বিষয়েও ইউরোপের বর্তমান প্রাধান্য আর থাকবে না। ইউরোপীয় অর্থে এশিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য ইউরোপের ভয় পাবার কোনো দরকার নেই। কোনো সভ্যসমাজকে অপর-কোনো সভ্যসমাজ বিনাশ করে নি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, ইউরোপ ও এশিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। ইউরোপের মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশনের মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, ইউরোপীয়েরা পরের খাটনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুঠে খাবে তা হলে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতই তার ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থায়—

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ

আদেশ মানলে তবেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।

কারণ, ধর্ম-আচরণের গুণ এই যে, তাতে লোকের অহংবুদ্ধি খর্ব করে। যে তিন পূর্বসভ্যতা ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা গড়ে তুলেছে, সে তিনই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে সে তিন কালচারই ইউরোপের অহংজ্ঞানকে পরিস্ফুট করেছে। এ বিষয়ে জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিকের কথা নিম্নে উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার স্পিরিট হচ্ছে অহংকার—

There is the pride of culture, like that of the ancient Greeks; our word 'barbarian', from their term for all aliens, still expresses the feeling.

There is the pride of religion, remnant of the mediæval perversion of Christianity, which transformed acceptance of the most inclusively loving and humble teacher earth has known, into a ground for arrogance. The tone in which 'pagan' and 'heathen' are often pronounced, tells the story.

There is the pride of political efficiency, inherited perhaps from Rome, causing us to despise those unpossessed of organized power.

Last to grow, perhaps, is the pride of scientific and mechanical achievement— that which impels a Westerner to identify sanitary plumbing and speedy communication with civilization.

এই মনের পাপই ইউরোপের প্রধান শত্রু ; এবং হাস্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

১৩৩৭ আষাঢ়

বিচিত্র

আমরা ও তোমরা

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত তা হলে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই, দুই হত না— এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, নাহয় শুধু তোমরা হতে।

২

আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

৩

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখ, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।

৪

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারি, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত করবার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাৎ, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম— এত সূক্ষ্ম যে, আছে কি না বোঝা

কঠিন; তোমাদের বুদ্ধি স্থূল— এত স্থূল যে, কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা; আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

৫

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

৬

তোমাদের মেয়ে প্রায়-পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায়-মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না, ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

৭

তোমাদের আগে ভালোবাসা পরে বিবাহ; আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষায় 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকারশাস্ত্রে।

৮

অর্থাৎ এককথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাই নে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না; তোমরা যা পাও আমরা তা পাই নে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা

একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য।

তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ির বাইরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতর। আমাদের গান আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক। কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য। তোমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়— তার শেষ নির্বাণ। পূর্বেই বলেছি, প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক্। আমরাও ভালো, তোমরাও ভালো— শুধু তোমাদের ভালো আমাদের মন্দ ও আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা, এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে— তাও অসম্ভব।

১৩০৯ শ্রাবণ

খেয়ালখাতা

শ্রীমতী ভারতী-সম্পাদিকা নূতন বৎসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটি খেয়ালখাতা খুলবেন। এই অভিপ্রায়ে যাঁরা লেখেন কিংবা লিখতে পারেন, কিংবা যাঁদের লেখা উচিত কিংবা লিখতে পারা উচিত— এমন অনেক লোকের কাছে দু-এক কলম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কোথায় আছি, তা জানি নে। তবুও ভারতী-সম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্তব্য বিবেচনায় দু-চার ছত্র রচনা করতে উদ্যত হয়েছি। ভারতী-সম্পাদিকা ভরসা দিয়েছেন যে, যা-খুশি লিখলেই হবে; কোনো বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিংবা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বলতে পারি নে, আমার তো ভরসার চাইতে ভয় বেশি হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়— বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হোক, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোনো কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনিসুতার মালার ফরমাশ দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতী-সম্পাদিকার ইচ্ছা, এই শেষোক্ত দলের একটু বকবার সুবিধে করে দেওয়া।

২

এ খেয়ালখাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন, তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি সিকি দুআনি কিছুই ফেরত যাবে না, শুধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না। কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই— তার উপর চকচকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে জিনিসটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতিপরিচিত বলে যা আর-কারও নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়ালখাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরনো চিন্তা, পুরনো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে— আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোনো ফল ধরে না তখন

বাজে-কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি। যখন আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করবার কোনো উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। আর এ কথা বলা বাহুল্য, যেখানে কেনাবেচার কোনো সম্বন্ধ নেই— ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের, সেস্থলে কোনো ভদ্রসন্তান মসিজীবী হলেও যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিংবা ঝুটো বলে জানেন, তা চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা কার্যজগতে যখন সাচ্চা হতে পারি নে, তখন আশা করা যায় কল্পনাজগতে অলীকতার চর্চা করব না। এই কারণেই বলছি, ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না।

৩

খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগৎসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে-গড়া জিনিস কষ্টসাধ্য বলেই এত সংকীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানাপ্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু সে ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়; কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অন্যে পরে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার খেই খুঁজে পাই নে। যা নিজে ধরতে পারি নে তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারি নে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।

৪

খেয়াল অভ্যাস করবার পূর্বে খেয়ালের রূপনির্ণয় করাটা আবশ্যক, কারণ স্বরূপ জানলে অনধিকারীরা এ বিষয়ের বৃথা চর্চা করবেন না। আমাদের

লিখিত-শাস্ত্রে খেয়ালের বড় উদাহরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং সংগীতশাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে। এককথায় বলতে গেলে, ধ্রুপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর শুদ্ধ শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভাবের অন্য অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্তি, সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই, যথা তান গিট্‌কিরি ইত্যাদি, তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দানি করুন-না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের আধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও অলংকার -বিন্যাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফেলা নয়। খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মত সরল নয় বলে মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়, নর্তকীর মত বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক-না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না ; তার গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘু হলেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। যাঁর মন সিধে পথ ভিন্ন চলতে জানে না, যাঁর কল্পনা আপনা হতেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজবশে রাখতে পারেন না— তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময়ে ব্যর্থ হলেও কখনোই ক্ষতিকর নয়, কিন্তু স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম করবার চেষ্টায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোকমাত্রেই উপরোক্ত কথা-ক'টির সার্থকতা বুঝতে পারবেন।

৫

আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী— যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি। এ সম্বন্ধে কৈফিয়তস্বরূপে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি -বিশেষ যখন অবস্থা-বিপর্যয়ে সকল অধিকার হতে বিচ্যুত হয় তখন তার দুটি অধিকার অবশিষ্ট থাকে— কাঁদবার ও হাসবার। আমরা আমাদের সেই কাঁদবার অধিকার

ষোলোআনা বুঝে নিয়েছি এবং নিত্য কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কাঁদতে পেলে যত খুশি থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকি নে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতির মধ্যে যাঁরা স্থানে-অস্থানে, এমনকি অরণ্যে পর্যন্ত, রোদন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান ও প্রধান লোক বলে গণ্য এবং মান্য। যেখানে ফোঁস করা উচিত সেখানে ফোঁস-ফোঁস করলেই আমরা বলিহারি যাই। আমাদের এই কান্না দেখে কারও মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নূতন সভ্যযুগের অপূর্ব সৃষ্টি ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস অপর সদ্যজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না শুরু করে দিলে। আর যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে তবুও বৎসরের তিন শ বাষট্টি দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে তার পর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে কোকিয়ে কান্না সমান চলছে। যদি কেউ বলে, ছি, অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না।— তা হলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে ওঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুকু উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হলে কারও মায়া হয় না। কিন্তু কান্না-ব্যাপারটাকে একটা কর্তব্যকর্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গৃহকর্ম করে বিকেলে গা-ধুয়ে চুল-বেঁধে পা-ছড়িয়ে যখন পুরাতন মাতৃবিয়োগের জন্য নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে থাকি তখন পৃথিবীর পুরুষমানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে, কান্না-ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না, ফুঁপিয়ে কান্না, ফুলেফুলে কান্না ইত্যাদি ; কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে-কান্না। এবং এ কথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে, সদারঙ্গ বলে গেছেন— খেয়ালে সব সুর লাগে, শুধু নাকী সুর লাগে না। এইসব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁত্‌সেঁতে হয়ে উঠেছে ; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই দুর্দিনে হাসি কি শোভা পায়। তার উত্তর, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও কি বিদ্যুৎ দেখা দেয় না কিংবা শোভা পায় না। আমাদের এই অবিরতধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ-কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।

১৩১২ বৈশাখ

মলাট-সমালোচনা

'সাহিত্য'-সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি' -জিনিসটা এ দেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাত বইয়ের তেরো পাত সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক কি এক হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন। সেকালে যখন সূত্র-আকারে মূল গ্রন্থ রচনা করবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন ভাষ্যে-টীকায়-কারিকায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে যখন, যে কথা দু কথায় বলা যায় তাই দু শ কথায় লেখা হয়, তখন সমালোচকদের ভাষ্যকার না হয়ে সূত্রকার হওয়াই সংগত। তাঁরা যদি কোনো নব্যগ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন তা হলেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ঐরূপ করতে গেলে তাঁদের ব্যাবসা মারা যায়। সুতরাং তাঁরা যে সমালোচনার রীতিপরিবর্তন করবেন এরূপ আশা করা নিষ্ফল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুক্তির প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার ঠিক মনে নেই যে, তিনি সাহিত্যেও অত্যুক্তি যে নিন্দনীয় এ কথাটা বলেছেন কি না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রবাবুর সেই তীব্র প্রতিবাদে বিশেষ কোনো সুফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং দেখতে পাই যে, অত্যুক্তির মাত্রা ক্রমে সপ্তমে চড়ে গেছে। সমালোচকদের অত্যুক্তিটা প্রায় প্রশংসা করবার সময়েই দেখা যায়। বোধ হয় তাঁদের বিশ্বাস যে, নিন্দা-জিনিসটা সোজা কথাতেই করা চলে কিন্তু প্রশংসাকে ডালপালা দিয়ে পত্রে-পুষ্পে সাজিয়ে বার করা উচিত। কেননা, নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটুকারের মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু আসলে অতিনিন্দা এবং অতিপ্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য। কারণ, অত্যুক্তির 'অতি' শুধু সুরুচি এবং ভদ্রতা নয়, সত্যেরও সীমা অতিক্রম করে যায়। এককথায়, অত্যুক্তি মিথ্যোক্তি। মিছাকথা মানুষে বিনা কারণে বলে না। হয় ভয়ে নাহয় কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে। সম্ভবতঃ অভ্যাসবশতঃ মিথ্যাকে সত্যের অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় কেউ-কেউ চর্চা করে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলা চর্চা

করলে ক্রমে তা উদ্দেশ্যবিহীন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাংলা সাহিত্যে আজকাল যেরূপ নির্লজ্জ অতিপ্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে, তার মূলে উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই জিনিসই আছে। এক-একটি ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তকের যেসকল বিশেষণে স্তুতিবাদ করা হয়ে থাকে সেগুলি বোধ হয় শেক্‌স্‌পীয়র কিংবা কালিদাসের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশি হয়ে পড়ে। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে বইয়ের ভালোরকম কাটতি হয় সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হয়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেন্ট ঔষধ বিক্রি করা হয় সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে একই কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দেব— এইরকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে এ কথা সহজেই মনে উদয় হয়। এই কারণেই পেটেন্ট ঔষধের মতই একালের ছোটগল্প কিংবা ছোটকবিতার বই মেধা হ্রী ধী শ্রী প্রভৃতির বর্ধক এবং নৈতিক বলকারক বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পাঠক নিত্যই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হয়। যা চ্যবনপ্রাশ বলে কিনে আনা হয় তা দেখা যায় প্রায়ই অকালকুষ্মাণ্ডখণ্ডমাত্র।

অতিবিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম। কারণ, মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত। যখন আমাদের একমাথা চুল থাকে তখন আমরা কেশবর্ধক তৈলের বড়-একটা সন্ধান রাখি নে। কিন্তু মাথায় যখন টাক চক্‌চক করে ওঠে তখনই আমরা কুন্তলবৃষ্যের শরণ গ্রহণ করে নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পাই এবং দিই। কারণ, তাতে টাকের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় এবং সেইসঙ্গে টাকাও নষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষণ করা। বিজ্ঞাপন প্রতি ছত্রের শেষে প্রশ্ন করে— 'মনোযোগ করেছেন তো ?' আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলেও বিজ্ঞাপন চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে থাকে। ও জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবার জো নেই। কারণ, এ যুগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রবন্ধের গা ঘেঁষে থাকে, মাসিকপত্রিকায় শিরোভূষণ হয়ে দেখা দেয় ; এককথায় সাহিত্যজগতে যেখানেই একটু ফাঁক দেখে সেইখানেই এসে জুড়ে বসে। ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবচন

আছে যে, প্রাচীরের কান আছে। এ দেশে সে বধির কি না জানি নে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দৌলতে মূক নয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর মিথ্যা কথা তারস্বরে চীৎকার করে বলে। তাই আজকাল পৃথিবীতে চোখকান না বুজে চললে বিজ্ঞাপন কারও ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে না। যদি চোখকান বুজে চল, তা হলেও বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, পদব্রজেই চল আর গাড়িতেই যাও, রাস্তার লোকে তোমাকে বিজ্ঞাপন ছুঁড়ে মারে। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কথা নেই; ছুঁড়ে মারাই বিজ্ঞাপনের ধর্ম। তার রং ছুঁড়ে মারে, তার ভাষা ছুঁড়ে মারে, তার ভাব ছুঁড়ে মারে। সুতরাং বিজ্ঞাপিত জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাকলেও তার মোড়কের সঙ্গে এবং মলাটের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমি বহু ঔষধের এবং বহু গ্রন্থের কেবলমাত্র মুখ চিনি ও নাম জানি। যা জানি, তারই সমালোচনা করা সম্ভব। সুতরাং আমি মলাটের সমালোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। অন্ততঃ মুখপাতটুকু দোরস্ত করে দিতে পারলে আপাততঃ বঙ্গসাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, নব্যবঙ্গসাহিত্যের কেবলমাত্র নাম-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রধানতঃ সেই নাম-জিনিসটার সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপ-জিনিসটে একেবারে ছেঁটে দেওয়া চলে না বলে সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলতে চাই। ডাক্তারখানার আলো যেমন লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানারূপ কাঁচের আবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তেমনই পুস্তকের দোকানে একালের পুস্তক-পুস্তিকাগুলি নানারূপ বর্ণচ্ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। সুতরাং নব্যসাহিত্যের বর্ণপরিচয় যে আমার হয় নি, এ কথা বলতে পারি নে। কবিতা আজকাল গোধূলিতে গা-ঢাকা দিয়ে 'লজ্জানম্র নববধূ সম' আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না; কিন্তু গালে আলতা মেখে রাজপথের সুমুখে বাতায়নে এসে দেখা দেয়। বর্ণেরও একটা আভিজাত্য আছে। তার সুসংযত ভাবের উপরেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। বাড়াবাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক। আমার মতে পূজার বাজারের নানারূপ রংচঙে পোশাক পরে প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যের সমাজে বার হওয়া উচিত নয়। তবে পূজার উপহার-স্বরূপে যদি তার চলন হয় তা হলে অবশ্য কিছু বলা চলে না। সাহিত্য যখন কুন্তলীন তাম্বুলীন এবং তরল আলতার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হয় তখন পুরুষের পক্ষে পরুষ বাক্য ছাড়া তার সম্বন্ধে অন্য-কোনো ভাষা ব্যবহার করা চলে না।

তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, এতে যে আত্মমর্যাদার লাঘব হয় এ সহজ কথাটা কি গ্রন্থকারেরা বুঝতে পারেন না ; কবি কি চান যে, তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল হয় ; চিন্তাশীল লেখক কি এই কথা মনে করে সুখী হন যে, তাঁর মস্তিষ্ক লোকে সুবাসিত নারিকেলতৈল হিসাবে দেখবে ; এবং বাণী কি রসনানিঃসৃত পানের পিকের সঙ্গে জড়িত হয়ে লজ্জা বোধ করেন না ? আশা করি যে, বইয়ের মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হয়ে উঠবে। অ্যান্টিক কাগজে ছাপানো এবং চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে বাঁধানো পুস্তকে আমার কোনো আপত্তি নেই। দপ্তরিকে আসল গ্রন্থকার বলে ভুল না করলেই খুশি হই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, লেখকের কৃতিত্ব মলাটে শুধু ঢাকা পড়ে। জীর্ণ কাগজে, শীর্ণ অক্ষরে, ক্ষীণ কালিতে ছাপানো একখানি পদকল্পতরু যে শত শত তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে গ্রন্থের চাইতে শতগুণ আদরের সামগ্রী।

এখন সমালোচনা শুরু করে দেবার পূর্বেই কথাটার একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঐ শব্দটি আমরা ঠিক অর্থে ব্যবহার করি কি না সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। প্রথমেই, 'সম্'-উপসর্গটির যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা আছে এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। শব্দ অতিকায় হলে যে তার গৌরববৃদ্ধি হয় এ কথা আমি মানি ; কিন্তু, দেহভারের সঙ্গেসঙ্গে যে বাক্যের অর্থভার বেড়ে যায় তার কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুগের লেখকেরা মাতৃভাষায় লিখেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কিন্তু সেইসঙ্গে মায়ের দেহপুষ্টি করাও তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু সে পুষ্টিসাধনের জন্য বহুসংখ্যক অর্থপূর্ণ ছোট-ছোট কথা চাই যা সহজেই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হতে পারে। স্বল্পসংখ্যক এবং কতকাংশে নিরর্থক বড়-বড় কথার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য ; কিন্তু সেই স্বল্পপরিচয়েই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সে ভাষার বাক্যাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ করবামাত্রই তা আমাদের হস্তগত হয় না। বরং আমাদের অশিক্ষিত হাতে পড়ে প্রায়ই তার অর্থবিকৃতি ঘটে। সংস্কৃত সাহিত্যে গোঁজামিলন-দেওয়া জিনিসটা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। কবি হোন্, দার্শনিক হোন্, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেক কথাটি ওজন করে ব্যবহার করতেন। শব্দের কোনোরূপ অসংগত প্রয়োগ সেকালে অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হত। কিন্তু একালে

আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড়-একটা ধারি নে। নিজের ভাষাই যখন আমরা সূক্ষ্ম অর্থ বিচার করে ব্যবহার করি নে, তখন স্বল্পপরিচিত এবং অনায়ত্ত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করে ব্যবহার করতে গেলে সে ব্যবহার যে বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তা আমি জানি। তবুও একেবারে বেপরোয়াভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত-ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, এই 'সমালোচনা'-কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি তার আসল অর্থ ঠিক তা নয়। আমরা কথায় বলি 'লেখাপড়া শিখি'; কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়তেই শিখি, লিখতে শিখি নে। পাঠকমাত্রেরই পাঠ্য কিংবা অপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; বিশেষতঃ সে কার্যের উদ্দেশ্য যখন আর-পাঁচজনকে বই পড়ানো, লেখানো নয়। সুতরাং সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলা সাহিত্যে অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই। এই সমালোচনা-বন্যার ভিতর থেকে একখানিমাত্র বই উপরে ভেসে উঠেছে। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোচনা'। তিনি যদি উক্ত নামের পরিবর্তে তার 'সমালোচনা' নাম দিতেন তা হলে, আমার বিশ্বাস, বৃথা বাগাড়ম্বরে 'আলোচনা'র ক্ষুদ্র দেহ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এত গুরুভার হয়ে উঠত যে, উক্ত শ্রেণীর আর-পাঁচখানা বইয়ের মত এখানিও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যেত। এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটি রাখতেই হয় তা হলে 'সম্' বাদ দিয়ে 'আলোচনা' রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। যদিচ ও-কথাটিকে আমি ইংরেজি criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বলে মনে করি নে। আলোচনা মানে 'আ' অর্থাৎ বিশেষরূপে 'লোচন' অর্থাৎ ঈক্ষণ। যে বিষয়ে সন্দেহ হয় তার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে দেখবার নামই আলোচনা। তর্কবিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডা আন্দোলন-আলোড়ন প্রভৃতি অর্থেও ঐ কথাটি আজকালকার বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ও-কথায় তার কোনো অর্থই বোঝায় না। 'আলোচনা' ইংরেজি scrutinize শব্দের যথার্থ প্রতিবাক্য। ক্রিটিসিজ্‌ম্ শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকলেও 'বিচার' শব্দটি অনেকপরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'সমালোচনা'র পরিবর্তে 'বিচার' যে বাঙালি সমালোচকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখি নে। কারণ, এঁদের উদ্দেশ্য— বিচার করা নয়, প্রচার

করা। তা ছাড়া যে কথাটা একবার সাহিত্যে চলে গেছে তাকে অচল করবার প্রস্তাব অনেকে হয়তো দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলে মনে করবেন। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বে যখন আমরা নির্বিচারে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দকে বঙ্গসাহিত্যের কারাগারে প্রবেশ করিয়েছি, এখন আবার সুবিচার করে তার গুটিকতককে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় কার্য হবে না। আর-এক কথা। যদি ক্রিটিসিজ্‌ম্ অর্থেই আমরা আলোচনা শব্দ ব্যবহার করি, তা হলে স্ক্রুটিনাইজ্ অর্থে আমরা কি শব্দ ব্যবহার করব? সুতরাং যে উপায়ে আমরা মাতৃভাষার দেহপুষ্টি করতে চাই, তাতে ফলে শুধু তার অঙ্গহানি হয়। শব্দ সম্বন্ধে যদি আমরা একটু শুচিবাতিকগ্রস্ত হতে পারি তা হলে, আমার বিশ্বাস, বঙ্গভাষার নির্মলতা অনেকপরিমাণে রক্ষিত হতে পারে। অনাবশ্যকে যদি আমরা সংস্কৃত ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে সংকুচিত হই, তাতে সংস্কৃত ভাষার উপর অবজ্ঞা দেখানো হবে না বরং তার প্রতি যথার্থ ভক্তিই দেখানো হবে। শব্দগৌরবে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব, তাও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। আমি বহুদিন থেকে এই মত প্রচার করে আসছি, কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না। সাহিত্যজগতে এক-শ্রেণীর জীব বিচরণ করে, যাদের প্রাণের চাইতে কান বড়। সংগীতচর্চার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না, এবং সে ব্যাপার থেকে তাদের নিরস্ত করবার ক্ষমতাও কারও নেই। প্রতিবাদ করায় বিশেষ-কোনো ফল নেই জেনেও আমি প্রতিবাদ করি; কারণ, আজকালকার মতে, আপত্তি নিশ্চিত অগ্রাহ্য হবে জেনেও আপত্তি ক'রে আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য বলে বিবেচিত হয়।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, কোনো বিশেষ লেখকের বা লেখার প্রতি কটাক্ষ করে আমি এসব কথা বলছি নে। বাংলা সাহিত্যের একটা প্রচলিত ধরন ফ্যাশন এবং ঢঙের সম্বন্ধেই আমার আপত্তি, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। সমাজের কোনো চলতি স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারি, এমন অন্যায় ভরসা আমি রাখি নে। সকল উন্নতির মূলে থামা জিনিসটে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে এমন-কোনো সিঁড়ি নেই যার ধাপে-ধাপে পা ফেলে আমরা অবলীলাক্রমে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। মনোজগতে প্রচলিত পথ ক্রমে সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর

হয়ে শেষে চোরা-গলিতে পরিণত হয়, এবং মানুষের গতি আটকে দেয়। বিজ্ঞানে যাকে ইভলিউশন বলে, এককথায় তার পদ্ধতি এই যে, জীব একটা প্রচলিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডাইনে কি বাঁয়ে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করে এবং সাহস করে সেই পথে চলতে আরম্ভ করে। এই নূতন পথ বার করা এবং সেই পথ ধরে চলার উপরেই জীবের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। মুক্তির জন্যে, হয় দক্ষিণ নয় বাম মার্গ যে অবলম্বন করতেই হবে, এ কথা এ দেশে ঋষিমুনিরা বহুকাল পূর্বে বলে গেছেন; অতএব একেলে বিজ্ঞান এবং সেকেলে দর্শন উভয়ই এই শিক্ষা দেয় যে, সিধে পথটাই মৃত্যুর পথ। সুতরাং বাংলা লেখার প্রচলিত পথটা ছাড়তে পরামর্শ দিয়ে আমি কাউকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করি নে। আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশি পথে চলতে শিখি তাতে বাংলা সাহিত্যের লাভ বই লোকসান নেই। ঐ পথটাই তো স্বাধীনতার পথ, এবং সেই কারণেই উন্নতির পথ— এই ধারণাটি মনে এসে যাওয়াতেও আমাদের অনেক উপকার আছে। আমি জানি যে, সাহিত্যে কিংবা ধর্মে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র দু-চারজন মহাজনেরই থাকে, বাদবাকি আমরা পাঁচজনে সেই মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে চলতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ের অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, কর্তব্যও বটে; কেননা, পৃথিবীর সকল ভেড়াই যদি মেড়া হয়ে ওঠে তো ঢুঁ-মারামারি করেই মেষবংশ নির্বংশ হবে। উক্ত কারণেই আমি লেখবার একটা প্রচলিত ধরনের বিরোধী হলেও প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের বিরোধী নই। আমরা কেউ ভাষা জিনিসটে তৈরি করি নে, সকলেই তৈরি ভাষা ব্যবহার করি। ভাষা জিনিসটে কোনো-একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে একটি জাতির হাতে-গড়া। কেবলমাত্র মনোমত কথা বেছে নেবার, এবং ব্যাকরণের নিয়মরক্ষা করে সেই বাছাই কথাগুলিকে নিজের পছন্দমত পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবার স্বাধীনতাই আমাদের আছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা জহুরী তাঁরা এই চলতি কথার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করেন, এবং শিল্পগুণে গ্রথিত করে দিব্য হার রচনা করেন। নিজের রচনাশক্তির দারিদ্র্যের চেহারাই আমরা মাতৃভাষার মুখে দেখতে পাই, এবং রাগ করে সেই আয়নাখানিকে নষ্ট করতে উদ্যত হই ও পূর্বপুরুষদের সংস্কৃত দর্পণের সাহায্যে মুখরক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। একরকম কাঁচ

আছে যাতে মুখ মস্ত দেখায়, কিন্তু সেইসঙ্গে চেহারা অপরিচিত বিকটাকার ধারণ করে। আমাদের নিজেকে বড় দেখাতে গিয়ে যে আমরা কিম্ভুত-কিমাকার রূপ ধারণ করি, তাতে আমাদের কোনো লজ্জাবোধ হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, প্রচলিত ভাষা কাকে বলে। তার উত্তরে আমি বলি, যে ভাষা আমাদের সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি। তা খাঁটি বাংলাও নয়, খাঁটি সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনোরূপ খিচুড়িও নয়। যে সংস্কৃত শব্দ প্রকৃত কিংবা বিকৃত রূপে বাংলা কথার সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাংলা বলেই জানি এবং মানি। কিন্তু কেবলমাত্র নূতনত্বের লোভে নতুন করে যেসকল সংস্কৃত শব্দকে কোনো লেখক জোর করে বাংলা ভাষার ভিতর প্রবেশ করিয়েছেন অথচ খাপ খাওয়াতে পারেন নি, সেইসকল শব্দকে ছুঁতে আমি ভয় পাই। এবং যেসকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টতঃ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই-সকল শব্দ যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে আমি লেখকদের সতর্ক হতে বলি। নইলে বঙ্গভাষার বনলতা যে সংস্কৃত ভাষার উদ্যানলতাকে তিরস্কৃত করবে, এমন দুরাশা আমার মনে স্থান পায় না। শব্দকল্পদ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনো আপত্তি নেই। তলার কুড়োও, কিন্তু সেইসঙ্গে গাছেরও পেড়ো না। তাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, তার অনুরূপ ফললাভ হবে।

শুধু গাছ থেকে পাড়া নয়, একেবারে তার আগ্‌ডাল থেকে পাড়া গুটিকতক শব্দের পরিচয় আমি সম্প্রতি বইয়ের মলাটে পেয়েছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বক্তব্য আছে। যাঁরা 'শব্দাধিক্যাৎ অর্থাধিক্যং' মীমাংসার এই নিয়ম মানেন না, বরং তার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে 'অধিকন্তু ন দোষায়'— এই উদ্‌ভট বচন অনুসারে কার্যানুবর্তী হয়ে থাকেন, তাঁরাও একটা গণ্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহসী হন না। এমন সাহিত্যবীর বোধ হয় বাংলাদেশে খুব কম আছে, যারা বঙ্গরমণীর মাথায় ধম্মিল্ল চাপিয়ে দিতে সংকুচিত না হয়, যদিচ সে বেচারারা নীরবে পুরুষের সব অত্যাচারই সহ্য করে থাকে। বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রাড়্‌বিবাক্' শব্দটি 'মলিম্‌লুচে'র ন্যায় কটু ভাষার হিসাবে গণ্য ক'রে চোর এবং বিচারপতিকে একই আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। 'প্রাড়্‌বিবাক্' বেচারা বাঙালি জাতির নিকট এতই

অপরিচিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার ঐরূপ লাঞ্ছনাতেও কেউ আপত্তি করেন নি। কিন্তু আজকাল ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দও নতুন গ্রন্থের বক্ষে কৌস্তুভমণির মত বিরাজ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দু-একটির উল্লেখ করব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি। তাঁর ভালো-মন্দ-মাঝারি সকল কবিতাতেই তাঁর কবির জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তাঁর রচিত এমন-একটি কবিতাও নেই যার অন্ততঃ একটি চরণেও ধ্বজবজ্রাংকুশের চিহ্ন না লক্ষিত হয়। সত্যের অনুরোধে এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল। 'এষা' শব্দের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, এবং তার নামও আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কাজেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, হয়তো 'আয়েষা' নয়তো 'এশিয়া' কোনোরূপ ছাপার ভুলে 'এষা'-রূপ ধারণ করেছে। আমার এরূপ সন্দেহ হবার কারণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আয়েষাকে নিয়ে নভেল লিখেছেন তখন তাকে নিয়ে অক্ষয়কুমার যে কবিতা রচনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কারণ কি থাকতে পারে। 'আবার বলি ওসমান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'—এই পদটির উপর রমণীহৃদয়ের সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ খাড়া করা কিছু কঠিন নয়। তার পর 'এশিয়া'— প্রাচীর এই নবজাগরণের দিনে তার প্রাচীন নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য যে কবি উৎসুক হয়ে উঠবেন, এও তো স্বাভাবিক। যার ঘুম সহজে ভাঙে না তার ঘুম ভাঙাবার দুটিমাত্র উপায় আছে— হয় টেনে-হিঁচড়ে, নয় ডেকে। এশিয়ার ভাগ্যে টানা-হ্যাঁচড়ানো-ব্যাপারটা তো পুরোদমে চলছে, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্য হল না তখন ডাকাডাকি ছাড়া আর কি উপায় আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়াকে কাব্যে দর্শনে নানারূপ ঘুমপাড়ানি-মাসিপিসির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন আবার জাগাতে হলে এ যুগের কবিরা 'জাগর'-গান গেয়েই তাকে জাগাতে পারবেন। সে গান অনেক কবি সুরে-বেসুরে গাইতেও শুরু করে দিয়েছেন। সুতরাং আমার সহজেই মনে হয়েছিল যে, অক্ষয়কুমার বড়ালও সেই কার্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন শুনছি যে, ও ছাপার ভুল নয়, আমারই ভুল। প্রাচীন গাথার ভাষায় নাকি 'এষা'র অর্থ অন্বেষণ। একালের লেখকেরা যদি শব্দের অন্বেষণে সংস্কৃতযুগ ডিঙিয়ে একেবারে প্রাচীন গাথা-যুগে গিয়ে উপস্থিত হন, তা হলে একেলে বঙ্গ-

পাঠকদের উপর একটু অত্যাচার করা হয়; কারণ, সেই শব্দের অর্থ-অন্বেষণে পাঠক যে কোন্ দিকে যাবে তা স্থির করতে পারে না। আজকালকার বাংলা বুঝতে অমরের সাহায্য আবশ্যক, তার পর যদি আবার যাস্ক চর্চা করতে হয় তা হলে বাংলা সাহিত্য পড়বার অবসর আমরা কখন পাব। যাস্কের সাহায্যেও যদি তার অর্থবোধ না হয় তা হলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা যে আমরা ত্যাগ করব, তাতে আর সন্দেহ কি। অর্থবোধ হয় না বলে যখন আমরা আমাদের পরকালের সদ্গতির একমাত্র সহায় যে সন্ধ্যা তারই পাঠ বন্ধ করেছি, তখন ইহকালের ক্ষণিক সুখের লোভে যে আমরা গাথার শব্দে রচিত বাংলা সাহিত্য পড়ব, এ আশা করা যেতে পারে না। তা ছাড়া বৈদিক এবং অতিবৈদিক ভাষা থেকে যদি আমরা বাক্যসংগ্রহ করতে আরম্ভ করি তা হলে তান্ত্রিক ভাষাকেই বা ছাড়ব কেন। আমার লিখিত নতুন বইখানির নাম যদি আমি 'ফেৎকারিণী' 'ডামর' কিংবা 'উড্ডীশ' দিই তা হলে কি পাঠকসম্প্রদায় খুব খুশি হবেন?

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুস্তিকাগুলির নামকরণ-বিষয়ে যে অপূর্বতা দেখিয়ে থাকেন তা আমাকে ভীত না করুক, বিস্মিত করে। আমি সাহিত্যের বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যাবসা খুলে বসি নি। সুতরাং সুধীন্দ্রবাবুর রচনার দোষগুণ দেখানো আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়। একমাত্র মলাটে তাঁর লেখা যেটুকু আত্মপরিচয় দেয়, সেইটুকু আমার বিচারাধীন। 'মঞ্জুষা' 'করঙ্ক' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যে আমাদের একেবারে মুখ-দেখাদেখি নেই, এ কথা বলতে পারি নে। তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, অন্ততঃ পাঠিকাদের নিকট ও-পদার্থগুলি যত সুপরিচিত, ও-নামগুলি তাদৃশ নয়। তা ছাড়া ঐরূপ নামের যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা আছে, তাও আমার মনে হয় না। আমাদের কল্পনাজাত বস্তু আমরা প্যাটরায় পুরে সাধারণের কাছে দিই নে, বরং সত্য কথা বলতে গেলে মনের প্যাটরা থেকে সেগুলি বার করে জনসাধারণের চোখের সমুখে সাজিয়ে রাখি। করঙ্কের কথা শুনলেই তাম্বুলের কথা মনে হয়। পানের খিলির সঙ্গে সুধীন্দ্রবাবুর ছোটগল্পগুলির কি সাদৃশ্য আছে, জানি নে। করুণ রস এবং পানের রস এক জিনিস নয়। আর-একটি কথা। তাম্বুলের সঙ্গেসঙ্গে চর্বিতচর্বণের ভাবটা মানুষের মনে সহজেই আসে। সে যাই হোক, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, সুধীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত 'বৈতানিক' শব্দ আমি বৈতালিক শব্দের

ছাপান্তর মনে করেছিলুম। হাজারে ন শ নিরব্বই জন বাঙালি পাঠক যে ও-শব্দের অর্থ জানেন না এ কথা বোধ হয় সুধীন্দ্রবাবু অস্বীকার করবেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে কেবলমাত্র ভৃগুপ্রোক্ত মানবধর্মশাস্ত্রে এক স্থলে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ জানা আবশ্যক মনে করি নি। এইরূপ নামে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং তার পরিচয় গোপন করাই হয়। বাংলা-সরস্বতীকে ছদ্মবেশ না পরালে যে তাঁকে সমাজে বার করা চলে না, এ কথা আমি মানি নে।

এই নামের উদাহরণ-ক'টি টেনে আনবার উদ্দেশ্য আমার সেই প্রথম কথার প্রমাণ দেওয়া। সে কথা এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ভিতর সমালোচনার মত নামকরণেও বিজ্ঞাপনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের আর-পাঁচটা দোষের ভিতর একটা হচ্ছে তার ন্যাকামি। ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্যের ভান এবং ভঙ্গি। বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হয়ে পড়েছি যে, শুদ্ধ স্বরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্র দ্বিধা করি নে। কথায় বলে, 'যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে'। কিন্তু শর্করার ভাগ অতিরিক্ত হলে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হয়ে ওঠে তখন ঐ পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্যও যে অরুচিকর হয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কি। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন তা হলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রসন্ন হয়, তা হলে তার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা আপসোসের বিষয়। যখন বঙ্গসাহিত্যে অন্ধকার আর 'বিরাজ' করবে না তখন এ বিষয়ে আর কারও 'মনোযোগ আকর্ষণ' করবার দরকারও হবে না।

১৩১৯ অগ্রহায়ণ

‘যৌবনে দাও রাজটিকা’

গতমাসের সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনো টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণ-রূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটিকা অর্থ— রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তা কর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টিকা, সেই টিকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম যদি-না আমার জানা থাকত যে, এ দেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবন-কাল— দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়িতে জুতলে আর বাগ মানানো যায় না ; অতএব এদের প্রথমে পৃথক্ ক’রে পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে ; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষ-মাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না। শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই ; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানী-ব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন ; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা— এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এ দেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া— কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন।

যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এ দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে বালক, অপরদিকে বৃদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাস্টার; সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে অকালমৃত্যু; ধর্মক্ষেত্রে একদিকে শুধু ইতি ইতি, অপরদিকে শুধু নেতি নেতি; অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপরদিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে; ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে; শুধু মধ্য নেই।

বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলনসাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনো-কোনো সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেইজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life; ইংরেজি সাহিত্য

জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা -কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা জোগানো, পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন জোগানো। হিন্দুযুগের শেষকবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে, 'যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও তো আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো'। এককথায় যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলাবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ ক'রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়নকথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয় নি, তা নয়; তবে ললিতবিস্তরকে আর-কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না, এবং অশ্বঘোষের নাম পর্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্যরচনা করেছেন, যথা ভাস গুণাঢ্য সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন; কিন্তু

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের ফলে রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়নধর্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম। বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না ব'লে কিছু বর্জনও করতে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না ব'লে কিছু ছাড়তেও পারে না— দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে যৌবনধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম, এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল, তাও অস্বীকার করবার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি— ভাষায় যাকে বলে একরোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই— হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূল-শরীরকে অত আশকারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন-পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক্ হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার

প্রমাণ— প্রাচীন সমাজের একদিকে বিলাসী অপরদিকে সন্ন্যাসী, একদিকে পত্তন অপরদিকে বন, একদিকে রঙ্গালয় অপরদিকে হিমালয়; এককথায় একদিকে কামশাস্ত্র অপরদিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ-মনোভাবের পরস্পর-মিলনের যে কোনো পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁজ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশি অসংযত।

যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ, এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলোমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত করতেও সংকুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা যৌবন-জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন তা হলে তিনি যে কাব্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাকত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু

তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই একমত।

'যৌবন ক্ষণস্থায়ী', এই আক্ষেপে এ দেশের কাব্য ও সংগীত পরিপূর্ণ—

ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে-ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপসোস রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই এ দেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয়তো এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্তমান। জীবনের গতিটি উলটো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর-সব দেশে লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয় সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বট-গাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতরে পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এইসব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই, অপর-সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেন তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও-দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য।

এ বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি— যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণশক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম যে জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নবনব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা— এটি সর্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর-একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদর্শনের মতে জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্যনূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং

সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক— প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি— এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও আসলে মানব-সমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গেসঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর-এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই একমন। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।

১৩২১ জ্যৈষ্ঠ

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তা হলে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ, কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট-জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। হ্যামলেট, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার জো নেই। কিন্তু সংগীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে, এ দেশে আর্ট কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগরাগিণীর স্ফূর্তির ঋতু মাস দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্যন্ত পৌঁছয় তিনিও জানেন যে, ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল আর পুরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনে কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর-কোনো শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাংলা কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তা ছাড়া, বাস্তবজীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মেলে না,

তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর-এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত দুকূল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তা হলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে পদ্যকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপুর করে তুলতে হলে মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সততসঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোর্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী, শুষ্কা না হলেও ক্ষীণা; দামোদর নন যে, শব্দের বন্যায় বাংলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতঃই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ পরশ সরস হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলানো যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে আছেন। আমি যদি ঐসকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তা হলে আমার চুরিবেগু ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্যবৃত্তি কি না, সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্যকবিদের মতে মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃকসম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ ওসব কথার আর-কিছু পেটেণ্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়ব—বিশেষতঃ যখন তাদের কোনো বদলি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে, তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার জো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্যকবিদের আর-একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন তা হলে পরবর্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুন সে সুযোগ হারিয়েছি বলে আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্যজগতের এমন-কোনো নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর-একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয় মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা-কিছু বক্তব্য ছিল তা কালিদাস সবই বলে গেছেন, বাকি যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিংবা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসনভূষণ বাদ

দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উদ্যত হই, তা হলেও বড় সুবিধে করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে, এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে কিন্তু কবিত্ব থাকবে কি না, তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেইসব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়-একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখি-ছুট। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর্দুর বক্তা; চকোর আকাশদেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে ফটিকজল শব্দ আর মুখেও আনে না। যেসকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখি, যথা বক হাঁস সারস হাড়গিলে ইত্যাদি, এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে-স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, তারা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্যন্ত নয়। তার পর কাব্যের উপযোগী ফুল ফল লতা পাতা গাছ বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না, তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্বতায় পুষ্পজগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্ধবিকশিত ও অর্ধনিমীলিত। রূপের যে অর্ধপ্রকাশ ও অর্ধ-গোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মুনিঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা, আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্ত-রূপ নেই, অপরের গুপ্ত-গন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়, অস্ত্র; গোলা এবং সঙিনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্বে যা দেখানো গেল, সেসব তো অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে, আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই; আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশি, অতএব

অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে, দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণপবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়পর্বত, তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়; সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো, সূর্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা তো সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা, আমরা হয় সূর্যবংশীয় নয় চন্দ্রবংশীয়— এবং ভবলীলাসংবরণ করে আমরা হয় সূর্যলোকে নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপরপক্ষে, মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে তার কোনো ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে, সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত এতই অশিষ্ট এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে-যে কোনো অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার পর, বর্ষায় নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল এতই চঞ্চল এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনোই জন্মলাভ করে নি। আর-এক কথা, বসন্ত হচ্ছে কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ-ঋতু শুধু বেখাপ্পা নয়, অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয় আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয়, তা কেউ বলতে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে ফুলের ডালা হাতে করে দেশের হৃদয়মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূ কম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এসকল জীবনের লক্ষণ, শুধু পর্যায়ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুংকার; সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরেজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা?— পবননন্দন নন, কিন্তু

তাঁর বাবা। ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপ্ড়ান; আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন; আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সংকুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এককথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যস্ত করে ফেলা। এ-ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, ইনি ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। এমন অব্যবস্থিত-চিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এস্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তা হলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, সেকালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিস নয়; নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর-কোনো মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ শান্ত-দান্ত; সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ, তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ, স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুংকার করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ, সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জ্বেলে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়, কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সংগীতজ্ঞ, তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন তখন সে মৃদঙ্গের সংগত করে। এককথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্তমান। সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব; সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ মুরজধ্বনিতে মুখরিত; সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এহেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না নয়, তা হলে সে বিষয় আর কি হতে পারে?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল, সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপবর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তা হলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান? আমাদের মত শান্ত সমাহিত সুসভ্য জাতির পক্ষে, বর্ষা নয়,

হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয়, শাস্ত্রের ; নিম্নে উদ্ধৃত বাক্য-গুলির দ্বারাই তা প্রমাণিত হবে—

ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে, এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা, হেমন্ত এইসমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।—শতপথ ব্রাহ্মণ

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অন্নহীন, তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানি নে ; এবং জানি নে যে, তার কারণ কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার ; যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না ক'রে সবুজ ক'রে তোলে।

১৩২১ আষাঢ়

প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস

ভারতবর্ষের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সে বিষয়ে বিদেশির দল ও স্বদেশির দল উভয়েই একমত। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করেন : এক, যাঁরা রাজ্যের সংস্কার চান ; আর-এক, যাঁরা সমাজের সংস্কার চান। বর্তমানকে ভবিষ্যতে পরিণত করতে হলে তার সংস্কার অর্থাৎ পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই নিয়েই তো যত গোল। যা আছে তার বদল করা যে রাজ্যশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে রাজ্য-শাসনকদের মত ; আর যা আছে তার বদল করা যে সমাজশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে সমাজশাসিতদের মত। অতএব দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ নেই এবং থাকা উচিত নয়— এ সত্য ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রমতেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

২

ভবিষ্যৎ না থাক্, গতকল্য পর্যন্ত ভারতবর্ষের অতীত ব'লে একটা পদার্থ ছিল ; শুধু ছিল বলে ছিল না— আমাদের দেহের উপর, আমাদের মনের উপর তা একদম চেপে বসে ছিল। কিন্তু আজ শুনছি, সে অতীত ভারতবর্ষের নয়, অপর দেশের। এ কথা শুনে আমরা সাহিত্যিকের দল বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছি। কেননা, এতদিন আমরা এই অতীতের কালিতে কলম ডুবিয়ে বর্তমান সাহিত্য রচনা করছিলুম। এই অতীত নিয়ে, আমাদের ভিতর যাঁর অন্তরে বীররস আছে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করতেন, যাঁর অন্তরে করুণরস আছে তিনি ক্রন্দন করতেন, যাঁর অন্তরে হাস্যরস আছে তিনি পরিহাস করতেন, যাঁর অন্তরে শান্তরস আছে তিনি বৈরাগ্য প্রচার করতেন, আর যাঁর অন্তরে বীভৎসরস আছে তিনি কেলেংকারি করতেন। কিন্তু অতঃপর এই যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের অতীত আমাদের পৈতৃক ধন নয়, কিন্তু তা পরের— তা হলে সে ধন নিয়ে সাহিত্যের বাজারে আমাদের আর পোদ্দারি করা চলবে না। এককথায়, ইতিহাসের পক্ষে যা পোষ-মাস, সাহিত্যের পক্ষে তা সর্বনাশ।

৩

আমাদের এতকালের অতীত যে রাতারাতি হস্তান্তরিত হয়ে গেল, সেও আমাদের অতিবুদ্ধির দোষে। এ অতীত যতদিন সাহিত্যের অধিকারে ছিল ততদিন কেউ তা আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। কিন্তু সাহিত্যকে উচ্ছেদ ক'রে বিজ্ঞান অতীতকে দখল করতে যাওয়াতেই আমরা ঐ অমূল্য বস্তু হারাতে বসেছি। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের অতীত থাকলেও তার ইতিহাস ছিল না। কাজেই এই অতীতের সাদা কাগজের উপর আমরা এতদিন স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে আমাদের মনোমত ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে বাংলায় একদল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ ক'রে সে ইতিহাসকে উপন্যাস বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করতে কৃতসংকল্প হলেন, যার ভিতর রসের লেশমাত্র থাকবে না— থাকবে শুধু বস্তুতন্ত্রতা। এঁরা আহেলা বিলেতি শিক্ষার মোহে এ কথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে হিন্দুর প্রতিভা, ইতিহাসে নয় পুরাণে, বিজ্ঞানে নয় দর্শনে, ফুটে উঠেছিল। অতীতের মর্মগ্রহণ না ক'রে তার চর্মগ্রহণ করতে যাওয়াতেই সে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হল। এতে তাঁদের কোনো ক্ষতি নেই, মধ্যে থেকে সাহিত্য শুধু দেউলে হয়ে গেল। বিজ্ঞানের প্রদীপ যে সাহিত্যের লালবাতি— এ কথা কে না জানে।

৪

আমরা সাহিত্যিকের দল অতীতকে আকাশ হিসেবে দেখতুম, অর্থাৎ আমাদের কাছে ও-বস্তু ছিল একটি অখণ্ড মহাশূন্য। সুতরাং সেই আকাশে আমরা কল্পনার সাহায্যে এমন-সব গিরি-পুরী নির্মাণ ক'রে চলেছিলুম, যার ত্রিসীমানার ভিতর বিজ্ঞানের গোলাগুলি পৌঁছয় না। বাংলার নবীন প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের মতে এ কার্যটি অকার্য বলেই স্থির হল; কেননা, বৈজ্ঞানিক-মতে ইতিহাস গড়বার জিনিসও নয়, পড়বার জিনিসও নয়— শুধু ঢোঁড়বার জিনিস। সুতরাং ও-জিনিসের অন্বেষণ পায়ের নীচে করতে হবে— মাথার উপরে নয়। যাঁরা আবিষ্কার করতে চান তাঁদের কর্মক্ষেত্র ভূলোক, দ্যুলোক নয়; কেননা, আকাশদেশ তো স্বতঃআবিষ্কৃত।

এই কারণে, সক্রেটিস যেমন দর্শনকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটির

উপরে এনে ফেলেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরাও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আকাশ থেকে পেড়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছেন।

৫

এ দলের মতে ভারতবর্ষের অতীত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেও পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায় নি; কেননা, কাল অতীতের অগ্নিসৎকার করে না, শুধু তার গোর দেয়। এককথায়, অতীতের আত্মা স্বর্গে গমন করলেও তার দেহ পাতালে প্রবেশ করে। তাই ভারতবর্ষ ইতিহাসের মহাশ্মশান নয়, মহাগোরস্থান। অতএব ভারতবর্ষের কবর খুঁড়ে তার ইতিহাস বার করতে হবে। এই জ্ঞান হওয়ামাত্র আমাদের দেশের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকে কোদাল পাড়তে শুরু করলেন এই আশায় যে, এ দেশের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে, যেখানেই কোদাল মারা যাবে, সেখানেই লুপ্তসভ্যতার গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে। আর সে ধনে আমরা এমনি ধনী হয়ে উঠব যে, মনোজগতে খোরপোশের জন্য আমাদের আর চাষ-আবাদ করতে হবে না।

এই খোঁড়াখুঁড়ির ফলে সোনা না হোক তামা বেরিয়েছে, হীরে না হোক পাথর বেরিয়েছে। কিন্তু এ যে-সে তামা যে-সে পাথর নয়— সব হরফ-কাটা। এইসব মুদ্রাঙ্কিত তাম্রফলকের বিশেষ-কিছু মূল্য নেই, তা পয়সারই মত সস্তা। একালেও আমরা শিল কুটি, কিন্তু সেই কোটা-শিল পড়া যায় না; কেননা, তার অক্ষর সব রেখাক্ষর। কিন্তু অতীতের এই ক্ষোধিত পাষাণের কথা স্বতন্ত্র। বিদ্যা বলেছিলেন—

শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সংগীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়

কিন্তু আজকাল যদি কেউ বলেন যে—

কপি জলে ভেসে যায়, পাষাণে সংগীত হয়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়

তা হলে তিনি অবিদ্যারই পরিচয় দেবেন। কেননা, আজকাল পাষাণের সংগীতে দেশ মাতিয়ে তুলেছে। অতীত আজ তার পাষাণ-বদনে তারস্বরে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। কাগজের কথায় আমরা আর কান দিই নে। রামায়ণ-মহাভারত এখন উপন্যাস হয়ে পড়েছে, এবং ইতিহাস এখন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ, আমরা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি যে, যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা

বলি সেটি একটি অর্বাচীন পদার্থ— বৌদ্ধসভ্যতার পাকা বুনিয়াদের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বনিম্নস্তরে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। ফলে, আমরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্ম নিয়েই গৌরব করছিলুম। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পাটলিপুত্রই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল— একাধারে জন্মভূমি এবং পীঠস্থান।

৬

কথাসরিৎসাগরের প্রসাদে পাটলিপুত্রের জন্মকথা আমরা সকলেই জানতুম। এবং আমরা, কাব্যরসের রসিকেরা, সেই জন্মবৃত্তান্তই সাদরে গ্রাহ্য করে নিয়েছিলুম ; কেননা, সে কথায় বস্তুতন্ত্রতা না থাকলেও রস আছে, তাও আবার একটি নয়, তিন তিনটি— মধুর বীর এবং অদ্ভুত রস। পুত্র কর্তৃক পাটলিহরণের বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ এবং অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণের চাইতেও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কৃষ্ণ প্রভৃতি রথে চড়ে স্থলপথে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু পুত্র পাটলিকে ক্রোড়স্থ ক'রে মায়া-পাদুকায় ভর দিয়ে নভোমার্গে উড্ডীন হয়েছিলেন। কৃষ্ণার্জুন স্ব স্ব নগরীতে প্রস্থান করেছিলেন ; পুত্র কিন্তু তাঁর মায়া-যষ্ঠির সাহায্যে যে-পুরী আকাশে নির্মাণ করেছিলেন, সেই পুরী ভূমিষ্ঠ হয়ে পাটলিপুত্র নাম ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু জাদুতে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মতে পাটলিপুত্রকে খনন করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়েছিল, এবং সে কর্তব্যও সম্প্রতি কার্যে পরিণত করা হয়েছে। খোঁড়া জিনিসটের ভিতর একটা বিপদ আছে, কেননা কোনো-কোনো স্থলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। এক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

ডক্টর স্পূনার নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্তা-ব্যক্তি এই ভূমধ্য-রাজধানী খনন করে আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে দেখা যায় যে তার নীচে ভারতবর্ষ নেই, আছে শুধু পারশ্য। Palimpsest নামক একপ্রকার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে আর নীচে আর-এক ভাষায়। বলা বাহুল্য, উপরে যা লেখা থাকে তা জাল, আর নীচে যা লেখা থাকে তাই আসল। ডক্টর স্পূনারের দিব্যদৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট palimpsest ; তার উপরে পালি কিংবা সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে তা জাল, আর তার নীচে যা লেখা তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফারসি ;

কেননা, আমরা কেউ তা পড়তে পারি নে। ডক্টর স্পূনারের কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন, মান্য করতে বাধ্য ; কেননা, সেকালের কাব্যের জাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের জাদুঘরের কাব্যকে তা করা চলে না।

ডক্টর স্পূনার তাঁর নব-মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নানা প্রমাণ, নানা অনুমান, নানা দর্শন, নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। এসকলের মূল্য যে কি, তা নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, তিনি এমন-একটি যুক্তি বাদ দিয়েছেন, যার আর-কোনো খণ্ডন নেই। স্পূনার সাহেবের মতে যার নাম অসুর তারই নাম দানব, এবং যার নাম দানব তারই নাম শক, এবং যার নাম শক তারই নাম পার্শি। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে পার্শি-শহর বেরিয়ে পড়তে বাধ্য। দানবপুরী যে পাতালে অর্থাৎ মাটির নীচে অবস্থিত, এ কথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্মত।

৭

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের ভবিষ্যৎও নেই অতীতও নেই। এক বাকি থাকল বর্তমান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুশকিলের কথা। বই পড়ে বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখেশুনে লেখা আর। এ কাজ করতে হলে চোখকান খুলে রাখতে হবে, মনকে খাটাতে হবে ; এককথায় সচেতন হতে হবে। তার পর এত কষ্ট স্বীকার ক'রে যে সাহিত্য গড়তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য করবেন না। মানুষে বর্তমানকেই সবচাইতে অগ্রাহ্য করে। যাঁদের চোখকান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নবসাহিত্যকে নবীন বলে নিন্দা করবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্তমানের কোনো ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন হতে বঙ্গসরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।

১৩২৩ আষাঢ়

সুরের কথা

আপনারা দেশি-বিলেতি সংগীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন, সে গোলযোগে আমি গলাযোগ করতে চাই।

এ বিষয়ে বক্তৃতা করতে পারেন এক তিনি যিনি সংগীতবিদ্যার পারদর্শী, আর-এক তিনি যিনি সংগীতশাস্ত্রের সারদর্শী ; অর্থাৎ যিনি সংগীত সম্বন্ধে হয় সর্বজ্ঞ, নয় সর্বাজ্ঞ। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, অতএব এ বিষয়ে আমার কথা বলবার অধিকার আছে।

আপনাদের সুরের আলোচনা থেকে আমি যা সারসংগ্রহ করেছি সংক্ষেপে তাই বিবৃত করতে চাই। বলা বাহুল্য, সংগীতের সুর ও সার পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এর প্রথমটি হচ্ছে কানের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানের। আমরা কথায় বলি সুরসার, কিন্তু সে দ্বন্দ্বসমাস হিসেবে।

সব বিষয়েরই শেষ কথা তার প্রথম কথার উপরেই নির্ভর করে ; যে বস্তুর আমরা আদি জানি নে, তার অন্ত পাওয়া ভার। অতএব কোনো সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হলে তার আলোচনা ক খ থেকে শুরু করাই সনাতন পদ্ধতি ; এবং এ ক্ষেত্রে আমি সেই সনাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করব।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন লোক ঢের আছে যারা দিব্যি বাংলা বলতে পারে অথচ ক খ জানে না, আমাদের দেশের বেশির ভাগ স্ত্রী-পুরুষই তো ঐ দলের ; অপরপক্ষে, এমন প্রাণীরও অভাব নেই যারা ক খ জানে অথচ বাংলা ভালো বলতে পারে না, যথা আমাদের ভদ্রশিশুর দল। অতএব এরূপ হওয়াও আশ্চর্য নয় যে, এমন গুণী ঢের আছে যারা দিব্যি গাইতে-বাজাতে পারে অথচ সংগীতশাস্ত্রের ক খ জানে না ; অপরপক্ষে এমন জ্ঞানীও ঢের থাকতে পারে যারা সংগীতের শুধু ক খ নয় অনুস্বর বিসর্গ পর্যন্ত জানে, কিন্তু গানবাজনা জানে না।

তবে যারা গানবাজনা জানে, তারা গায় ও বাজায় ; যারা জানে না, তারা ও-বস্তু নিয়ে তর্ক করে। কলধ্বনি না করতে পারি, কলরব করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সুতরাং এই তর্কে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা হবে না। অতএব আমাকে ক খ থেকেই শুরু করতে হবে, অ আ থেকে নয়। কেননা, আমি যা লিখতে বসেছি, সে হচ্ছে সংগীতের

ব্যঞ্জনলিপি, স্বরলিপি নয়। আমার উদ্দেশ্য সংগীতের তত্ত্ব ব্যক্ত করা, তার স্বত্ব সাব্যস্ত করা নয়। আমি সংগীতের সারদর্শী, সুরস্পর্শী নই।

২

হিন্দুসংগীতের ক খ জিনিসটে কি ?— বলছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যা আমাদের সংগীতেরও মূল তাই— অর্থাৎ শ্রুতি।

শুনতে পাই, এই শ্রুতি নিয়ে সংগীতাচার্যের দল বহুকাল ধরে বহু বিচার করে আসছেন, কিন্তু আজ-তক্ এমন-কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি যাকে 'উত্তর' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ যার আর উত্তর নেই।

কিন্তু যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, সে কারণ আমি ও-বিষয়ের একটি সহজ মীমাংসা করেছি যা সহজ মানুষের কাছে সহজে গ্রাহ্য হতে পারে।

আমার মতে শ্রুতির অর্থ হচ্ছে সেই স্বর যা কানে শোনা যায় না, যেমন দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য যা চোখে দেখা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্যচক্ষু চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্য দিব্যকর্ণ চাই। বলা বাহুল্য, তোমার-আমার মত সহজ মানুষদের দিব্যচক্ষুও নেই, দিব্যকর্ণও নেই; তবে আমাদের মধ্যে কারও কারও দিব্যি চোখও আছে, দিব্যি কানও আছে। ওতেই তো হয়েছে মুশকিল। চোখ ও কান সম্বন্ধে দিব্য এবং দিব্যি— এ দুটি বিশেষণ, কানে অনেকটা এক শোনালেও, মানেতে ঠিক উলটো।

সংগীতে যে সাতটি সাদা আর পাঁচটি কালো সুর আছে, এ সত্য পিয়ানো কিংবা হারমোনিয়ামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন। এই পাঁচটি কালো সুরের মধ্যে যে, চারটি কোমল আর একটি তীব্র— তা আমরা সকলেই জানি এবং কেউ-কেউ তাদের চিনিও। কিন্তু চেনাশুনো জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁরা বলেন যে, এ দেশে ঐ পাঁচটি ছাড়া আরও কালো এবং এমন কালো সুর আছে, যেমন কালো বিলেতে নেই। শাস্ত্রমতে সেসব হচ্ছে অতিকোমল ও অতিতীব্র। ঐ নামই প্রমাণ যে, সেসব অতীন্দ্রিয় সুর এবং তা শোনবার জন্যে দিব্যকর্ণ চাই— যা তোমার-আমার তো নেই, শাস্ত্রীমহাশয়দেরও আছে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, তাঁদেরও নেই। শ্রুতি সেকালে থাকলেও একালে তা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্মৃতিই যে শ্রুতিধরদের একমাত্র শক্তি, এ সত্য তো জগদ্‌বিখ্যাত। সুতরাং

এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সংগীত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়া, অর্থাৎ পরের কানে মিষ্টি শোনা, যাঁদের অভ্যাস শুধু তাঁদের কাছেই শ্রুতি শ্রুতিমধুর। আমি স্থির করেছি যে, আমাদের পক্ষে ঐ বারোই ভালো। অবশ্য সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে। ও দ্বাদশকে ছাড়াতে গেলে, অর্থাৎ ছাড়লে, আমাদের কানকে একাদশী করতে হবে।

৩

এসব তো গেল সংগীতের বর্ণপরিচয়ের কথা, শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সুরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হলেও আলোচ্য।

শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়; অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনো পুরুষ কর্তৃক রচিত হয় নি, প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি একটানা তারের গায়ে ঘা মারলে প্রকৃতি অমনি সাত সুরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন মানুষে শুধু তার নকল করে। কিন্তু সে নকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিংবা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতিদত্ত স্বরগ্রামের কোনো সুর একটু চড়ে, কোনো সুর একটু ঝুলে যায়। তা তো হবারই কথা। প্রকৃতির হৃদয়তন্ত্রী থেকে এক ঘায়ে যা বেরোয়, তা যে একঘেয়ে হবে— এ তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এইসব প্রাকৃত সুরকে সংস্কৃত করে নিতে বাধ্য।

এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা, প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ, এবং অন্ধের সংগীতে ব্যুৎপত্তি যে সহজ এ সত্য তো লোকবিশ্রুত।

প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে— শব্দ নয়, গোলযোগ আছে— এ কথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই তো আর্ট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।

আর্টিস্টরা বলেন, প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যাঁর কান নেই তাঁর কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি নর্তকী; কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা এবং পুরুষ শ্রোতা, এ কথা কোনো দর্শনেই বলে না। আর্টিস্টদের মতে তৌর্যত্রিকের একটিমাত্র অঙ্গ— নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি— গীতি বাদ্য— তা নয়।

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নৃত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।

শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম ; বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয় বাতাসের ধর্ম ; আকাশের নৃত্য অর্থাৎ সর্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের, এবং বাতাসের উক্তরূপ কম্পন থেকে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে— তা বৈজ্ঞানিকেরা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে সুরের উৎপত্তি, সুতরাং জড়প্রকৃতির গর্ভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে, সৃষ্টির চরম আনন্দে ; আর আকাশ-বাতাস কাঁপে বেদনায়, সৃষ্টির প্রসববেদনায়। সুতরাং আর্টিস্টদের মতে সুর শব্দের অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ।

যেখানে আর্টে ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপস-মীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিস মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হতে সুরের কিংবা সুর হতে শব্দের উৎপত্তি— সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙে সুরের, না সুর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে— এককথায়, সুর আগে না রাগ আগে। অবশ্য রাগের বাইরে সার্গমের কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং সার্গমের বাইরে রাগের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সুর পূর্বরাগী কি অনুরাগী, এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন যাঁরা বলতে পারেন বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে ; অর্থাৎ কেউ পারেন না।

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর-কোনো খণ্ডন নেই। তবে বৃক্ষায়ুর্বেদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে সে রহস্যের ভেদ তাঁরা বাৎলাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। কেননা, ও-কথা শোনবামাত্র আর-এক দলের বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পরমাণুবাদীরা, জবাব দেবেন যে সংগীত আয়ুর্বেদের নয় বায়ুর্বেদের অন্তর্ভূত ; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, আমি কর্তা তুমি ভোক্তা এ জ্ঞান যার নেই, তিনি আর্টিস্ট নন। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বোধন ক'রে— তুমি কর্তা আমি ভোক্তা— এ কথা কোনো আর্টিস্ট কখনো বলতে পারবেন না, এবং ও কথা মুখে আনবার কোনো দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার

যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ— আমরা পৃথিবীসুদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সুরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।

অতএব দাঁড়াল এই যে, সংগীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজ মানুষে চায় তার স্থিতি, ভিত্তি নয়।

৪

অতঃপর দেশি বিলেতি সংগীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যাক।

এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক্, তা অবশ্য ক খ -গত নয়। যে বারো সুর এ দেশের সংগীতের মূলধন, সেই বারো সুরই যে সে দেশের সংগীতের মূলধন— এ কথা সর্ববাদীসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সুদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনো ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড়-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমি পূর্বে দেখিয়েছি যে, সুরের এই অতিসুদের লোভে আমরা সংগীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশি-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশির সঙ্গে বিলেতি সংগীতের আসল প্রভেদটা ক খ নিয়ে নয়, কর খল নিয়ে। BLA=ব্লে - CLA=ক্লের সঙ্গে কর-খলের, কানের দিক থেকেই হোক আর মানের দিক থেকেই হোক, একটা-যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে— এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সত্য। এ প্রভেদ উপাদানের নয়, গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের, এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।

সুতরাং আমরা যদি বিলেতি ব্যাকরণ অনুসারে সুর সংযোগ করি তা হলে তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে, তাতে অবশ্য রাগের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে ইংরেজি ভাষা লিখলে সে লেখা ইংরেজিই হয়, এবং তাতে বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, যদিচ এক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয় শব্দও বিদেশি। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরেজি এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে, এবং সেইসঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে তা বাবু-ইংলিশ হয়, এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখলে তা সাধু-ভাষা হয়— তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বসলে সংগীতেও আমরা রাগ-মেলডির একটি খিচুড়ি পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়িভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সংগীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ করতে চাই নে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৫

দেশি বিলেতি সংগীতের মধ্যে আর-একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আমাদের নেই।

এই হারমনি-জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বই আর-কিছুই নয়, অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনও প্রথমভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয়ভাগের চর্চা করা উচিত কি না, সে বিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয়ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথমভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলুন আর না-ভুলুন, তাঁরা যে প্রথমভাগকে আর আমল দেবেন না, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একবার যুক্তাক্ষর শিখলে আমরা অযুক্তাক্ষরের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত মনে করি নে এবং অপর-কেউ করতে গেলে অমনি বলে উঠি, সাহিত্যের সর্বনাশ হল, ভাষাটা একদম অসাধু এবং অশুদ্ধ হয়ে গেল। তবে সংগীতে এ বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সেদিন একজন ইংরেজ বলছিলেন যে, যে সংগীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি করে স্ত্রী আছে, সেখানে হারমনি কি করে থাকতে পারে। আমি বলি, ও তো ঠিকই কথা, বিশেষতঃ স্বামী যখন মূর্তিমান রাগ আর স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক-একটি মূর্তিমতী রাগিণী। অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সংগীতের কৌলীন্য। আমাদের রাগসকল যদি কুলীন না হত, তা হলেও আমরা হারমনির চর্চা করতে পারতুম না; কেননা, ও-বস্তু আমাদের ধাতে নেই। আমাদের সমাজের মত আমাদের সংগীতেও জাতিভেদ আছে, আর তার কেউ আর-কারও সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে না। মিশ্রিত হওয়া দূরে থাক্, আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করতে ভয় পাই; কেননা, জাতির ধর্মই হচ্ছে জাত বাঁচিয়ে মরা। আর মিলে-মিশে এক হয়ে যাবার নামই হচ্ছে হারমনি।

১৩২৩ পৌষ

রূপের কথা

এ দেশে সচরাচর লোকে যা লেখে ও ছাপায় তাই যদি তাদের মনের কথা হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানবসভ্যতার চরমপদ লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকাণ্ড সত্যটা বিদেশিরা মোটেই দেখতে পায় না। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। কেননা, সভ্যতারও একটা চেহারা আছে; এবং যে সমাজের সুচেহারা নেই তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন। বিদেশি বলতে দু শ্রেণীর লোক বোঝায়: এক পরদেশি, আর-এক বিলেতি। আমরা যে বড়-একটা কারও চোখে পড়ি নে, সে বিষয়ে এই দুই দলের বিদেশিই একমত।

যাঁরা কালাপানি পার হয়ে আসেন তাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশ দেখে তাঁদের চোখ জুড়োয়, কিন্তু আমাদের বেশ দেখে সে চোখ ক্ষুণ্ণ হয়। এর কারণ, আমাদের দেশের মোড়কে রং আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন তার রং সবুজ; আর বাঙালি নিজে যে কাপড় পরেছে তার রং, আর যেখানেই পাওয়া যাক, ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রং-ছুট বলেই অপর-কারও নয়নাভিরাম নই। সুতরাং যারা আমাদের দেশ দেখতে আসে তারা আমাদের দেখে খুশি হয় না। যাঁর বোম্বাই শহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন কলকাতার সঙ্গে সে শহরের প্রভেদটা কোথায় এবং কত জাজ্বল্যমান। সে দেশে জনসাধারণ পথেঘাটে সকালসন্ধ্যে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায় এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চির-গোধূলি; তাই শুধু বিলেতি নয়, পরদেশি ভারতবাসীর চোখেও আমরা এতটা দৃষ্টিকটু। বাকি ভারতবর্ষ সাজসজ্জায় স্বদেশি, আমরা আধ-স্বদেশি হাফ-বিলেতি। আর বিলেতি মতে, হয় কালো নয় সাদা— নইলে সভ্যতার লজ্জা নিবারণ হয় না; রং চাই শুধু সং সাজবার জন্যে। আমাদের নবসভ্যতাও কার্যতঃ এই মতে সায় দিয়েছে।

২

আপনারা বলতে পারেন যে, এ কথা যদি সত্যও হয় তাতে আমাদের কি যায়-আসে। বিদেশির মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা তো আর জাতকে-জাত

আমাদের পরন-পরিচ্ছদ আমাদের হাল-চাল সব বদলে ফেলতে পারি নে। জীবনযাত্রা-ব্যাপারটা তো আর অভিনয় নয় যে, দর্শকের মুখ চেয়ে সে-জীবন গড়তে হবে এবং তার উপর আবার রং ফলাতে হবে। এ কথা খুব ঠিক। জীবন আমরা কিসের জন্য ধারণ করি তা না জানলেও এটা জানি যে, পরের জন্য আমরা তা ধারণ করি নে— অপর দেশের অপর লোকের জন্য তো নয়ই। তবে বিদেশির কথা উত্থাপন করবার সার্থকতা এই যে, জাতীয় জীবনের ত্রুটি বিদেশির চোখে যেমন এক-নজরে ধরা পড়ে, স্বদেশির চোখে তা পড়ে না। কেননা, আজন্ম দেখে দেখে লোকের চোখে যা সয়ে গেছে, যারা প্রথম দেখে তাদের চোখে তা সয় না।

এই বিদেশিরাই আমাদের সজ্ঞান করে দিয়েছে যে, রূপ সম্বন্ধে আমরা চোখ থাকতেও কানা। আমাদের রূপজ্ঞান যে নেই, কিংবা যদি থাকে তো অতি কম, সে বিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। কেননা, এ জ্ঞানের অভাবটা আমরা জাতীয় মনের দৈন্য বলে মনে করি নে; বরং সত্যকথা বলতে গেলে, আমাদের বিশ্বাস যে, এই রূপান্ধতাটাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। রূপ তো একটা বাইরের জিনিস; শুধু তাই নয়, বাহ্য-বস্তুরও বাইরের জিনিস; ও জিনিসকে যারা উপেক্ষা, এমনকি অবজ্ঞা, করতে না শিখেছে তারা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান জানে না। আর আমরা আর-কিছু হই আর না-হই, বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে আধ্যাত্মিক। সে কথা যে অস্বীকার করবে সে নিশ্চয়ই স্বদেশ এবং স্বজাতি -দ্রোহী।

৩

রূপ জিনিসটাকে যাঁরা একটা পাপ মনে করেন তাঁদের মতে অবশ্য রূপের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু দলে পাতলা হলেও পৃথিবীতে এমন-সব লোক আছে যারা রূপকে মান্য করে শ্রদ্ধা করে, এমনকি পূজা করতেও প্রস্তুত; অথচ নিজেদের মহাপাপী মনে করে না। এই রূপভক্তের দল অবশ্য স্বদেশির কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে রূপের স্বত্বসাব্যস্ত করতে বাধ্য। আপসোসের কথা এই যে, যে সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, সেই সত্য এ দেশে প্রমাণ করতে হয়— অর্থাৎ একটা সহজ কথা বলতে গেলে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের তর্কস্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।

যা সকলে জানে— আছে, তা নেই বলাতে অতিবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই 'অতি'র অতিভক্ত হওয়াতে আমাদের ইতির জ্ঞান নষ্ট হয়েছে।

বস্তুর রূপ বলে যে একটি ধর্ম আছে এ হচ্ছে, শোনা কথা নয়, দেখা জিনিস। যাঁর চোখ-নামক ইন্দ্রিয় আছে তিনিই কখনো-না-কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে ; সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান শুরু করেন। কিন্তু আমি এই রূপ জিনিসটিকে অতিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখতে চাই ; কেননা অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।

৪

রূপের বিষয় দার্শনিকেরা কি বলেন আর না-বলেন, তাতে কিছু যায়-আসে না ; কেননা, যা দৃষ্টির অগোচর তাই দর্শনের বিষয়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বস্তুর রূপ বলে যে একটি গুণ আছে তা মানুষ-মাত্রেই জানে এবং মানে। তবে সেই গুণের পক্ষপাতী হওয়াটা গুণের কি দোষের, এই নিয়েই যা মতভেদ।

রূপকে আমরা ভক্তি করি নে, সম্ভবতঃ ভালোও বাসি নে। আপনারা সকলেই জানেন যে, হালে একটা মতের বহুলপ্রচার হয়েছে যার ভিতরকার কথা এই যে, জাতীয় আত্মমর্যাদা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতারই সদর পিঠ। সম্ভবতঃ এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে শ্রীকাতরতাও যে ঐ জাতীয় আত্মমর্যাদার লক্ষণ— এ কথা স্বীকার করা যায় না ; কেননা, বিশ্বমানবের সভ্যতার ইতিহাস এর বিরুদ্ধে চিরদিন সাক্ষি দিয়ে আসছে।

স্বদেশের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই অপর সভ্যজাতির কাছে রূপের মর্যাদা যে কত বেশি তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাওয়া যাবে। বর্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না, সে দেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিস্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে— অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘরদোর, মন্দির-প্রাসাদ, মানুষের অশনবসন, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি— নিত্য নূতন করে সুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। সে চেষ্টার ফল সু কি কু হচ্ছে সে স্বতন্ত্র কথা। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর

অবশ্য একটা কুৎসিত দিক আছে, যার নাম কমার্শিয়ালিজ্‌ম্ ; কিন্তু এই দিকটে কদর্য বলেই তার সর্বনাশের দিক। কমার্শিয়ালিজমের মূলে আছে লোভ। আর লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আপনারা সকলেই জানেন যে, রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু লোভের নেই।

ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে, চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে, রূপের আরাধনাই সে দেশের প্রকৃত ধর্ম বললেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরাপ্রীতিবশতঃ চীনজাপানের লোকের হাতে-গড়া এমন জিনিস নেই যার রূপ নেই— তা সে ঘটিই হোক আর বাটিই হোক। যাঁরা তাদের হাতের কাজ দেখেছেন তাঁরাই তাদের রূপসৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। মোঙ্গলজাতিকে ভগবান রূপ দেন নি, সম্ভবতঃ সেই কারণে সুন্দরকে তাদের নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়েছে। এই তো গেল বিদেশের কথা।

৫

আবার শুধু স্বদেশের নয়, স্বকালের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। প্রাচীন গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চার ইতিহাস তো জগদ্‌বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না ; কেননা, আমরা যাই বলি-নে কেন, সে সভ্যতাও মানবসভ্যতা— একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়, দেহ ছিল ; এবং সে দেহকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করেই গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সুমুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল তা হচ্ছে শুধু অশরীরী আত্মা। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁদের কতটা সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। আমরা যাকে সংস্কৃত কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড়-কিছু নেই ; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষতঃ রমণীদেহের, বর্ণনা ; কেননা, সে কাব্যসাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে তাও বস্তুতঃ রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারী-অঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে গ্রাহ্য করেন নি। সংস্কৃত সাহিত্যে হরেকরকমের ছবি আছে, কিন্তু ল্যাণ্ডস্‌কেপ্ নেই বললেই হয় ; অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক প্রকৃতির

অস্তিত্বের বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ল্যাণ্ডস্কেপ্ প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমের হাত থেকেও বেরোয় নি। তার কারণ, সেকালে মানুষে মানুষ বাদ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখতে শেখে নি। এর প্রমাণ শুধু আর্টে নয়, দর্শনে-বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নববিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবতঃ সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এ দেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন। রূপ-গুণের সন্ধিবিচ্ছেদ করা সেকালের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। শুধু তাই নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের কদাকারের উপর এতটাই ঘৃণা ছিল যে, পুরাকালের শূদ্রেরা যে দাসত্ব হতে মুক্তি পায় নি তার একটি প্রধান কারণ তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত— অন্ততঃ আর্যদের চোখে। সেকালের দর্শনের ভিতর অরূপের জ্ঞানের কথা থাকলেও সেকালের ধর্ম রূপজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরব্রহ্ম নিরাকার হলেও ভগবান, মন্দিরে মন্দিরে মূর্তিমান। প্রাচীন মতে নির্গুণ-ব্রহ্ম অরূপ এবং সগুণ-ব্রহ্ম সরূপ।

৬

সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্যের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবার কারণ, সভ্য-সমাজ বলতে বোঝায় গঠিত-সমাজ। যে সমাজের গড়ন নেই তাকে আমরা সভ্যসমাজ বলি নে। একালের ভাষায় বলতে হলে সমাজ হচ্ছে একটি অর্গ্যানিজম্; আর আপনারা সকলেই জানেন যে সকল অর্গ্যানিজম্ এক-জাতীয় নয়, ও-বস্তুর ভিতর উঁচুনীচুর প্রভেদ বিস্তর। অর্গ্যানিক্-জগতে প্রোটোপ্ল্যাজম্ হচ্ছে সবচাইতে নীচে এবং মানুষ সবচাইতে উপরে। এবং মানুষের সঙ্গে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের প্রত্যক্ষ পার্থক্য হচ্ছে রূপে; অপর-কোনো প্রভেদ আছে কি না, সে হচ্ছে তর্কের বিষয়। মানুষে যে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মের চাইতে রূপবান, এ বিষয়ে, আশা করি, কোনো মতভেদ নেই। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, যে সমাজের চেহারা যত সুন্দর সে সমাজ তত সভ্য। এরূপ হবার একটি স্পষ্ট কারণও আছে। এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ;

সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশি শক্তি চাই। সুতরাং মানুষ যেমন বাড়বার মুখে ক্রমে অধিক সুশ্রী হয়ে ওঠে এবং মরবার মুখে ক্রমে অধিক কুশ্রী হয়— জাতের পক্ষেও সেই একই নিয়ম খাটে। কদর্যতা দুর্বলতার বাহ্যলক্ষণ, সৌন্দর্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই মঠে-মন্দিরে-বেশে-ভূষায় মানুষের আশায়-ভাষায় নবসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় সেই-দিনই বাঙালি সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যবুদ্ধি যে টিঁকল না, বাংলার ঘরে-বাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফুটল না— তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন তা ষোলোআনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে কারণে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বাঙালি সমাজকে একাকার করবার চেষ্টায় বিফল হয়েছে, হয়তো সেই একই কারণে তা বাঙালি সভ্যতাকে সাকার করে তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি। ফলে, এক গান ছাড়া আর-কিছুকেই আমরা নবরূপ দিতে পারি নি।

৭

এসব কথা যদি সত্য হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগুড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বলছি।

সত্য ও সৌন্দর্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। হয় এদের ভক্তি করতে হবে, নয় অভক্তি করতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে উপেক্ষা করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে, আর সুন্দরকে অবজ্ঞা করলে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— এক সু, আর-এক কু। 'সু'কে অর্জন না করলে 'কু'কে বর্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়, ঘোরতর বিরাগ আছে।

আমরা দিনে-দুপুরে চীৎকার করে বলি যে, সাহিত্যে যে ফুলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।

এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে, আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তা হলেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে ; এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনো কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও রিফ্লেক্টর ভগবান আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ; সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে, তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এঁদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পুরোপুরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না তাতে আর বিচিত্র কি। জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক যোগাতে পারে ; কিন্তু রূপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য, উদর ও প্রাণ প্রোটোপ্ল্যাজ্‌মেরও আছে, কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেঁচে থাকা এবং তজ্জন্য উদরপূর্তি করা তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল ; অপরপক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল। আদিম মানবের কাছে ফুলের কোনো আদর নেই, কেননা ও-বস্তু আমাদের কোনো আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না ; ফুল আর-যাই হোক, চর্ব্য-চোষ্য কিংবা লেহ্য-পেয় নয়।

৮

এসব কথা শুনে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি সেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা নয়, সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি সাদা বলছি, সেই হচ্ছে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো ; সেইসমস্ত আলো রিফ্র্যাক্‌টেড অর্থাৎ ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। তথাস্তু। এই রিফ্র্যাক্‌শনের একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান -কারণ হচ্ছে পঞ্চভূতের বহির্ভূত ইথার-নামক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অতিরিক্ত

একটি পদার্থ। এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম হচ্ছে এই জড়জগৎটাকে উৎফুল্ল করা, রূপান্বিত করা। রূপ যে আমাদের স্থূলশরীরের কাজে লাগে না তার কারণ বিশ্বের স্থূলশরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরে রূপের স্পর্শে সেই সূক্ষ্মশরীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ স্থূলশরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র।

৯

ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধন-সূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাক্টেড হয়ে আসে তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।

মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা পুরো বুঝুক আর না-বুঝুক। সে তিনটি হচ্ছে সত্য শিব আর সুন্দর। যার রূপের প্রতি বিদ্বেষ আছে সে সুন্দরকে তাড়না করতে হলে হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়; যদিচ সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি সত্য কিংবা শিবের কখনো একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা কর— অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দুর্নীতির কথা। বিষয়বুদ্ধির মতে সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চর্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সুন্দরের উপর এ দেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এ দেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া, ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতি-অপরটির শত্রু, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ দেশ একের প্রতি অভক্তি

অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনো সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি, আমার বিশ্বাস সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে সে কথা উপেক্ষা ক'রে সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য— তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা ক'রে, কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরি লাগে।

শিবজ্ঞান আসে সবচাইতে আগে। কেননা, মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা। ও-জ্ঞান বিষয়বুদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও একটা অঙ্গমাত্র।

তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্ম-জ্ঞান এবং এ জ্ঞান আংশিক ভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়; এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।

সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।

অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান তার পরে। তার কারণ, যে জ্ঞান তাঁর জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন সে জ্ঞান বাতিল হয়ে গিয়েছে। সত্যকথা এই যে, মানবসমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনাসাপেক্ষ— খোয়ানো সহজ। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সাধনার সেই সঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতি সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলুক আর না-টলুক, তার চূড়া ভেঙে পড়েছে।

এ বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধদার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সব নীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।

আমার ধারণা, আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের অধিবাসী ; সুতরাং রূপ-লোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।

আর-এক কথা, রূপের চর্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি ; অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের কমার্শিয়ালিজম্ আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মত প্রভুত্ব করছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয়-শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়, মনের দারিদ্র্য। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাশনের বেশভূষা সাজসজ্জা আচার-অনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা, সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মত আমাদের ধনীসমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই-করুক, আমাদের রূপকানা করেছে। 'গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়'— ভারত-চন্দ্রের এ কথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়ঃ। তাতে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমনকি আমাদেরও নয়।

১৩২৩ ফাল্‌গুন

ফাল্‌গুন

আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখনো-কখনো বিনা-নোটিশে একেবারে হুড়্দ্দুম করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবরদখল করে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধার মত— আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ ক'রে, এবং দেখতে-না-দেখতে আসমুদ্রহিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে বাকি পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর-কেউ বলতে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর-পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর-একটিতে বেমালুম ভাবে গড়িয়ে যায় আমাদের স্বদেশি পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; বছরে চার বার নবকলেবর ধারণ করে, নবমূর্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখতে পান যে, বিলেতের চারটি ঋতু চতুর্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সে দেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রং তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি; আর বসন্তের রং ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তার পর নিদাঘের রং ঘন-সবুজ, আর শরতের গাঢ়-বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা-যাওয়ার ভঙ্গিও বিভিন্ন।

সে দেশে বসন্ত শীতের শবশীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে— মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদনসখা বসন্ত যেভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো-এক সুপ্রভাতে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল প'রে দাঁড়িয়ে হাসছে; অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট এমন

উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন— মানুষের কথা ছেড়ে দিন— পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই; শরৎও সে দেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সে দেশে শরৎ তার শেষ-উইল— পাণ্ডুলিপিতে নয়, রক্তাক্ষরে— লিখে রেখে যায়; কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার, পিত্ত নয়, রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্মম আলিঙ্গন হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত-রমণীর মত স্বহস্তে চিতারচনা করে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।

২

এ দেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হলেও তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্বে আমাদের নয়নগোচর হত। কিন্তু আজ যে ফাল্গুন মাসের পনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জানতে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখছি তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর— শীত ও বর্ষার— যুগলমূর্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায়-পালায় চলছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা, এহেন অসবর্ণ-বিবাহের ফলে শুধু সংকীর্ণ-বর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয়তো বসন্ত ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মত এ দেশ থেকে সরে পড়ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে; হয়তো সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ করে এই বিশ্বের এমন-কোনো নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে ফুলের গন্ধে পত্রের বর্ণে পাখির গানে বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক করে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে যাক, মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই; এবং অমাবস্যাও ঘুমবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না,

তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই, কোনো সার্থকতা নেই— বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে; কেননা, ও-ঋতুর ধর্মই হচ্ছে মানুষের মন-ভোলানো, তার কাজ-ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে সব ছাড়তে রাজি আছি, এক কাজ ছাড়া ; কেননা, অর্থ যদি কোথায়ও থাকে তো ঐ কাজেই আছে। বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন ; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনো চোখ না থাকে তা হলে কার জন্যই-বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই-বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই-বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা ? তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভালো। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভালো। শুনতে পাই, কোনো ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানবসভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তার পর দর্শনের, তার পর বিজ্ঞানের। এ কথা যদি সত্য হয় তো আমরা বাঙালিরা, আর-যেখানেই থাকি, মধ্যযুগে নেই ; আমাদের বর্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম-অবস্থা, নয় শেষ-অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয় তার প্রমাণ, আমরা চোখে কিছুই দেখি নে ; কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান করে তাঁর বাসন্তী মূর্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

৩

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্যকথা এই যে, আমরা একালে যা-কিছু জানি সেসব শুনেই জানি— অর্থাৎ দেখে কিংবা ঠেকে নয় ; তার কারণ, আমাদের কোনো-কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই— আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা-কথা, ও একটা গুজবমাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকাখাতার ভিতর পাই, গাছের কচি-পাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তা কস্মিন্‌কালেও এ ভূভারতে ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, সে রূপ বাংলার কেউ কখনো দেখে নি। প্রথমতঃ, মলয়সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তা হলে বাংলাদেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগবে না। আর

যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে পড়ে, তা হলেও লবঙ্গলতাকে তা কখনোই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক-না সে লতা, তার এ দেশে দোদুল্যমান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং ছিল না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা 'কাবেরীতীরে কালাগুরুতরু'র উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা ও বাক্যটি, যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না, এ কথা জোর করে আমরা বলতে পারি নে; অপরপক্ষে, অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব, সে কথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমনকি প্রমাণ পর্যন্ত, করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক— অর্থাৎ সাদাভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোনো কথায় বিশ্বাস করা যায় না; অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই কবিবর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মনগড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করছিলেন; এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই করে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবিপ্রসিদ্ধিমাত্র; ও-বস্তুর বাস্তবিক কোনো অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদতাড়নার অপেক্ষা না রেখে অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রং দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হলেও বকুলফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়— এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন; কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিল। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন যে, সত্য ও সুন্দর একই বস্তু; কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য— অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে বসন্তঋতু থাকা উচিত— এই ধারণাবশতঃ সেকালের কবিরা

কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ ক'রে প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

৪

আমার এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃতকাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল সত্যই বক্তব্য— সে সত্য মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনো মিল নেই; সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিল কথা ভালো করে বলায়, একালে ও গুণের পরিচয় চুপ করে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক, তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্মকথা উদ্ধার করা যায় কি না।

সংস্কৃত-মতে বসন্ত মদনসখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও-বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব রূপান্তর ঘটে। তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে-গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আত্মার ধর্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্তিস্বরূপে বসন্তঋতু কল্পিত হয়েছে; আসলে ও-ঋতুর কোনো অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে, সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ এ কথা আমরা কেউ ভাবি নে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও দেহ আশ্রয় করে না; অথচ পয়লা ফাল্গুন যে বসন্তের জন্মতিথি, এ কথা আমরা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এসব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়, তা হলেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ উভয়ে সমধর্মী হলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, এ কথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরেজিতে

প্যারালালিজ্‌ম্— সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে তো অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ তো পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষকথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিল না তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুন। যে জিনিস মানুষের মনগড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের-ঋতু গড়ে তুলেছেন সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন তখন কবিদের কর্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাঁর মূর্তির পূজা করতে হবে; কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্ধান হন, এ সত্য তো ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্যকর্তব্য তার কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায় তা হলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এস্থলে সাহিত্যসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতী-পূজা বলি, আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

১৩২৩ চৈত্র

প্রাণের কথা

ভবানীপুর সাহিত্যসমিতিতে কথিত

এ রকম সভার সভাপতির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে প্রবন্ধপাঠকের গুণগান করা, কিন্তু সে কর্তব্য পালন করা আমার পক্ষে উচিত হবে কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমার বন্ধু এবং সাহিত্যিক বন্ধু। বন্ধুর মুখে বন্ধুর প্রশংসা একালে ভদ্রসমাজে অভদ্রতা বলেই গণ্য। ইংরেজিতে যাকে বলে মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন, সে ব্যাপারটি আমরা নিতান্ত হাস্যকর মনে করি; অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, গুণানুরাগ উভয়পাক্ষিক না হলে কি প্রণয় কি বন্ধুত্ব কোনোটিই স্থায়ী হয় না। সে যাই হোক, বন্ধুস্তুতি সাহিত্যসমাজে যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু আমি বর্তমান সাহিত্যসমাজের নানারূপ নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি, সে কারণ আবার একটা নূতন অপরাধে অভিযুক্ত হতে অপ্রবৃত্তি হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রবন্ধটি শুনে আমি প্রবন্ধলেখকের আর কিছুর না হোক, সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে। প্রবন্ধপাঠক মহাশয় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা যুগপৎ সৎসাহস ও দুঃসাহস। এ পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যা সব-চাইতে মূল্যবান অথচ দুর্বোধ্য— অর্থাৎ জীবন— ঘটকমহাশয় তারই উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অবশ্য দুঃসাহসের কাজ।

ঘটকমহাশয়ের প্রবন্ধের সার কথা এই যে, উপনিষদের সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি নানা দেশের নানা দার্শনিক ও নানা বৈজ্ঞানিক জীবনসমস্যার আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেউ তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। আজ পর্যন্ত জীবনের এমন ভাষ্য কেউ করতে পারেন নি যার উপর আর টীকাটিপ্পনী চলে না।

আমার মনে হয় দর্শনবিজ্ঞানের এ নিষ্ফলতার কারণও স্পষ্ট। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে প্রতি লোকের পক্ষে যে বাধা, সমগ্র মানব-জাতির পক্ষেও সেই একই বাধা রয়েছে। জীবনসমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে মৃত্যু। মৃত্যুর অপর পারে আছে— হয় অনন্ত জীবন, নয় অনন্ত মরণ, হয় অমরত্ব নয় নির্বাণ। এর কোনো অবস্থাতেই জীবনের আর কোনোই সমস্যা

থাকবে না। যদি আমরা অমরত্ব লাভ করি তা হলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না; অপরপক্ষে যদি নির্বাণ লাভ করি তো জানবার কেউ থাকবে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র মানবজাতি না মরা তক্ এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করতে পারবে না। আর যদি কোনোদিন পারে তা হলে সেই দিনই মানবজাতির মৃত্যু হবে; কেননা তখন আমাদের আর কিছু জানবার কিংবা করবার জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের পক্ষে সর্বজ্ঞ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নিষ্ক্রিয় হওয়া, অর্থাৎ মৃত হওয়া; কেননা প্রাণ বিশেষ্যও নয়, বিশেষণও নয়— ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র।

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা-হয় একটা অর্থ স্থির করে না নিলে মানুষে জীবনযাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক, এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড় কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই— মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনরুত্থাপন করে সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

২

সতীশবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন— এ বিষয়ে যে নানা মুনির নানা মত আছে শুধু তাই নয়, একই রকমের মত নানা যুগে নানা আকারে দেখা দেয়। দর্শনবিজ্ঞানের কাছে জীবনের সমস্যাটা কি, সেইটে বুঝলে সে সমস্যার মীমাংসাটাও যে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জীবন পদার্থটিকে আমরা সকলেই চিনি, কেননা সেটিকে নিয়ে আমাদের নিত্য কারবার করতে হয়। কিন্তু তার আদি ও অন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। সহজজ্ঞানের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ, অনুমান প্রমাণের

দ্বারা তারই জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জীবনের আদি অন্ত আমরা জানি নে, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দু রকম ভাবে বলা যায়। এক, জীবনের আদিতে আছে জন্ম আর অন্তে মৃত্যু; আর-এক, জীবন অনাদি ও অনন্ত। জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-তত্ত্ব হয় এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষ -ভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এ দুয়ের কোনো মীমাংসাতেই আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র এগোয় না; অর্থাৎ এ দুই তত্ত্বের যেটাই গ্রাহ্য কর না, যা আমাদের জানা তা সমান জানাই থেকে যায়, আর যা অজানা তাও সমান অজানা থেকে যায়। সুতরাং এ রকম মীমাংসাতে যাঁদের মনস্তুষ্টি হয় না তাঁরা প্রথমে জীবনের উৎপত্তি ও পরে তার পরিণতির সন্ধানে অগ্রসর হন। মোটামুটি ধরতে গেলে এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করে বিজ্ঞান, আর পরিণতির সন্ধান করে দর্শন।

এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেহও আছে মনও আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। সুতরাং কেউ প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ দেহের বিকার; আর কেউ বা প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ আত্মার বিকার। অর্থাৎ কারও মতে প্রাণ মূলতঃ আধিভৌতিক, কারও মতে আধ্যাত্মিক। সুতরাং সকল দেশে সকল যুগে জড়বাদ ও আত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়— কালের গুণে কখনো এ মত, কখনো ও-মত প্রবল হয়ে ওঠে; সে মতের গুণে নয়, যুগের গুণে। আমার বিশ্বাস একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ মূলে একই মত। কেননা উভয় মতেই এমন-একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের স্থাপনা করা হয়, যার আসলে কোনো স্থিরতা নেই।

অবশ্য এ দুই ছাড়া একটা তৃতীয় এবং মধ্য পন্থাও আছে, সে হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্তা গ্রাহ্য করা। এই মাধ্যমিক মতের নাম ভাইটালিজ্‌ম্‌, এবং আমি নিজে এই মধ্যমতাবলম্বী। আমার বিশ্বাস, অপ্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসংগত হবে না যে, প্রাণ কখনো অপ্রাণে পরিণত হবে না। তার পর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয় তা হলে প্রাণকেই জগতের মূল পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বলতে পারি— জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড় প্রাণের সুপ্ত অবস্থা, আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেহও আছে,

প্রাণও আছে, মনও আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে এক লম্ফে দেহ থেকে আত্মায় আরোহণ করা যেমন সম্ভব, দর্শনের পক্ষেও এক লম্ফে আত্মা থেকে দেহে অবরোহণ করাও তেমনি সম্ভব। জর্মান বৈজ্ঞানিক হেকেল এবং জর্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তার পর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এসব দার্শনিক হাতসাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না তার কারণ, সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহমনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন ক'রে মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শনবিজ্ঞানের মনগড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়।

৩

প্রাণের এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না। শুধু তাই নয়, ভাইটালিজ্‌ম্ কথাটাও অনেকের কাছে কর্ণশূল। এর কারণও স্পষ্ট। ভাইটাল ফোর্স নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা। এ জগতের সকল পদার্থ সকল ব্যাপারই যখন জড়জগতের কতকগুলি ছোটবড় নিয়মের অধীন, তখন একমাত্র প্রাণই যে স্বাধীন এ কথা বিনা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে যা বিভিন্ন মূলতঃ তা যে অভিন্ন, এই সত্য প্রমাণ করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাণ যে জড়শক্তিরই একটি বিশেষ পরিণাম, এটা প্রমাণ না করতে পারলে বিজ্ঞানের অঙ্কে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে এই ফাঁক বোজাবার বহু চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, সে চেষ্টা অদ্যাবধি সফল হয় নি। প্রাণ জড়জগতে লীন হতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া, এ কথা কে না জানে?

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, ইউরোপ যা প্রমাণ করতে পারে নি বাংলা তা করেছে; অর্থাৎ তাঁর মতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু হাতে-কলমে

প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জড়ে ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের সর্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানাচার্য এ কথা কোথায়ও বলেন নি যে, জড়ে ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই। আমার ধারণা, তিনি প্রাণের উৎপত্তি নয়, তার অভিব্যক্তি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করা যাক। মানুষমাত্রই জানে যে, যেমন মানুষের ও পশুর প্রাণ আছে তেমনি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এমনকি, ছোট ছেলেরাও জানে যে, গাছপালা জন্মায় ও মরে। সুতরাং মানুষ পশু ও উদ্ভিদ্ যে গুণে সমধর্মী সেই গুণের পরিচয় নেবার চেষ্টা বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, অ্যাসিমিলেশন এবং রিপ্রোডাকশন— এই দুই গুণে তিন শ্রেণীর প্রাণীই সমধর্মী। অর্থাৎ এতদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ছিল প্রাণের লীস্ট কমন মাল্‌টিপ্‌ল্— একালের স্কুলের বাংলায় যাকে বলে লসাগু।

আচার্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এ দুই ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে প্রাণীমাত্রেই সমধর্মী। তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করেছেন সে হচ্ছে এই যে, প্রাণীমাত্রেই একই ব্যথার ব্যথী। উদ্ভিদের শিরায় উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিলে ও-বস্তু আমাদের মতই সাড়া দেয়, অর্থাৎ তার দেহে স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সব ফুটে ওঠে। এককথায়, আচার্য বসু উদ্ভিদ্‌জগতেও হৃদয়ের আবিষ্কার করেছেন, পূর্বাচার্যেরা উদর ও মিথুনত্বের সন্ধান নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। বসুমহাশয় প্রাণের লসাগু-তে সন্তুষ্ট না থেকে তার গসাগু অর্থাৎ গ্রেটেস্ট কমন মেজার্ -এর আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। যখন উদ্ভিদের হৃদয় আবিষ্কৃত হয়েছে তখন সম্ভবতঃ কালে তার মস্তিষ্কও আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু তাতে জড় ও জীবের ভেদ নষ্ট হবে না, কেননা জড়পদার্থের যখন উদরই নেই তখন তার অন্তরে হৃদয়-মস্তিষ্কাদি থাকবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। যে বস্তুর দেহে অন্নময় কোষ নেই, তার অন্তরে মনোময় কোষের দর্শনলাভ তাঁরাই করতে পারেন যাঁদের চোখে আকাশকুসুম ধরা পড়ে।

৪

আমি বৈজ্ঞানিকও নই, দার্শনিকও নই ; সুতরাং এতক্ষণ যে অনধিকার-চর্চা করলুম, তার ভিতর চাই-কি কিছু সার নাও থাকতে পারে। কিন্তু জীবন জিনিসটে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়, ও-বস্তু আমাদের দেহেও আছে। সুতরাং প্রাণের সমস্যার মীমাংসা আমাদেরও করতে হবে, আর কিছুর জন্য

না হোক, শুধু প্রাণধারণ করবার জন্য। আমাদের পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে প্রাণের মূল্য, সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের সমস্যার ঠিক বিপরীত। প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর অভেদজ্ঞান নয়, ভেদজ্ঞানের উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেননা, যে গুণে প্রাণীজগতে মানুষ অসামান্য সেই গুণেই সে মানুষ।

উদ্ভিদ্ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্মী, সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবজীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে পারি নে, কোন্ কোন্ ধর্মে আমরা ও-দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে বিভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়; এবং এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের কোনোরূপ অনুমান-প্রমাণের দরকার নেই, প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই যে, উদ্ভিদ্ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এককথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে স্থিতি।

তার পর দেখতে পাই, পশুরা সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম হচ্ছে গতি।

তার পর আসে মানুষ। যেহেতু আমরা পশু, সে-কারণ আমাদের গতি তো আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে, যা পশুর নেই। এককথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম হচ্ছে মতি।

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সবচাইতে গণ্ডীবদ্ধ, অর্থাৎ উদ্ভিদ্ হচ্ছে বদ্ধ জীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত কিন্তু নৈসর্গিক স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অর্থাৎ পশু বদ্ধমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না মাটির না স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার অর্থ হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত, সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, মানুষের পক্ষে প্রাণীজগতে পশ্চাদ্‌পদ হওয়া সহজ। প্রাণের প্রতি মূর্ত অবস্থারই এমন-সব বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা আছে যা তার অপর মূর্ত অবস্থার নেই। উদ্ভিদ্ নিশ্চল, অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না যোগায় তো সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মরতে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপরপক্ষে তার

সুবিধা এই যে, তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনোরূপ পরিশ্রম করতে হয় না, সে আলো বাতাস মাটি জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি আছে, অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়, সে এক দেশ ছেড়ে আর-এক দেশে চলে যেতে পারে। এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে, সে নিজগুণে জড়জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই শামিল; কেননা সে শিকড়বদ্ধ না হোক, শিকলবদ্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়; সে স্থানত্যাগ করতেও পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করেও নিতে পারে। একালের ভাষায় যাকে 'বেষ্টনী' বলে মানুষের পক্ষে তা গণ্ডী নয়, মানুষের স্থিতিগতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে, তাকে জীবন-ধারণ করবার জন্য শরীর ও মন দুই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয়, মন খাটাতে হয় না; উদ্ভিদ্‌কে শরীর মন দুয়ের কোনোটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সবচাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক্, মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর-মন দুয়ের কোনোটিরই আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই তা হলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব; আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই তা হলে আমরা উদ্ভিদ্‌কে আদর্শ করে তুলব, এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে চেষ্টা করব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসব। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ' এই সনাতন সত্যটি মানুষের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য, নচেৎ মানবজীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর-একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে-বাইরে যে গতিশক্তি আছে, তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভপরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ুঃ বৃদ্ধির অপর কোনো অর্থ নেই।

১৩২৪ শ্রাবণ

বর্ষা

এমন দিনে কি লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুইই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কি যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তার পর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনো-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতা-পাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তার পর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তার পর ব্যতিব্যস্ত হবে, তার পর মাথা নাড়বে, তার পর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর

তার মুখে সীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ঐ অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটখাট ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুনগুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি কখনো আধখানা হয়ে, আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যেসব কবিতা যে-সব গান আজ আমার মনে পড়ছে সে সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাঙলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীত গোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালি একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে— 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেন নি, শেক্‌স্‌পীয়রও বলেন নি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়— পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেইসব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি

চলে যাচ্ছে। ভালো কথা— এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, বাংলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবি আমলের বাঙালি কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হত না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকি বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্রবিদ্যুতের একটু-আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই এক শ—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে সেসব এতই বিচ্ছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তার পর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের ল অ্যাণ্ড অর্ডারকে আমরা যতই বিদ্রূপ করি, ভাবের ল অ্যাণ্ড অর্ডারকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য তো মাথায় থাক্‌, সংবাদপত্রও লিখতে পারি নে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বদ্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুক্‌নো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব

অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুক্‌নো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বা'র করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না ; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি।

১৩২৯ আষাঢ়

বর্ষার দিন

আজ ঘুম থেকে উঠে চোখ চেয়ে দেখি আকাশে আলো নেই। আকাশের চেহারা দেখে অর্ধসুপ্ত লোক ঠিক বুঝতে পারে না যে, সময়টা সকাল না সন্ধ্যে। এ ভুল হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ সকাল বিকাল দুই কালই হচ্ছে রাত্রি-দিনের সন্ধিস্থল। তার পর যখন দেখা যায় যে, উপর থেকে যা নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে তা সূর্যের মৃদু কিরণ নয় জলের সূক্ষ্ম ধারা, তখন জ্ঞান হয় যে এটা দিন বটে, কিন্তু বর্ষার দিন।

এমন দিনে কাব্য-ব্যসনী লোকদের মনে নানারকম পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে। বর্ষার যে রূপ ও যে গুণের কথা পূর্ব-কবিরা আমাদের জাতীয় স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছেন তা আবার মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হয়।

অনেকে বলেন যে, কবির উক্তি আমাদের বস্তুজ্ঞানের বাধাস্বরূপ। যা চোখে দেখবার জিনিস, শোনা কথা নাকি সে জিনিসের ও চোখের ভিতর একটা পর্দা ফেলে দেয়। এ পৃথিবীতে সব জিনিসকেই নিজের চোখ দিয়ে দেখবার সংকল্পটা অতি সাধু। কিন্তু স্মৃতি যে প্রত্যক্ষের অন্তরায় এ কথাটা সত্য নয়। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার ভিতর অনেকখানি স্মৃতি আছে, এতখানি যে প্রত্যক্ষ করবার ভিতর চোখই কম ও মনই বেশি। এ কথা যাঁরা মানতে রাজি নন তাঁরা বের্গসঁর *Matter and Memory* নামক গ্রন্থখানি পড়ে দেখলেই ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের সঙ্গে স্মৃতিগত বিষয়ের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। সে যাই হোক, কবির হয়ে শুধু এই কথাটা আমি বলতে চাই যে, কবির উক্তি আমাদের অনেকেরই বোজা চোখকে খুলে দেয়, কারও খোলা চোখকে বুজিয়ে দেয় না। কবিতা পড়তে পড়তে অনেকের অবশ্য চোখ ঢলে আসে, কিন্তু তার কারণ স্বতন্ত্র।

২

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে ও-সাহিত্য বর্ষার কথায় মুখরিত। বর্ষা যে পূর্ব-কবিদের এতদূর প্রিয় ছিল তার কারণ সেকালেও বর্ষা দেখা দিত গ্রীষ্মের পিঠ পিঠ। ইংরেজ কবিরা যে শতমুখে বসন্তের গুণগান করেন তার কারণ সে দেশে বসন্ত আসে শীতের

পিঠ পিঠ। ফলে সে দেশে শীতে ম্রিয়মাণ প্রকৃতি বসন্তে আবার নবজীবন লাভ করে। বিলেতি শীতের কঠোরতা যিনি রক্তমাংসে অনুভব করেছেন, যেমন আমি করেছি, তিনিই সে দেশে বসন্তঋতু-স্পর্শে প্রকৃতি কি আনন্দে বেঁচে ওঠে তা মর্মে চর্মে অনুভব করেছেন। সে দেশ ও ঋতু প্রকৃতির ফুলসজ্জা।

সংস্কৃত কবিরা যে দেশের লোক সে দেশে গ্রীষ্ম বিলেতি শীতের চাইতেও ভীষণ ও মারাত্মক। বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতে গ্রীষ্মের একটি লম্বা বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা পড়লেও আমাদের গায়ে জ্বর আসে। এ বর্ণনা প্রকৃতির ঘরে আগুন লাগবার বর্ণনা। যে ঋতুতে বাতাস আসে আগুনের হলকার মত, যে ঋতুতে আলোক অগ্নির রূপ ধারণ করে, যে ঋতুতে পত্র পুষ্প সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর বৃক্ষলতা সব কঙ্কালসার হয়ে ওঠে, সে ঋতুর অন্তে বর্ষার আগমন, প্রকৃতির ঘরে নবজীবনের আগমন। কালিদাস একটি শ্লোকে সেকালের কবিদের মনের আসল কথা বলে দিয়েছেন—

> বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী
> তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
> জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
> দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥

পৃথিবীতে যে বস্তুই 'প্রাণিনাং প্রাণভূতো' সেই বস্তুই শুধু কামিনী-চিত্তহারী নয় কবি-চিত্তহারীও। আর কালিদাস যে বলেছেন 'কামিনী-চিত্তহারী' তার অর্থ— যা সর্বমানবের চিত্তহারী তা স্ত্রীজাতিরও চিত্তহারী হবার কথা, কেননা স্ত্রীলোকও মানুষ। উপরন্তু স্ত্রীজাতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এত ঘনিষ্ঠ যে অনেকের ধারণা নারী ও প্রকৃতি একই বস্তু, ও-দুয়ের মধ্যে পুরুষ শুধু প্রক্ষিপ্ত।

৩

আমাদের দেশে গ্রীষ্মের পরে বর্ষার আবির্ভাব প্রকৃতির একটা অপরূপ এবং অদ্ভুত বদল। গ্রীষ্ম অন্ততঃ এ দেশে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে বর্ষায় পরিণত হয় না। এ পরিবর্তন হ্রাসও নয় বৃদ্ধিও নয়, একেবারে বিপর্যয়। বর্ষা গ্রীষ্মের evolution নয়, আমূল revolution। সুতরাং বর্ষার আগমন কানারও

চোখে পড়ে, কালারও কানে বাজে। কালিদাস বর্ষাঋতুর বর্ণনা এই বলে আরম্ভ করেছেন—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর-
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥

বর্ষার এতাদৃশ রূপবর্ণনা ইউরোপীয় সাহিত্যে নেই। কারণ এ ঋতু ও-দেশে সে দেশে প্রবেশ করে না। ইংলণ্ডে দেখেছি, সেখানে বৃষ্টি আছে কিন্তু বর্ষা নেই। বিলিতি প্রকৃতি সদাসর্বদা মুখ ভার ক'রে থাকেন এবং যখন তখন কাঁদতে শুরু করেন, আর সে কান্না হচ্ছে নাকে কান্না, তা দেখে প্রকৃতির উপর মায়া হয় না, রাগ ধরে। সে দেশে বিদ্যুৎ রণপতাকা নয়— পিদিমের সলতে, তার মুখের আলো প্রকৃতির অট্টহাস্য নয়— রোগীর মুখের কষ্টহাসি। আর সে দেশের মেঘের ডাক অশনিশব্দমর্দল নয়, গাব-চটা বাঁয়ার বুকচাপা গ্যাঁঙরানি। এককথায় বিলেতের বর্ষা থিয়েটারের বর্ষা। ও গোলাপপাশের বৃষ্টিতে কারও গা ভেজে না, ও টিনের বজ্রধ্বনিতে কারও কান কালা হয় না, ও মেকি বিদ্যুতের আলোতে কারও চোখ কানা হয় না। বিলেতের বর্ষার ভিতর চমকও নেই চটকও নেই। ওরকম ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে জিনিস কবির মনকে স্পর্শ করে না, তাই বিলেতি সাহিত্যে বর্ষার কোনো রূপবর্ণনা নেই। যার রূপ নেই তার রূপবর্ণনা কতকটা যার মাথা নেই তার মাথাব্যথার মত। শেলির মন অবশ্য পর্বতশৃঙ্গে মেঘলোকে বিচরণ করত। কিন্তু সে মেঘ হচ্ছে কুয়াশা, তার কোনো পরিচ্ছিন্ন মূর্তি নেই। সুতরাং তাঁর আঁকা প্রকৃতির ছবি কোনো ফ্রেমে আঁটা যায় না, যেমন West Wind -কে বাঁশির ভিতর পোরা যায় না। ফ্রেম কথাটা শুনে সেইসব লোক চমকে উঠবেন যাঁরা বলেন যে, অসীমকে নিয়েই কবির কারবার। অবশ্য তাই। জ্ঞানের অসীম সীমার বাইরে, কিন্তু আর্টের অসীম সীমার ভিতর।

৪

বর্ষা যে রাজার মত হাতিতে চড়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে ধুমধড়াক্কা ক'রে আসে, এ ঘটনা এ দেশে চিরপুরাতন ও চিরনবীন। সুতরাং যুগ যুগ ধ'রে কবিরা বর্ষার এই দিগ্‌বিজয়ী রাজরূপ দেখে এসেছে এবং সে-রূপ

ভাষায় অঙ্কিত করে অপরের চোখের স্নমুখে ধরে দিয়েছে। আমাদের দেশে বর্ষার রূপের মত আমাদের কাব্যসাহিত্যে তার বর্ণনাও চিরপুরাতন ও চির-নবীন। মানুষের পুনরুক্তি প্রকৃতির পুনরুক্তির অনুবাদ মাত্র।

কালিদাসের বহুপরবর্তী কবি বর্ষাঋতুর ঐ রাজরূপ দর্শন করেছেন, সুতরাং সেই রূপেরই বর্ণনা করেছেন। এমনকি হিন্দি কবিরা ও-ছবি তাদের গানে আজও ফুর্তি করে আঁকছে—

যোধন বেশে বাদর আওয়ল

এ-পদটি মল্লার রাগের একটি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদের প্রথম পদ। ও গান যখন প্রথম শুনি তখন আমার চোখের স্নমুখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠেছিল, কানের কাছে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর অবিরল পরং বেজে উঠেছিল।

এ গান শুনে যদি কেউ বলেন যে, উক্ত হিন্দি গানের রচয়িতা কালিদাসের কবিতা চুরি করেছেন তা হলে বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—

বাদল-মেঘে মাদল বাজে

সে কথাও অশনিশব্দমর্দলের বাংলা কথায় অনুবাদ। সাহিত্যে এরূপ চুরি-ধরা বিদ্যে বাতুলতার না হোক বালিশতার পরিচায়ক। কারণ এ বিদ্যার বলে এও প্রমাণ করা যায় যে, কলিদাস তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনা বেমালুম আত্মসাৎ করেছিলেন। মৃচ্ছকটিক-প্রকরণে বিট বসন্তসেনাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

পশ্য পশ্য। অয়মপরঃ—
পবনচপলবেগঃ স্থূলধারাশরৌঘঃ।
স্তনিতপটহনাদঃ স্পষ্টবিদ্যুৎপতাকঃ।
হরতি করসমূহং খে শশাঙ্কস্য মেঘো
নৃপ ইব পুরমধ্যে মন্দবীর্যস্য শত্রোঃ॥

উক্ত শ্লোকের ভিতর স্পষ্ট বিদ্যুৎপতাকা আছে, পটহনিনাদ আছে, নৃপ আছে। অর্থাৎ কালিদাসের শ্লোকের মালমসলা সবই আছে। আর মৃচ্ছকটিক হচ্ছে দরিদ্র চারুদত্তের রাজসংস্করণ, কারণ তা হচ্ছে রাজা শূদ্রকের সংস্করণ। দরিদ্র চারুদত্ত ভাসের লেখা; আর ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি তা স্বয়ং কালিদাস নিজমুখেই স্বীকার করেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় শুধু এই মাত্র যে, বর্ষার রূপ এ দেশে সনাতন, তাই তার বর্ণনাও সনাতন। আর শাস্ত্রে বলে, যা সনাতন তাই অপৌরুষেয়।

৫

স্মৃতি প্রত্যক্ষের পরিপন্থী নয়, কিন্তু শ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে দর্শনের প্রতিবন্ধক। অনেকের দেহে কান চোখের প্রতিযোগী। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হলে নাম রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা যদি কোনো বিষয়ের কথা শুনে নিশ্চিন্ত থাকি তা হলে সে বিষয়ের দিকে চোখ চেয়ে দেখবার আমাদের প্রবৃত্তি থাকে না। কথা যখন কিংবদন্তী হয়ে ওঠে তখন অনেকের কাছে তা বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য হয়। একটা সর্বলোকবিদিত উদাহরণ নেওয়া যাক।

বহুকাল থেকে শুনে এসেছি যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামতে বাধ্য, কেননা কালিদাস বলেছেন 'আষাঢ়স্থ প্রথম দিবসে' দেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

কালিদাস শুধু বড় কবি নন, সেইসঙ্গে তিনি যে বড় জিয়োগ্রাফার এবং বড় অর্নিথলজিস্ট তা জানি, কিন্তু উপরন্তু তিনি যে একজন অভ্রান্ত মেটিয়রলজিস্ট তা বিশ্বাস করা কঠিন। মেঘদূতকে মেটিয়রলজিকাল অফিসের রিপোর্ট হিসেবে গ্রাহ্য করতে আমি কুণ্ঠিত। কারণ মেঘদূত আর যাই হোক মেঘলোক সম্বন্ধে ছেলেভুলানো সংবাদের প্রচারক নয়। মেঘকে দূত করতে হলে তাকে বর্ষাঋতুতেই যাত্রা করাতে হয়। আর কোন্ পথ দিয়ে উড়ে অলকায় যেতে হবে সে বিষয়েও কালিদাস উক্ত দূতকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে উপদেশ দিয়েছেন। কালিদাস খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

অর্থাৎ আগে পথের কথা শোনো, তার পর অলকায় গিয়ে কার কাছে কি বলতে হবে সে কথা পরে শুনো। এ কারণ পূর্বমেঘ আগাগোড়াই পথের কথা।

৬

এ পথ ভারতবর্ষের উত্তরাপথ। বাংলা থেকে অন্ততঃ দেড় হাজার মাইল দূরে। সুতরাং সে দেশে কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়, তার থেকে বাংলায় কোন্ দিন বৃষ্টি নামবে তা বলা যায় না, অন্ততঃ ন্যায়শাস্ত্রের এমন কোনো নিয়ম নেই যার বলে রামগিরি থেকে এক লম্ফে কলকাতায় অবতীর্ণ হওয়া যায়।

কিন্তু আসল কথা এই যে, কালিদাস এমন কথা বলেন নি যে পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে। তাঁর কথা এই যে—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥

সমস্ত শ্লোকটা উদ্‌ধৃত করে দিলুম এই জন্যে যে সকলেই দেখতে পাবেন যে, এর ভিতর বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। যক্ষ যা দেখেছিলেন তা হচ্ছে 'মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুং' অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে নেপ্‌টে-লাগা মেঘ। এ রকম মেঘ বাংলাদেশে কখনো চোখে পড়ে না, দেখা যায় শুধু পাহাড়ে পর্বতে। যক্ষ যে তা দেখেছিলেন তাও অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই, কেননা তিনি বাস করতেন তস্মিন্নদ্রৌ— সেই পাহাড়ে। সুতরাং বাংলাদেশে যাঁরা পয়লা আষাঢ়ে সেই রকম উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, যথা—

চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে

তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক যাঁরা কথার মোহে ইন্দ্রিয়ের মাথা খেয়ে বসে আছেন। শুনতে পাই বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, কথার অর্থ ভুল বোঝা থেকেই mythএর জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকদের এ-মতের সত্যতার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

৭

আষাঢ় সম্বন্ধে বাংলাদেশে আর-একটি কিংবদন্তী আছে, যা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে এবং চিরকাল লেগেছে। কথায় বলে 'আষাঢ়ে গল্প', কিন্তু গল্পের সঙ্গে আষাঢ়ের কি নৈসর্গিক যোগাযোগ আছে তা আমি ভেবে পাই নে।

আমার বিশ্বাস, গল্পের অনুকূল ঋতু হচ্ছে শীত, বর্ষা নয়। কেননা গল্প লোকে রাত্তিরেই বলে। তাই পৃথিবীর অফুরন্ত গল্পরাশি একাধিক সহস্র রজনীতেই বলা হয়েছিল। শীতকাল যে গল্প বলার ও গল্প শোনার উপযুক্ত সময় তার কারণ শীতকালে রাত বড় দিন ছোট। অপরপক্ষে আষাঢ়ের দিনরাতের হিসেব শীতের ঠিক উলটো; একালের দিন বড়, রাত ছোট। দিনের আলোতে গল্পের আলাদিনের প্রদীপ জ্বালানো যায় না।

তবে যে লোকে মনে করে যে, আষাঢ়ের দিন গল্পের পক্ষে প্রশস্ত দিন, তার একমাত্র কারণ আষাঢ়ের দিন প্রশস্ত। কোনো বস্তুর পরিমাণ থেকে তার গুণ নির্ণয় করবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, পরিমাণ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর গুণ মনোগ্রাহ্য। আর সাধারণতঃ আমাদের পক্ষে মনকে খাটানোর চাইতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা ঢের সহজ। তবে একদল লোক, অর্থাৎ হেগেলের শিষ্যরা, আমার কথা শুনে হাসবেন। তাঁদের গুরু বলেছেন যে কোয়ান্‌টিটি বাড়লেই তা কোয়ালিটি হয়ে ওঠে। এই কারণেই সমাজ হচ্ছে গুণনিধি আর ব্যক্তি নির্গুণ; আর সেই জাতিই অতিমানুষের জাত যে জাত অর্ধেক পৃথিবীর মাটির মালিক।

এ দার্শনিক মতের প্রতিবাদ করবার আমার সাহসও নেই ইচ্ছেও নেই। কেননা দেখতে পাই এ দেশেও বেশির ভাগ লোক হেগেল না পড়েও হেগেলের মতাবলম্বী হয়েছেন। ভিড়ে মিশে যাওয়ার নামই যে পরম পুরুষার্থ, এ জ্ঞান এখন সর্বসাধারণ হয়েছে। গোলে হরিবোল দেওয়াই যে দেশ-উদ্ধারের একমাত্র উপায়, এই হচ্ছে বর্তমান হট্টমত। এ জর্মান-মত সম্বন্ধে যাঁর মনে দ্বিধা আছে তাঁকে আগে একটি মহাসমস্যার মীমাংসা ক'রে পরে মুখ খুলতে হবে। সে সমস্যা এই: কোয়ান্‌টিটি কোয়ালিটির অবনতি, না, কোয়ালিটি কোয়ান্‌টিটির পরিণতি? এ বিচারের উপযুক্ত সময় হচ্ছে নিদাঘ, বর্ষা নয়। কারণ উক্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য তার উপর প্রচণ্ড আলো ফেলতে হবে, যে আলো এই মেঘলা দিনে আকাশেও নেই, মনেও নেই। আজকের দিনে এই গা-ঢাকা আলোর ভিতর বাজে কথা বলাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কালিদাস বলেছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ

সুতরাং আমার মনও যে অন্যথাবৃত্তি অর্থাৎ অদার্শনিক হয়ে পড়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৮

এখন পুরনো কথায় ফিরে যাওয়া যাক। 'আষাঢ়ে গল্প' কথাটার সৃষ্টি হল কি সূত্রে তারই এখন অনুসন্ধান করা যাক, কিন্তু সে সূত্র খুঁজতে হলে আমাকে আর-এক শাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হবে— যে শাস্ত্রের ভিতর প্রবেশ করবার অধিকার আমার নেই, সে শাস্ত্রের নাম শব্দতত্ত্ব। অপরপক্ষে, এই বর্ষার দিনে

স্বাধিকারপ্রমত্ত হবার অধিকার সকলেরই আছে, এই বিশ্বাসের বলেই আমি অনধিকারচর্চা করতে ব্রতী হচ্ছি।

আমি পূর্বে বলেছি যে, নিরুক্তকারদের মতে যে কথার মানে আমরা জানি নে অথচ বলি, সেই কথা থেকেই কিংবদন্তী জন্মলাভ করে। আমার বিশ্বাস 'আষাঢ়ে গল্প'-রূপ কিংবদন্তীর জন্মকথাও তাই।

আমাদের বাঙাল দেশে লোকে 'আষাঢ়ে গল্প' বলে না, বলে 'আজাড়ে গল্প'। এখন এই 'আজাড়ে' শব্দটি কি 'আষাঢ়ে'র অপভ্রংশ ? 'আজাড়' শব্দের সাক্ষাৎ সংস্কৃতকোষের ভিতর পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান করছি যে এটি হয় ফারসি নয় আরবি শব্দ। আর ও-কথার মানে আমরা সবাই জানি, অন্য সূত্রে। আমরা যখন বলি 'মাঠ উজাড়' করে দিলে তখন আমরা বুঝি যে উজাড় মানে নির্মূল। কারণ 'জড়' মানে যে মূল তা বাংলার চাষীরাও জানে। সুতরাং 'আজাড়ে গল্পে'র অর্থ যে অমূলক গল্প এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। এই 'আজাড়' কথাটার শুদ্ধি ক'রে নিয়ে আমরা তাকে 'আষাঢ়' বানিয়েছি। এ কারণ আরব্য উপন্যাসের সব গল্পই আজাড়ে গল্প, হিন্দু জবানে 'আষাঢ়ে গল্প' ; যদিও আরবদেশে আষাঢ়ও নেই শ্রাবণও নেই।

সুতরাং এ কিংবদন্তীর অলীকতা ধরতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব যে, বৃষ্টির জল পেয়ে গল্প গজায় না, জন্মায় শুধু কবিতা। বর্ষাকাল কবির স্বদেশ, ঔপন্যাসিকের বিদেশ।

৯

বর্ষা যে গল্পের ঋতু নয়, গানের ঋতু— তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে আষাঢ়ে গল্প নেই, কিন্তু মেঘরাগের অগণ্য গান আছে।

বাংলার আদিকবি জয়দেবের আদিশ্লোক কার মনে নেই ? সকলেরই মনে আছে এই কারণ যে—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

এ পদ যার একবার কর্ণগোচর হয়েছে তাঁর কানে তা চিরদিন লেগে থাকবার কথা। চিরদিন যে লেগে থাকে তার কারণ A thing of beauty is a joy for ever। এর সৌন্দর্য কোথায় ? এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব দেবার জো নেই। পোয়েট্রি অথবা বিউটি যে-ভাষায় আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, তা অপর কোনো ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব। আর আমরা

যাকে ভাষা বলি, সে তো হয় কর্মের, নয় জ্ঞানের ভাষা। তবে ঐ ক'টি কথায় জয়দেব আমাদের চোখের সুমুখে যে-রূপ ধরে দিয়েছেন তা একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখা যাক। কবিতা মাত্রেরই ভিতর ছবি থাকে; অতএব দেখা যাক কবি এ স্থলে কি ছবি এঁকেছেন। বর্ষার যে ছবি কালিদাস এঁকেছেন এ সে-ছবি নয়। এর ভিতর বজ্র নেই বিদ্যুৎ নেই বৃষ্টি নেই— অর্থাৎ যেসব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপর হঠাৎ চড়াও হয় এবং মানুষের মনকে চমকিত করে সেসব জিনিসের বিন্দুবিসর্গও উক্ত পদে নেই। কবি শুধু দুটি কথা বলেছেন, আকাশ মেঘে কোমল ও বনতমালে শ্যাম; তিনি তুলির দুটি টানে একসঙ্গে আকাশের ও পৃথিবীর চেহারা এঁকেছেন। এ চিত্রের ভিতরে কোনো রেখা নেই, আছে শুধু রং; আর সে রং নানাজাতীয় নয়; একই রং— শ্যাম, উপরে একটু ফিকে নীচে একটু গাঢ়। এ বর্ণনা হচ্ছে— চিত্রকররা যাকে বলে— ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং। তুলির দু টানে জয়দেব বর্ষার নির্জনতার, নীরবতার, তার নিবিড় শ্যামশ্রীর কি সমগ্র কি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। এ ছবি যার চোখে একবার পড়েছে তার মনে এ ছবির দাগ চিরদিনের মত থেকে যায়। বাইরে যা ক্ষণিকের, মনে তা চিরস্থায়ী হয়। যা অনিত্য তাকে নিত্য করাই তো কবির ধর্ম।

১০

এর থেকে মনে পড়ে গেল যে, কবিতা বস্তু কি? এ প্রশ্ন মানুষে আবহমানকাল জিজ্ঞাসা ক'রে এসেছে, আর যথাশক্তি তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। এ সমস্যার মীমাংসায় ইউরোপীয় সাহিত্য ভরপুর। আরিস্টটলের যুগ থেকে এ আলোচনা শুরু হয়েছে আর আজও থামে নি, বরং সটান চলছে। এর চূড়ান্ত মীমাংসা যে আজ পর্যন্ত হয় নি তার কারণ যুগে যুগে মানুষের মন বদলায় এবং তার ফলে পুরনো মীমাংসা সব নতুন সমস্যা হয়ে ওঠে। যখন মানুষের মনে কোনো সমস্যা থাকবে না তখনই তা'র চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। যাক বিদেশের কথা। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' যে এ-দেশের লোকের মনেও উদয় হয়েছিল তার পরিচয় যিনি পেতে চান, তিনি 'কাব্যজিজ্ঞাসা' সম্বন্ধে আমার বন্ধু শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা পড়ে দেখুন। আমাদের দেশের দার্শনিকরা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র যে উত্তর দিয়েছেন 'কাব্যজিজ্ঞাসা'রও সেই একই উত্তর দিয়েছেন। সে উত্তর হচ্ছে নেতি নেতি— অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ

রীতিও নয়, নীতিও নয়, ভাষাও নয় ভাবও নয়। এককথায় কাব্যের প্রাণ হচ্ছে একটি mystery। প্রাণ জিনিসটা mystery, এ সত্য জেনেও মানুষে দেহের ভিতর প্রাণের সন্ধান করেছে, আর তা কতকটা পেয়েওছে। সুতরাং কবিতার দেহতত্ত্বের আলোচনা করলে আমরা তার প্রাণের সন্ধান পেতে পারি। দার্শনিকের সঙ্গে কবির প্রভেদই এই যে, দার্শনিকের কাছে দেহ ও মন, ভাষা আর ভাব দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু; কিন্তু কবির কাছে ও-দুই এক। তাঁর কাছে ভাষাই ভাব, আর ভাবই ভাষা। কাব্যবস্তু যে ভাষার অতিরিক্ত তার কারণ ভাষার প্রতি পরমাণুর ভিতর ভাব আছে, এবং তা যে ভাবের অতিরিক্ত, তার কারণ প্রতি ভাবকণার ভিতর ভাষা আছে। এই কারণে বলতে সাহসী হচ্ছি যে, জয়দেবের উক্ত পদ যে আমাদের মুগ্ধ করে তার একটি কারণ তার music, আর এ musicএর মূলে আছে অনুপ্রাস। অনুপ্রাস জিনিসটে কতদূর বিরক্তিকর হতে পারে তার পরিচয় বাংলার অনেক যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালার গানে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির হাতে পড়লে অনুপ্রাস যে কবিতাতে প্রাণসঞ্চার করে তার পরিচয় অপর ভাষার অপর কবিদের মুখেও পাওয়া যায়। শেক্‌স্‌পীয়রের full fathom five thy father lies, এবং কোল্‌রিজের five miles meandering with a mazy motion— এ দুটি পদ যে মনের দুয়ারে ঘা দেয় এ কথা কোন্ সহৃদয় লোক অস্বীকার করবে? এ দুটি লাইনের সৌন্দর্য যে অনুপ্রাস-নিরপেক্ষ নয় সে তো প্রত্যক্ষ সত্য। জয়দেবের বর্ষার রূপবর্ণনা অনুপ্রাসের গুণে ভাবঘন হয়ে উঠেছে, আর এই একই কবির বসন্তবর্ণনা অনুপ্রাসের দোষে নিরর্থক হয়েছে—

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে

শুধু শব্দঘটা মাত্র, ছবিও নয়, গানও নয়। ও-পদের ভিতর সে ধ্বনিও নেই, সে আলোকও নেই, যা আমাদের ভিতরের বাইরের রূপলোককে আলোকিত ও প্রতিধ্বনিত করে।

১১

কাব্যবস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করতে হলে যে নেতি নেতি বলতে হয়— এ কথা আমিও জানি, আমিও মানি। কিন্তু এ নেতি নেতির অর্থ এই যে, রচনার যে গুণকে অথবা রূপকে আমরা কাব্য বলি তা শব্দালংকার অর্থালংকার

প্রভৃতি সব রকম অলংকারের অতিরিক্ত। তবে কাব্য অলংকার-অতিরিক্ত ব'লে অলংকার-রিক্ত নয়। কাব্যের সর্বপ্রকার অলংকারের মধ্যে যে অলংকার সবচেয়ে সস্তা সেই অলংকার অর্থাৎ অনুপ্রাসও যে আমাদের মনে কাব্যের সুর সঞ্চার করতে পারে, এ কথা মেনে নিলে বহু কবিতার রস উপভোগ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসে, কারণ এ বিষয়ে আমাদের মন অনেক ভুল আইডিয়ার বাধামুক্ত হয়। ভালোকথা, ভাবেরও কি অনুপ্রাস নেই? সেই অনুপ্রাসই কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে না, যে অনুপ্রাসের ভিতর অনুভাষ নেই; যেমন সে সংগীত মানুষের মনের দুয়োর খুলতে পারে না, যে সংগীতের অন্তরে অনুরণন নেই।

অনুপ্রাস সম্বন্ধে এত কথা বললুম এই জন্যে যে, আজকের দিনে যেসব বাংলা গান মনের ভিতর গুন্‌গুন্ করছে তারা সবই অনুপ্রাসে প্রাণবন্ত। বাংলার পুরনো কবিদের দুটি পুরনো গান রবীন্দ্রনাথ আমাদের নূতন ক'রে শুনিয়েছেন। বিদ্যাপতি কোন্ অতীত বর্ষার দিনে গেয়ে উঠেছিলেন—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

কিন্তু তার পরেই তিনি যা বলেছেন তার ভিতর কাব্যরস এক ফোঁটাও নেই—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া

এ হচ্ছে সংস্কৃত কবিদের বাঁধিগৎ। তাই ও কবিতা থেকে ঐ প্রথম দুটি পদ বাদ দিলে বিদ্যাপতির বাদবাকি কথা কাব্য হত না। বরং সত্য কথা বলতে গেলে 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর' এই কথা-ক'টিই সমগ্র কবিতাটিকে রূপ দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। ভরা বাদর মাহ ভাদরের সুর যার কানে বেজেছে, সেই মুহূর্তে সে অনুভব করেছে যে 'শূন্য মন্দির মোর'। যে মুহূর্তে আমরা শূন্যতার রূপ প্রত্যক্ষ করি, সে মুহূর্তে যে ভাব আমাদের মনকে পেয়ে বসে তার নাম মুক্তির আনন্দ। কাব্যজ আনন্দকেও আলংকারি-করা মুক্তির আনন্দ বলেছেন। আলংকারিকদের এ কথা মিছে নয়।

১২

অপর কবিতাটি এই—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিযে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিযে॥

এ কবিতা যাঁর কানে ও প্রাণে একসঙ্গে না বাজে তাঁর কাছে কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে কোনো ফল নেই। আলংকারিকরা বলেন—

তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
পদবিন্যাস মাত্রেন যয়া নাপহৃতং মনঃ॥

উক্ত কবিতা পদবিন্যাস মাত্র যাঁর মন হরণ করে, তিনিই যথার্থ কাব্যরসিক। আর যাঁদের করে না, ভগবান তাঁদের মঙ্গল করুন।

উপরে যে দু-চারিটি নমুনা দিলুম তার থেকেই দেখা যায় যে, বাঙালি কবির বর্ষাবর্ণনা ছবিপ্রধান নয়, গানপ্রধান। বাঙালি কবিরা বর্ষার বাহ্য-রূপের তেমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করেন না যেমন প্রকাশ করেন বর্ষাগমে নিজেদের মনের রূপান্তরের। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার চাইতে শব্দ দিয়ে সংগীত রচনা করবার দিকেই বাঙালি কবির ঝোঁক বেশি। তাই তাঁদের কবিতায় উপমার চাইতে অনুপ্রাস প্রবল।

সংস্কৃত কবির চোখ আর বাঙালি কবির কান এ দুইই তাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বিষয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। ফলে ও-ঋতুর বিচিত্র রূপের প্রতি রূপের চিত্র তাঁর কাব্যে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ হয়েছে। এ-ঋতু সম্বন্ধে তাঁর কবিতাবলীকে একটি বিচিত্র পিক্‌চার গ্যালারি বললে অসংগত কথা বলা হয় না। অপরপক্ষে বর্ষার সুরে মনের ভিতর যে সুর বেজে ওঠে সেই অপার্থিব সুরের দিব্যরূপ পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষার কবিতায়, সে কবিতার প্রথম পদ হচ্ছে—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

যে কবিতার ভাষা ও ভাব মিলে এক হয়ে যায় সেই কবিতাই যদি perfect

কবিতা হয় তা হলে আমি জোর করে বলতে পারি এর তুল্য perfect কবিতা বাংলাতেও নেই, সংস্কৃতেও নেই। ও-কবিতা শুনে—

সমাজসংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব

এ কথা যিনি ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ঙ্গম না করেন তাঁর এই বর্ষার দেশে জন্মগ্রহণ করাটা কর্মভোগ মাত্র।

১৩৩৪ ভাদ্র

প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচী

জন্ম ৭ অগষ্ট ১৮৬৮। মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

তেল নুন লকড়ি। ১৯০৬?। পৃ ৪৮

১৩১২ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। পরে 'নানা-কথা' পুস্তকের অন্তর্গত।

সনেট-পঞ্চাশৎ। ফাল্গুন ১৯১৩। [২৫ মার্চ ১৯১৩]। পৃ ৫০

চার-ইয়ারি কথা। জানুয়ারি ১৯১৬। [১১ অগস্ট ১৯১৬]। পৃ ৯৭। গল্প।

The Story of Bengalee Literature (Paper read at the Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June 1917). 1917. [15 August 1917]. Pp 17.

বীরবলের হালখাতা। [৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭]। পৃ ২৭৮। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ হালখাতা; কথার কথা; আমরা ও তোমরা; খেয়াল খাতা; মলাট-সমালোচনা; সাহিত্যে চাবুক; তর্জ্জমা; বইয়ের ব্যবসা; বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ; নোবেল প্রাইজ; সবুজ পত্র; বীরবলের চিঠি; "যৌবনে দাও রাজটিকা"; ইতিমধ্যে; বর্ষার কথা; পত্র; কৈফিয়ত; নারীর পত্র; নারীর পত্রের উত্তর; চুটকি; সাহিত্যে খেলা; শিক্ষার নব আদর্শ; কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল; পত্র; প্রত্নতত্ত্বের পারস্যউপন্যাস; টীকা ও টিপ্পনী; শিশু-সাহিত্য; স্বরের কথা; রূপের কথা; ফাল্গুন।

এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দটি প্রবন্ধ লইয়া বীরবলের হালখাতার দ্বিতীয় সংস্করণ ("প্রথম পর্ব") ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।

নানা-কথা। [১৩ মে ১৯১৯]। পৃ ৩৬২। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ তেল নুন লকড়ি; বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙলা ওরফে সাধুভাষা; সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা; বাংলা ব্যাকরণ; সনেট কেন চতুর্দশপদী ?; ব্রাহ্মণ মহাসভা; সবুজ পত্রের মুখপত্র; সাহিত্যসম্মিলন; ভারতবর্ষের ঐক্য; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র; বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ; নূতন ও পুরাতন; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?; অভিভাষণ; বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য; অলঙ্কারের সূত্রপাত; আর্য্যধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ; আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ; ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়; সালতামামি; প্রাণের কথা।

পদ-চারণ। ১৯১৯। [১২ জুলাই ১৯২০]। পৃ ৮৪। কাব্যগ্রন্থ।

আহুতি। ১৯১৯। পৃ ১৯৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী ॥ আহুতি; বড়বাবুর বড়দিন; একটি সাদা গল্প; ফরমায়েসি গল্প; রাম ও শ্যাম।

আমাদের শিক্ষা। [২৫ অগস্ট ১৯২০]। পৃ ১০৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ আমাদের শিক্ষা ; বাংলার ভবিষ্যৎ ; বই-পড়া ; আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা ; নব-বিদ্যালয় ১-৩।

তু-ইয়ারকি। ২৯ জুলাই ১৯২০। [১৯ মার্চ ১৯২১]। পৃ ১৭৫। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ তু-ইয়ারকি ; দেশের কথা ১-২ ; রায়তের কথা ; নবযুগ।

বীরবলের টিপ্পনী। ১৩২৮। [২ অগস্ট ১৯২১]। পৃ ১২৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ কংগ্রেসের দলাদলি ; "এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়" ; সাহিত্য বনাম পলিটিক্স ; টীকা ও টিপ্পনী ; পত্র ; গত কংগ্রেস। পরিশিষ্ট ॥ গুলিখোরের আবেদন-পত্র ; গর্জ্জন-সরস্বতী সংবাদ।

রায়তের কথা। [১০ অগস্ট ১৯২৬]। পৃ ১৷৶+৮০। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; টীকা, প্রমথ চৌধুরী ; রায়তের কথা ('তু-ইয়ারকি' হইতে) ; রঙ্গপুরে উত্তর-বঙ্গ রায়ত কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ ; পত্র ('বীরবলের টিপ্পনী' হইতে)।

"অভিভাষণ" ও "পত্র"-বর্জিত এই পুস্তিকার একটি সংশোধিত সংস্করণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় ১৩৫১ সালের বৈশাখ সংখ্যারূপে [১৬ মে ১৯৪৪] প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী। [২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]। পৃ ৩১১।

সূচী ॥ কাব্য— সনেট পঞ্চাশৎ ; পদ-চারণ। গল্প— চার-ইয়ারি কথা, আহুতি (সম্পূর্ণ) ; আরও আটটি গল্প ('নীললোহিত' ও 'নীললোহিতের আদিকথা'য় সংকলিত)। প্রবন্ধ— 'তু-ইয়ারকি' (সম্পূর্ণ) ; 'বীরবলের হালখাতা', 'নানা-কথা' ও 'বীরবলের টিপ্পনী', প্রত্যেকটি আংশিক ; কথা-সাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ।

নানা-চর্চা। ১ মার্চ ১৯৩২। [১ জুন ১৯৩২]। পৃ ২১৬। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি ; অন্ধ-হিন্দুস্থান ; মহাভারত ও গীতা ; বৌদ্ধধর্ম্ম ; হর্ষ-চরিত ; পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ ; বীরবল ; ভারতচন্দ্র ; রামমোহন রায় ; বাঙালী পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম ; য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? ; ভারতবর্ষ সভ্য কি না ? ; গোল-টেবিলের বৈঠক।

নীললোহিত। পৃ ১৩১। গল্পসংগ্রহ। ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী ॥ নীললোহিত ; নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা ; নীললোহিতের স্বয়ম্বর ; অদৃষ্ট ; সম্পাদক ও বন্ধু ; গল্প লেখা ; পূজার বলি ; সহযাত্রী ; ঝাঁপান খেলা ; দিদিমার গল্প ; ভূতের গল্প।

নীললোহিতের আদিপ্রেম। [২২ অগস্ট ১৯৩৪] পৃ ১০৫। গল্পসংগ্রহ। ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী ॥ নীললোহিতের আদিপ্রেম ; ট্রাজেডির সূত্রপাত ; অবনীভূষণের সাধনা ও

সিদ্ধি; অ্যাডভেঞ্চার— স্থলে; অ্যাডভেঞ্চার— জলে; ভাববার কথা।

ঘরে বাইরে। ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬। [২৪ নভেম্বর ১৯৩৬]। পৃ ১২৭। প্রবন্ধসংগ্রহ। নয়টি "প্রস্তাব" আছে।

অভিভাষণ। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, চন্দননগর, ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩

সাহিত্যশাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ ব্যতীত ইতিহাস ও দর্শন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত আছে।

ঘোষালের ত্রিকথা। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। পৃ ৯৩। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ ফরমায়েসি গল্প ('আহুতি' হইতে); ঘোষালের হেঁয়ালি; বীণাবাই।

সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, কৃষ্ণনগর, ২৯ মাঘ ১৩৪৪। পৃ ১৫

অণুকথা সপ্তক। ১৩৪৬। [১ জুলাই ১৯৩৯]। পৃ ৫৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী॥ মন্ত্রশক্তি; যখ; ঝোট্টন ও লোট্টন; মেরি ক্রিস্‌মাস; ফার্স্টক্লাশ ভূত; স্বল্প-গল্প; প্রগতি রহস্য।

প্রাচীন হিন্দুস্থান। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ [৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০]। পৃ ১১৭। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ ভূবৃত্তান্ত ('নানা-চর্চা' হইতে। ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি ও অন্থ-হিন্দুস্থান প্রবন্ধদ্বয়ের সংশোধিত রূপ); ইতিবৃত্তান্ত।

গল্পসংগ্রহ। ২০ ভাদ্র ১৩৪৮। [৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১]। পৃ ৫০৭

গ্রন্থাকারে বা সাময়িক পত্রে এ যাবৎকাল প্রকাশিত লেখকের সমস্ত গল্পের সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত। এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পরও চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি গল্প লিখিয়াছিলেন।

Tales of Four Friends. June 1944. Pp 119.

চার-ইয়ারি কথার শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ডিসেম্বর ১৯৪৪। [২১ ডিসেম্বর ১৯৪৪] পৃ ১৭

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা।

হিন্দু সংগীত। বৈশাখ ১৩৫২। [১৪ জুন ১৯৪৫]। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ হিন্দুসংগীত; স্বরের কথা ('বীরবলের হালখাতা' হইতে) ও শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লিখিত সংগীতপরিচয়।

আত্মকথা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩। [২৮ জুন ১৯৪৬] পৃ ১১৪

১৮৯৩ সালে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত স্মৃতিকথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী কালের আত্মকথা অধিকাংশ বৈশাখী (১৩৫২) ও পূর্বাশা (১৩৬০) পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবন্ধসংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। ৭ অগস্ট ১৯৫২। পৃ ৩৩৩।

'সাহিত্য' ও 'ভাষার কথা' সম্বন্ধে ছাব্বিশটি প্রবন্ধ। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

সাময়িক পত্র হইতেও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান। ফাল্গুন ১৩৬০। পৃ ৩২

প্রবন্ধ-সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। মার্চ ১৯৫৪। পৃ ২৭৭

'ভারতবর্ষ' 'সমাজ' ও 'বিচিত্র' প্রসঙ্গে চব্বিশটি প্রবন্ধ। সাময়িক পত্র হইতে এই খণ্ডেও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

পত্রাবলী। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। ১ অক্টোবর ১৯৩১

ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বীরবল, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখিত কয়েকটি পত্রালোচনা প্রমথ চৌধুরী এই গ্রন্থে স্বীয় 'মুখ-পত্র' সহ একত্র প্রকাশ করেন। উক্ত ভূমিকা ব্যতীত চৌধুরী মহাশয়ের তিনটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে— বীরবলের পত্র ১-২; ফ্রান্সের নব মনোভাব।

বারোয়ারি। ১৯২১। [২ মে ১৯২১]

এই উপন্যাস বারোজন সাহিত্যিকের রচনা— 'ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি'। প্রমথ চৌধুরী ৩৩-৩৬ পরিচ্ছেদ লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোটগল্প' প্রতি সংখ্যায় সাধারণতঃ একটি গল্প (অন্যান্য সংবাদ ও মন্তব্যসহ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইত। উহার নিম্নোক্ত তিনটি সংখ্যা প্রমথ চৌধুরীর পুস্তকতালিকায় স্থান পাইতে পারে।

সেকালের গল্প। ১ আষাঢ় ১৩৩৯

নীললোহিতের আদি প্রেম। ৬ ফাল্গুন ১৩৩৯

ট্রাজেডির সূত্রপাত। ৩১ ভাদ্র ১৩৪০

দুই না এক। বৈশাখ ১৩৫১। এটি শ্রীপ্রতিভা বসু সম্পাদিত ছোটগল্প গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা, থিয়োফিল গোতিয়ের গল্পের অনুবাদ, ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত; ইহাও প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প-পুস্তিকা-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংগ্রহে' এটি স্থান পায় নাই, এই পুস্তিকার প্রকাশক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদ-গল্প 'গল্পসংগ্রহে'র পরিধিভুক্ত নহে; প্রমথ চৌধুরী আরও কয়েকটি দেশী ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেগুলিও গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রকাশ-কাল মুদ্রিত নাই। ভূমিকার তারিখ, প্রেসের নির্দেশচিহ্ন ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ ধরিয়া সাজানো হইয়াছে।— বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখগুলি (বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত) শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

প্রকাশনির্দেশ

প্রবন্ধসংগ্রহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী কোন্ কোন্ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র থেকে সংকলিত, নিম্নে তার বিবরণ মুদ্রিত হল। গ্রন্থমধ্যে রচনার নীচে উল্লিখিত তারিখ সাময়িক পত্রে প্রকাশ অনুযায়ী।

বীরবলের হালখাতা

কথার কথা	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯
আমরা ও তোমরা	ভারতী। শ্রাবণ ১৩০৯
খেয়ালখাতা	ভারতী। বৈশাখ ১৩১২
মলাট-সমালোচনা	সাহিত্য। অগ্রহায়ণ ১৩১৯
তরজমা	ভারতী। মাঘ ১৩১৯
বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ	ভারতী। আশ্বিন ১৩২০
সবুজ পত্র	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২১
'যৌবনে দাও রাজটিকা'	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
বর্ষার কথা	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
চুটকি	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
সাহিত্যে খেলা	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২২
প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য উপন্যাস	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২৩
সুরের কথা	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২৩
রূপের কথা	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২৩
ফাল্গুন	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২৩

নানা-কথা

তেল নুন লকড়ি	ভারতী। মাঘ-ফাল্গুন ১৩১২
বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা	ভারতী। পৌষ ১৩১৯
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা	ভারতী। চৈত্র ১৩১৯
সনেট কেন চতুর্দশপদী	ভারতী। ভাদ্র ১৩২০
সবুজ পত্রের মুখপত্র	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২১
সাহিত্যসম্মিলন	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
ভারতবর্ষের ঐক্য	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২১
নূতন ও পুরাতন	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২১

বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি	সবুজ পত্র। মাঘ ১৩২১
অভিভাষণ	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২১
বর্তমান বঙ্গসাহিত্য	সবুজ পত্র। কার্তিক ১৩২২
ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩
প্রাণের কথা	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৪
বাঙালি পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৭

আমাদের শিক্ষা

বাংলার ভবিষ্যৎ	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৪
বই পড়া	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৫

রায়তের কথা

রায়তের কথা	সবুজ পত্র। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬

নানা-চর্চা

ভারতবর্ষ সভ্য কি না	সবুজ পত্র। ফাল্গুন ১৩২৫
রামমোহন রায়	সবুজ পত্র। আশ্বিন ১৩২৭
ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি	সবুজ পত্র। মাঘ ১৩৩২
বীরবল	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩৩৩
অনু-হিন্দুস্থান	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩৩৪
পূর্ব ও পশ্চিম	বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৩৪
মহাভারত ও গীতা	বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৪
ভারতচন্দ্র	মানসী ও মর্মবাণী। শ্রাবণ ১৩৩৫
ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি	বসুমতী। আষাঢ় ১৩৩৭
হর্ষচরিত	বসুমতী। ভাদ্র ১৩৩৭
পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৮

সাময়িক পত্র

জয়দেব	ভারতী ও বালক। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭
আমাদের ভাষাসংকট	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯
বর্ষা	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৯
বর্ষার দিন	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৪
চিত্রাঙ্গদা	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৪
কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত	বসুমতী। বৈশাখ ১৩৩৬

স্বীকৃতি

প্রবন্ধসংগ্রহে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির মূলানুগ মুদ্রণের উদ্যোগে শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ও শ্রীসুখময় ভট্টাচার্যের সাহায্য পাওয়া গেছে।

বিদেশি শব্দের লিপ্যন্তরকরণে সহায়তা করেছেন শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসোমনাথ মৈত্র।

'ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি' এবং 'অনু-হিন্দুস্থান' প্রবন্ধ সম্পাদন করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীসুশীলকুমার দে কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গ্রন্থপ্রকাশে আনুকূল্য করেছেন।

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওঅর্কস লিমিটেড। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা
২০১